অভিসারিকা

সুজিতকুমার নাগ
সম্পাদিত

নাথ ব্রাদার্স ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় রথযাত্রা ১৩৭১

প্রকাশক
কে. নাথ, এস. নাথ
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ এঁকেছেন
কুমার অজিত

মুদ্রক
হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১ রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলিকাতা-৬

সূচী

জায়া

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপ স্বতন্ত্র বস্তু—রূপ-তাহার কোন কালে ছিল না; তবে অন্ন-বস্ত্রে দেয় যে শ্রী—তাহার ছিল। কিন্তু সেটুকুও তাহার থাকিল না। অন্নবস্ত্রের অভাবে নয়, কয় মাসের কারাক্লেশ জলোকার মত শ্রীটুকু যেন শোষণ করিয়া লইল। জেলে ক্লেশ কিছু সে পায় নাই, কিন্তু তবুও চার মাসের মধ্যেই আমাশয় ও চোখের অসুখে কুব্জ, শ্রীহীন হইয়া ফিরিল। স্থূলতা বর্জিত শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; খদ্দরের পোষাকও ভারী বোধ হইতেছিল। অবয়বের লাবণ্য নিঃশেষে ঝরিয়া গেছে—দেহের শ্যামবর্ণ প্রায় কালো হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সে লাবণ্য আর ফিরিল না। শ্রী না ফিরুক দেহ সুস্থ হইল।

জেল হইতে ফিরিয়া তাহার নেশা পড়িল লেখায় এবং গাছ পোঁতায়। নিজেই মাটী কোপাইয়া ফুলের বাগান করে, গ্রামের প্রান্তের প্রকাণ্ড বড় বাগানটায় বট অশ্বত্থের ডাল ও চারা পোঁতে ফুলের গাছও পোঁতে—কিন্তু সংখ্যায় কম। রৌদ্রে বৃষ্টিতে তাহার শ্রীহীনতা উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল। আন্দোলনের পূর্ব হইতেই জামা জুতা সে ত্যাগ করিয়াছিল; তাহার পরণে থাকে মোটা কাপড় আর কাঁধে চাদর। চাদর আবার সব সময়ে নয়, কোথাও যাইতে আসিতে হইলে চাদরটা কাঁধে চাপে। অন্য সময়ে খালি গা, খালি পায়ে সে মূর্তিমান শ্রীহীনের মত ঘুরিয়া বেড়ায়। সে জেলে থাকিবার সময় ছোট ভাই সংসার ঘাড়ে লইয়াছিল—সে সংসার তাহার স্কন্ধে দৈত্যের স্কন্ধের আকাশের মতই চাপিয়া রহিল। শিবনাথ সে আর ঘাড়ে করিল না। তবে উপদেশ দেয়—সময়ে সময়ে কিছুদিন ধরিয়া কঠোর পরিশ্রমে ত্রুটীগুলি সংশোধন করিয়া দিয়া সংসার রথখানিকে অপেক্ষাকৃত সবল ও দ্রুত গতিশীল করিয়া দেয়।

দ্বিপ্রহরে এক গা ঘামিয়া সেদিন শিবনাথ বাড়ী ফিরিল। খালি গা, খালি পা—কোমরে গুঁজিয়া কাপড়খানা পর্যন্ত হাঁটুর উপর টানিয়া তোলা ; সাড়া না দিয়াই বাড়ী ঢুকিল।

শিবনাথের স্ত্রী গৌরী ও ছোট বৌ অমলা বারান্দায় থামের আড়ালে বসিয়া পান সাজিতেছিল, গৌরী বলিল, শম্ভু এদিকে শোন দেখি।

শম্ভু শিবনাথের বাড়ীর মাহিন্দার।

শিবনাথ সটান খিড়কীর বাগানের দিকে চলিয়া গেল। গৌরী উঠিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া বলিল—শম্ভু কোথায় গেল মন্নুর মা ?

রন্ধনশালে ব্যস্ত পাচিকা মন্নুর মা বলিল—কে জানে বৌদিদি, দেখি নাই ত। কেউ আসে নাই ত।

ছোট বৌ অমলা মিহিভাবে বলিল, আসবে না কেন—খিড়কী দিয়ে গেল চোখের সামনে।

গৌরী রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল—চাকর বাকর অবাধ্য হয়েছে দেখেছ ! ডাকলে সাড়া পর্যন্ত দেয় না। তা বলব কাকে বল ? বড়বাবুই চাকর বাকরের মাথা খেলে। এখুনি শম্ভু খিড়কী দিয়ে গেল।

খিড়কীর রাস্তাঘরে পদশব্দ উঠিল। মন্নুর মা বলিল—ওই যে, ওই বাবু আসচেন।

গৌরী বলিল—এই শম্ভু, বেয়াদপ চাকর কোথাকার—

প্রথমটা না লক্ষ্য করিলেও শিবনাথ খিড়কীর বাগানে দাঁড়াইয়া কথাবার্তা শুনিয়া সব বুঝিয়াছিল। সে হাসিমুখেই জোড় হাতে দাঁড়াইয়া বলিল—অধম কি একান্তই শম্ভু পদবাচ্য হ'ল হুজুরাইন ?

মন্নুর মা মুখে কাপড় গুঁজিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। ছোট বৌ-এর চাপা হাসির খুক্ খুক্ শব্দ বেশ শোনা যাইতেছিল। গৌরী নিজেও না হাসিয়া পারিল না—বলিল, মা গো মা, কি অপ্রস্তুত করতে পার তুমি মানুষকে—না বাপু, ছি, ও কি ?

শিবনাথ হাসিয়া বলিল—আমার কথাটার উত্তর দাও, আমি কি শম্ভুর কেলাসে পড়লাম তা হ'লে ?

গৌরী স্বামীকে বেশ করিয়া দেখিয়া বলিল। কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে বল দেখি? সর্বাঙ্গে ধুলো, শরীরের এই অবস্থা—ছি ছি ছি। বস দেখি, একটু বাতাস করি। ভোলাদাসী, জল দে ত এক বালতী! ছোট বৌ আমার সাবান আর তোমার ভাসুরের গামছা দেখে দাও ত।

ভোলাদাসী বাড়ীর ঝি।

খেঁয়ালের সুর চাপা পড়িয়া ধ্রুপদ ধামার আরম্ভ হয় দেখিয়া শিবনাথ ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে বলিল—ধীরে মহাশয়া ধীরে, ধ্রুপদ ধামার আরম্ভ করতে হয় ধীরভাবে সুস্থচিত্তে। একটু অপেক্ষা কর, এই গাছ কটা পুঁতে আসি।

গৌরী বলিল—হাত মুখ ধোও, জল খাও, তারপর। সে স্বামীর হাত হইতে গাছের চারা কয়টা টানিয়া লইল। আর উপায় ছিল না —শিবনাথকে বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে হইল। অতঃপর শিবনাথের মন্দ লাগিল না—তপ্তদেহে শীতল বারি সিঞ্চন, তাহার সঙ্গে পাখার মৃদু বাতাস, সকলের উপর মিছরীর সরবৎ—মন্দ কেন, খুব ভালই লাগিল। সে চোখ মুদিয়া পরম আরামে বলিল—আঃ!

গৌরী বলিল—দেখ, কিছুদিন কোথাও গিয়ে শরীর সেরে এস তুমি। আর জামা জুতো পর—ও ছেড়ে আর—

মধ্যপথেই শিবনাথ বলিল—কেন, অমনি আর পছন্দ হচ্ছে না আমাকে!

গৌরী বলিল—আমার কথাই তোমার পছন্দ হয় না। কিন্তু মা থাকলে তিনিও ঠিক এই কথাই বলতেন।

শিবনাথ বলিল—তনয় যদ্যপি হয় অসিত বরণ, প্রসূতির কাছে সেই কষিত কাঞ্চন, কিন্তু, কন্যা কাময়তে রূপং—সখি, আশঙ্কা আমার তোমার সম্বন্ধে।

গৌরী এবার বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। সে বলিল—তোমাকে যেতে হবেই। আর জামা জুতো তোমাকে পরতেই হবে।

শিবনাথ উত্তর দিল—শরীর ত আমার অসুস্থ নয় গৌরী। আর

বেশভূষা জীবনের পক্ষে বাহুল্য বলেই আমি মনে করি।

গৌরী বলিল—ও শরীর তোমার ভাঙতে কতক্ষণ? তা ছাড়া শ্রী বলে জিনিসটাও ত' দরকার। আমি টাকা দিচ্ছি।

শিবনাথ মুদিত চোখেই উত্তর দিল—কি হবে রূপ, কি হবে বেশভূষা, মহাকালের দরবারে—

গৌরী রাগ করিয়া উঠিয়া গেল।

শিবনাথ তবুও একটু রসিকতা করিবার চেষ্টা করিল—রূপ দেখে যদি ভালবাস সখি—।

কিন্তু রসিকতা জমিল না, গৌরীর মুখ দেখিয়া গানের কলিটা সে সম্পূর্ণ আবৃত্তি করিতে পারিল না।

শিবনাথ স্ত্রীর অনুরোধ রাখিল না। তাহার সেই এক উত্তর—কি হবে? সে গ্রাম প্রান্তের বাগানে ঘুরিয়া বেড়ায়, কত ধারার চিন্তা করে, লেখে—মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইলে গাছ পোঁতে।

গৌরী অবশেষে দেবর দেবনাথকে দলে টানিয়া শিবনাথকে পরাজিত করিবায় চেষ্টা আরম্ভ করিল। এবার ফল কিছু ফলিল, স্থির হইল, যখন কয়েক মাস আর এমন করিয়া শিবনাথের ঘুরিয়া বেড়ান হইবে না। বাড়ীতে বসিয়া সেরেস্তার কাজকর্ম দেখিয়া দিতে হইবে। শিবনাথকে স্বীকার করিতে হইল। কর্তব্যে সে অবহেলা করে না।

গৌরী বলিল, তবু আমার কথাটা রাখলে না।

শিবনাথ বলিল—তোমার কথাই ত' রাখলাম।

—না, ভাই-এর কথা রাখলে। কেন—সে কথাও আমি জানি।

—কেন শুনি?

—বই ছাপাতে টাকা চেয়েছিলে তুমি, আমি দিইনি—তাই। আমার টাকায় শরীর সারতে পর্যন্ত যাবে না তুমি। আমার ব্রতের কাপড় জামা জুতো ছাতা—সে পর্যন্ত নিলে না তুমি।

শিবনাথ বলিল—পাগল তুমি! গৌরীর কথা তখনও শেষ হয় নাই,

সে বলিতেছিল—টাকা দেবার আমি কে? টাকার মালিক ছেলেরা। তারাই মায়ের দৌহিত্র। একথাটা তুমি বুঝলে না, আমার উপর রাগ করলে।

শিবনাথ বলিল—ও তোমার ভুল ধারণা গৌরী। বলিয়া সে বাহিরে চলিয়া আসিল। কিন্তু কথাটা সে চিন্তা না করিয়া পারিল না। বৈঠকখানাটা জনশূন্য—চাকরটা বাজারে গিয়াছে, চাপরাশীটা এইমাত্র গেল দেবনাথের সঙ্গে মাঠে, নায়েব স্থানীয় ব্যক্তি, কি কারণে সে আজ আসিতে পারে নাই। শিবনাথ একা বসিয়া ঐ কথাটাই ভাবিতেছিল।

গৌরী কিছু মাতৃধন পাইয়াছে—হাজার নয় টাকা। টাকাটা কতক ক্যাস সার্টিফিকেটে আবদ্ধ আছে, কতক গৌরীর পিতৃকুলের এক ব্যবসায়ে ধার দেওয়া আছে—সুদটা তাহার মাসে মাসে পাওয়া যায়। কিছু টাকা শিবনাথ একবার চাহিয়াছিল, কিন্তু গৌরী দেয় নাই। শিবনাথ ভাবিতেছিল, গৌরীর কথাটা কি সত্য?

চিন্তাটা সুখপ্রদ মনে হইতেছিল না, মনে মনে যেন অপরাধ আংশিক ভাবেও স্বীকার করিতে হইতেছিল। শিবনাথ উঠিয়া সেরেস্তার খাতা-পত্রগুলা লইয়া বসিল।

কাহার জুতার শব্দে মুখ তুলিয়া শিবনাথ দেখিল এক সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় আসিতেছে। ভদ্রলোক আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন—নমস্কার।

শিবনাথও প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল বসুন! বসিয়াই ভদ্রলোক বলিলেন—নতুন বহাল হয়েছেন বুঝি আপনি?

নগ্নগাত্র শিবনাথ বুঝিল ভদ্রলোকের ভুল হইয়াছে। কিন্তু কি ভাবে কেমন করিয়া সে ভ্রম সংশোধন করিয়া দেওয়া যায়, তাহাই সে দ্রুত চিন্তা করিতেছিল। কিন্তু তাহার পূর্বেই ভদ্রলোক তাহার হাতদুটি জোড় করিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল—পাঁচটি টাকা আপনাকে পান খেতে দোব নায়েব বাবু! আমার একটি কাজ ক'রে দিতে হবে।

শিবনাথ অগাধ জলে পড়িয়া গেল। দুই কূল বজায়ের উপায় না পাইয়া সে নায়েব সাজিয়াই বসিল।

বলিল—কি কাজ বলুন।

ভদ্রলোক বলিল—বাবুদের দরবার থেকে পাঁচ টাকা ক'রে বার্ষিক বৃত্তি ছিল আমাদের। গত বছর থেকে সেটা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন বড়বাবু। তা সেইটি আপনাকে উদ্ধার করে দিতে হবে।

শিবনাথ প্রশ্ন করিল—বৃত্তি বন্ধ হল কেন? বড়বাবু ত—

বিরক্তিভরে ভদ্রলোক বলিয়া বসিল—আর মশায়, নতুন লোক আমি —ক্রমে বুঝতে পারবেন। সে এক আচ্ছা লোক। এখন ব্যাপারটা শুনন। বাবুদের মহাল ২১৫নং তৌজি পাবনায় আমার শ্বশুর বাড়ী—বৃত্তি আমার শ্বশুরদের পৈত্রিক। আমিই সব সম্পত্তি পেয়েছি—শ্বশুরের ছেলেপিলে নাই। শ্বশুরের পৈত্রিক দুর্গাপূজা ছিল; বিজয়ার পর যাত্রার দিন আমার শ্বশুর প্রতিমার গলার পৈতে নিয়ে আসতেন—বাবুরা পাঁচটি টাকা দিতেন। এখন এবার আসতেই ছোটবাবু বললেন—বৃত্তি আপনি পাবেন না; কেন মশায়, জিজ্ঞাসা করলাম। শুনলাম শ্বশুরের দুর্গাপুজো ত আমি আর করি না। সেই জন্যে বড়বাবুর হুকুম।

শিবনাথের ব্যাপারটা মনে পড়িয়া গেল। সে বলিল—পুজোটা বন্ধ না করলেই হ'ত।

হাসিয়া ভদ্রলোক বলিল—বেশ মশাই আপনি। খরচ কত! তা ছাড়া ইস্কুল মাস্টারী করি, ছুটি হয় সেই পঞ্চমীর দিন। কখনই বা কি করি।

শিবনাথ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—তা আমি বলব বাবুকে।

ভদ্রলোক বলিল—হ্যাঁ, ছোটবাবুকে নয়, বড়বাবুকে বলবেন। আচ্ছা ঘড়েল লোক মশাই—ছোট ভাইকে শিখণ্ডীর মত সামনে রেখে আড়াল থেকে হুঁঃ—বেশ! আরে মশাই পাঁচ দিন এসে দেখাই পেলাম না। কোথা! না, বাড়ী নাই—মাঠে নয় বাগানে।

তারপর সহসা মুখটা খুব কাছে আনিয়া বলিল—এত বাগানে কেন মশাই, বলি মালটাল এ্যাঁ? এদিকে ত স্বদেশীতে জেল-টেল খেটে এলেন।

শিবনাথের এরপর হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। সে কোনরূপে বলিল—কই, সে রকম ত শুনি টুনি নাই।

চোখের ইসারা করিয়া ভদ্রলোক বলিল—আরে মশাই, ডুবে ডুবে জল খেলে একাদশীর বাবাও জানতে পারে না।

শিবনাথ ভদ্রলোককে বিদায় করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল—এখনি কে হয়ত আসিয়া তাহার পরিচয় ব্যক্ত করিয়া দিবে। সে বলিল আমি বলব। আচ্ছা, নমস্কার।

ভদ্রলোক আবার তাহার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আজ্ঞে বলব বললে হবে না। ব্রাহ্মণের বৃত্তি উদ্ধার করে দিতেই হবে। আমি বরং আরও কিছু—

বাধা দিয়া শিবনাথ বলিল—আমাকে কিছু লাগবে না। তবে বড়বাবু যে ধারার মানুষ—

ভদ্রলোক বলিল—আরে, দেখা পেলে যে দেখি কি ধারার মানুষ। বুড়োছেলে শাসন করার অভ্যেসও আমার আছে। এই দেখুন, আপনাকে দশটাকা দোব আমি। আচ্ছা চললাম আজ—নমস্কার।

ভদ্রলোক চলিয়া যাইতেই শিবনাথ তক্তাপোষের উপর গড়াইয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। একা একা এতটা কৌতুক ভোগ করিতে তাহার ভাল লাগিল না। সে উঠিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। শিবনাথের বাড়ী ও বৈঠকখানার মধ্যে খানিকটা ব্যবধান আছে—একটা রাস্তা পার হইয়া সামান্য একটু যাইতে হয়। বৈঠকখানা হইতে রাস্তায় নামিয়াই কিন্তু তাহাকে দাঁড়াইতে হইল। সেই ভদ্রলোক তাহারই এক বন্ধুর সহিত কথা কহিতে কহিতে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন।

শিবনাথ সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল, কিন্তু তাহার পূর্বেই বন্ধুটি বলিয়া উঠিল—এই যে শিবনাথ। এই ভদ্রলোক—ও মশায়, ও সীতারামবাবু—চলে যাচ্ছেন কেন, এই যে শিবনাথ।

সীতারামবাবু ততক্ষণে বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে অনেকটা চলিয়া গিয়াছেন।

শিবনাথের হাসিতে নূতন জোয়ার ধরিয়া গেল। তবুও সে ডাকিল—শুনুন, শুনুন সীতারামবাবু।

অল্প দূরেই পথটা একটা মোড় ফিরিয়াছে। সীতারামবাবু সেই মোড়ের মধ্যে তখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। বন্ধুটি হতবাক হইয়া শিবনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে বলিল—কি ব্যাপার বল ত শিবনাথ? ভদ্রলোক আমার জানা লোক, তাই দেখা হতেই বললেন শিবনাথবাবুকে ধরে একটি কাজ করে দিতে হবে আমার। তাই সঙ্গে আসছিলেনও আমার, কিন্তু তোমাকে দেখেই—কি ব্যাপার বল ত?

শিবনাথ তখনও প্রচুর হাসিতেছিল—সে হাসির মধ্যেই কোনরূপে বলিল—পরে বলল দাদা, এখন হাসতে দাও!

বলিয়া সে হাসিতে হাসিতেই বাড়ী চলিয়া গেল। বাড়ীর সকলে হাসিয়া আকুল হইল। গৌরী, ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীর সিংহাসন পরিষ্কার করিতেছিল। সে গম্ভীর মুখে বাহির হইয়া আসিল।

বাড়ীর পুরাতন ঝি সতীশের মা বলিতেছিল—তা বাপু লোকের দোষ কি! বাবুলোকের চেহারা হবে এই থল্‌থলে—এই ভুঁড়ি! এ্যাতখানি জায়গা জুড়ে বসে থাকবে পাহাড় পর্বতের মত! এই জামা, চক্‌চকে জুতো, মস্‌ মস্‌ করে যাবে! তা-না, ই এক ঢং বাবু তোমার।

শিবনাথ গৌরীর দিকে চাহিয়া বলিল—শুনলে হাসির কথা!

কাজের অজুহাতে ওঘরে যাইতে যাইতেই গৌরী উত্তর দিল—কালা ত নই, শুনলাম বৈকি! কিন্তু হাসির ত এতে কিছু নাই।

শিবনাথ প্রশ্ন করিল—কি রকম?

—তা বৈ কি। আড়ি পেতে শোন যদি তবে নিরেনব্বুই জনকে অমনি ধারার কথা বলতে শুনবে। নিজের পরিচয় গোপন করে নিজের সম্বন্ধে কথা শোনাও আড়িপাতারই সামিল। ও অতি ছোট কাজ।

গৌরীর কথার সুরে ও অর্থে বাড়ীর হাস্যচটুল বায়ুস্তর যেন দেখিতে দেখিতে স্তব্ধ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সকলেই যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। শিবনাথও মনে যেন একটু আঘাত পাইয়াছিল, তবুও সে

রহস্য করিবার চেষ্টা করিল—হতভাগ্য শিবের কপালে পতিনিন্দা
গৌরীও শেষে সতীর মত দেহত্যাগ না করেন—আমি তাই ভাবছি।

গৌরী শান্তস্বরে উত্তর দিল—দেহত্যাগ করে আর লাভ কি ?
গৌরী দেহত্যাগ করলে মহাদেব আবার বিবাহ করবেন, মাঝখান থেকে
গৌরীর কার্তিক গণেশই ভেসে যাবে।

কথাগুলির গঠনের ভঙ্গীকে রহস্য বলিয়াও ধরা যায়—কিন্তু অতি
কুৎসিত ব্যক্তির রোদন-বিকৃত মুখ দেখিয়া যেমন হাসা যায় না—তেমনি
এ কথাগুলি শুনিয়াও কেহ হাসিতে পারিল না। শিবনাথও নীরব
হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে শিবনাথ বলিল—এত রূপের আকাঙ্ক্ষা
কেন বল ত তোমার ?

অতি রুষ্ট কণ্ঠস্বরে গৌরী উত্তর দিল—এত বড় জঘন্য কথাটা তুমি
বললে আমাকে ! অতি ইতর তুমি !

শিবনাথের কর্কশ কৃষ্ণমূর্তি ক্রোধে কুৎসিত হইয়া উঠিল। সে
বলিয়া উঠিল—যা সত্য তাই বলেছি। সত্য কথা ইতরে বলে না—
ইতরেই সত্যকথা সসম্মানে গ্রহণ করতে পারে না।

পাচিকা মনুর মা বলিল—তা বাবু একবার ঘুরেই আসুন না।
বৌদিদি ত ভাল কথাই বলছেন !

শিবনাথ উত্তর দিল—সে খরচ করার মত অবস্থা আমার নয়। তার
চেয়ে স্নো-পাউডার মেখে রূপ বাড়ান কম খরচে হয়। বলিতে বলিতেই
সে উঠিয়া বৈঠকখানার দিকে চলিয়া গেল।

ইহার পর দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। শিবনাথ তখন খ্যাতিসম্পন্ন
লেখক। দুই চারিখানা কাগজের লেখার তাগিদ, পত্রের জবাব তাহাকে
নিত্য দিতে হয়। পরিশ্রমও সে করে অগাধ। কিন্তু গাছের নেশা—
উদ্দেশ্যহীন ভাবে মাঠে মাঠে ঘোরার নেশা, বেশভূষায় উদাসীনতা
এখনও তাহার তেমনি আছে।

সেবার বর্ষার সময় খেয়াল হইল ঘর মেরামতের। রাজমিস্ত্রী

লাগাইয়া নয়—রাজমিস্ত্রীর যন্ত্রপাতি কিনিয়া সে নিজেই কাজ আরম্ভ করিল। বাগানের ভিতর দিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশের পথ ছিল না—সেখানে সে পাচিল ভাঙ্গিয়া এক নূতন ফটক ও একপ্রস্থ সিঁড়ির প্রয়োজন অনুভব করিল। আর তৈয়ারী করিতে হইবে বাগানের মধ্যে একটা পাকা বেদী।

ছোট ভাই বলিল—তোমার অদ্ভুত খেয়াল দাদা। বেশ ত, রাজমিস্ত্রী লাগান হোক।

শিবনাথ নিজের হাতেই বনিয়াদ খুঁড়িতেছিল। সে বলিল—উঁ-হু। দেবনাথ জানে এ লোকের সঙ্গে বাক্যব্যয় করা বৃথা; সে দাদাকে কিছু না বলিয়া বাড়ীতে গিয়া গৌরীকে ধরিল—পার ত তুমি পারবে বৌদি—তুমি বল।

গৌরী বলিল—পাগল তুমি দেবু। মহাপুরুষ যারা হয় তাদের ঐ ধারা! কারও কথা তাদের রাখতে নাই। আমি পারব না ভাই, আমাকে বলো না।

দেবু বলিল—প্রজা সজ্জন আসে যায়, তারা দেখলে কি বলে বল ত? মাথার ওপরে এই কড়া রোদ, কখনও বৃষ্টি!

গৌরী বলিল—তারা হীন ব্যক্তি, তাদের বলা কওয়ায় কি আসে যায়! আর রোদ বৃষ্টি প্রকৃতির দান—ওতে কি শরীরের অনিষ্ট হয়। তা ছাড়া খালি গায়ে, খালি মাথায়, রোদ বৃষ্টিতে মহাপুরুষদের কষ্টও হয় না।

দেবু চুপ করিয়া রহিল। গৌরী জল খাবার সাজাইয়া একখানা রেকাবী দেবুর হাতে দিয়া বলিল—খাইয়ে এস দেখি। চাকর-বাকরের হাতে দেওয়া ত মিথ্যে—পড়েই থাকবে।

পনের দিনেও সিঁড়িটা শেষ হইল না! সেদিন সকালে শিবনাথ মাথায় এক মাথালী দিয়া সিঁড়ির উপর সিমেণ্ট চালাইতেছিল। পনের দিনেই রৌদ্রে তাম্রাভ রং-এ তাহার কালো ছোপ ধরিয়াছে—পিঠখানার রং গাঢ় কালো হইয়া উঠিয়াছে।

পিওন আসিয়া প্রশ্ন করিল--এই, বাবু আছেন রে ?

শিবনাথ মুখ তুলিয়া চাহিতেই সে লজ্জায় জিভ কাটিয়া বলিল—আজ্ঞে, চিনতে পারি নাই আপনাকে। একটা রেজিষ্ট্রি আছে. খারিজ ফিজের নোটিশ।

চিঠি কয়খানা হাতে লইয়া সে হাসিয়া বলিল—রেজিষ্ট্রি ছোট বাবুকে দাও গে যাও।

চিঠিগুলোর কয়খানা কাগজের পত্র, একখানা তাহার মামার, অপরখানা দিয়াছেন তাহার ভগ্নীপতি। ভাগ্নীর বিবাহ আগামী সপ্তাহে, তিনি তাহাকে যাইতে লিখিয়াছেন। দিদিও পত্র দিয়াছেন—এবার দেবুকে পাঠাইলে চলিবে না। তাহাকেই আসিতে হইবে, অন্যথায় তিনিও কখনও আর শিবুর বাড়ী আসিবেন না।

শিবু এ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারিল না। ভগ্নীপতির দেশ বর্ধমান জেলার এক পল্লীগ্রামে—রেল স্টেশন হইতে মাইল পাঁচেক দূরে যাইতে হয়। কাঁচা রাস্তা বর্ষার জলে কাদায় অব্যবহার্য হইয়া উঠিয়াছে। পৌঁছিবামাত্র ভগ্নীপতি সম্বর্ধনা করিলেন—এস এস ভাই, এস। কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে তোমার শিবু ? খালি পা—খালি গা—এ কি !

শিবু হাসিয়া বলিল—চাষার চেহারা আবার কবে সজ্জনের মত হয় জামাইবাবু ! এই ত চাষীর পোষাক।

ভগ্নীপতি উপস্থিত ভদ্রলোক কয়টির দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—ডাক্তারবাবু, ইনিই আপনাদের প্রিয় লেখক শিবনাথ—আমার তালব্য শয়ে আকার লয়ে আকার। কেমন হে ? আর ইনি—

তৎপূর্বেই ডাক্তারবাবুটি আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—আমার পরিচয়—এ ভিলেজ ডক্টর, সামান্য ব্যক্তি। ভারী সুখী হলাম ! ভারী ভাল লাগে আপনার লেখা। আমাদের ক্লাবের লাইব্রেরীতে কিন্তু একদিন যেতে হবে আপনাকে।

ভগ্নীপতি বলিলেন—হবে ডাক্তার, হবে। এখন পনের দিন ছাড়ব মনে করছ ? তবে চোয়াড়ের গলায় ফুলের মালা দিয়ে কি করবে ?

চল হে, বাড়ীর ভেতরে চল—দিদি তোমার দশবার খোঁজ করেছে এর মধ্যে—শিবু এল ?

শিবু বলিল—যে রাস্তা আপনাদের।

বাড়ীর মধ্যে দিদি তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া বলিলেন—এ কি দশা হয়েছে তোর শিবু ? এঁ্যা, সেই শিবু তুই ! বলে না দিলে ত তোকে আমি চিনতেই পারতাম না। বৌ লেখে, শরীর খারাপ হয়েছে তোর, কিন্তু এত খারাপ ! সে রাক্ষুসী সেবা যত্ন করে না নাকি ? বস, বস, আমি বাতাস করি। আর এ কি পোষাক-পরিচ্ছদের শ্রী-রে তোর ?

শিবুনাথ হাসিতে হাসিতে বলিল—এক কাপ চা দাও দেখি আগে।

দিদি ডাকিয়া বলিলেন—অ ভাই বিনী, চায়ের জল চড়িয়ে দাও ত। আর ওরে নবীন—হাত মুখ ধোবার জল দে।

ওদিকের বারান্দায় মেয়েরা দাঁড়াইয়াছিল, সম্মুখেই কতকগুলি ঝিউড়ী মেয়ে—তাদের পিছনে কতকগুলি বধূ। দিদি বলিলেন—মেয়েরা সব দেখতে এসেছে তোকে। আমাদের এখানে লাইব্রেরীতে তোর বই সব আছে কি না—আর সব কাগজেই আছে ত।

শিবু হাসিয়া বলিল—তা ছাড়া তোমার মত সজীব বিজ্ঞাপন যখন রয়েছে, তখন এখানে শিবুর খ্যাতির অভাব কি ?

দিদি বলিল—না রে না, আমি মিথ্যে বড়াই ক'রে বেড়াই না। কিন্তু ও চেহারায় তাকে দেখবে কি বল্ ত ?

শিবু বলিল—ভয় কি দিদি ? জামাইবাবুর অনূঢ়া ভগ্নী ত নাই যে এই চেহারায় বরমাল্য গলায় নিতে হবে—টোপর পরতে হবে।

শিবুর মাথার এক চপেটাঘাত করিয়া ভগ্নীপতি বলিলেন—ওরে শালা, আমাকে পাল্টে শালা বলতে চাও তুমি !

দিদির ননদ বিনী বা বিনোদিনী হাসিতে হাসিতে আসিয়া এক কাপ চা হাতে দিয়া বলিল—দুধ বেশী হয়ে গেছে, গরমও নেই, শিগ্‌গির খেয়ে নিন।

দিদি বলিল—খাসনে শিবু খাসনে, মাড় মাড়—চা নয়।

তাহার পূর্বেই শিবু চুমুক দিয়াছিল—সেটুকু ফেলিয়া দিয়া শিবু বলিল, মাড় খুব পুষ্টিকর জিনিস, সেণ্ট পারসেণ্ট ভিটামিন। আর আমার মত চাষার পক্ষে উপযুক্ত বস্তু।

সকলে হাসিয়া উঠিল।

শিবনাথের উপর পড়িল বরযাত্রী সম্বর্ধনার ভার।

ভগ্নীপতি গোপালবাবু বলিল—দেখো ভাই, সহুরে জীব সব, তার ওপর আসছেন বরযাত্রী, বিজয়ী প্রুসিয়ান সৈন্যের মত বিক্রমে আসবেন। প্রথম মোহড়া তোমাকেই নিতে হবে।

মাথায় তোয়ালে জড়াইয়া শিবু যাইবার জন্য সাজিল, বলিল—কোন চিন্তা নাই আপনার। খান দশেক গো-গাড়ী ও খান দুয়েক পাল্কী লইয়া শিবু স্টেশন হইতে বরযাত্রী আনিবার জন্য যাত্রা করিল। রাস্তায় স্থানে স্থানে এক হাঁটু করিয়া কাদা জমিয়াছে। শিবু যখন স্টেশনে পৌঁছিল তখনও ট্রেনের বিলম্ব ছিল। একজন খাবারওয়ালাকে ধরিয়া সে চায়ের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিল।

বরযাত্রীর দল স্টেশন হইতে বাহির হইয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল।

কাদা! এ কি দেশ বাবা! এ কথা তো ছিল না!

শিবু জোড়হাত করিয়া বলিল, এই আমাদের দেশ। তবে কষ্ট বিশেষ করতে হবে না, যেটুকু কষ্ট ঐ দোকান পর্যন্ত। ওখানে চা খেয়ে গাড়ীতে উঠবেন, বাড়ীর দোরে নামবেন।

একজন বলিল—বলিহারি ইয়ার! জুতোর কাদা ঘুচোবে কে?

বরকর্তা আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, করবে কি আর, উপায় কি? এক কাজ কর, জুতো খুলে ফেল সব।

তরুণ দলের মধ্যে গুঞ্জন উঠিল—জুতো হাতে করে বরযাত্রী যাওয়া, এ ত নতুন।

বরকর্তা বলিলেন—তোমরা জুতো হাতে করবে কেন, ঐ যে সরকার ওকেই দাও সব; এই, জুতোগুলো সব নাও হে তুমি। একখানা

বস্তা আন বরং।

শিবু অদূরবর্তী এক গাড়োয়ানকে ডাকিল—ওরে—

একজন বরযাত্রী তাহার মাথায় সজোরে এক চড় বসাইয়া দিয়া বলিল—ওকে বলা হল ত উনি আবার বলেন ওকে। নে বেটা, তুই নে না। তোকেই নিতে হবে।

ভাবী বৈবাহিক তখন ক্রুদ্ধ মার্জারের মত গোঁফ ফুলাইয়া বলিতেছেন—লোক নাই জন নাই, কি ব্যাপারে সব? পাড়াগাঁয়ের ভদ্রলোক means হাফ চাষা।

শিবু হাসিমুখেই বস্তা ঘাড়ে লইয়া জুতা সংগ্রহ করিতেছিল। সে বেয়াইকে বলিল, আপনার জুতো জোড়াটা?

দোকানে আসিয়া আর এক হাঙ্গামা, ভাঁড়ে চা কি ভদ্রলোকে খায়!

শিবু বলিল—আজ্ঞে কাপের চেয়ে ভাঁড় ভাল, কাপে কত জনে খায়!

একজন বলিয়া উঠিল—আচ্ছা ইম্পার্টিনেন্ট চাকর ত। দে ত রে বেটার কান মলে।

শিবুর সঙ্গে চাপরাশী ছিল জন কয়েক। তাহারা রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ইসারা করিয়া শিবনাথ তাহাদিগকে নীরব থাকিতে আদেশ করিল। যাই হোক—নেশার বস্তু চা এবং সে চা যখন আর রাস্তার মধ্যে পাওয়া যাইবে না, তখন অগত্যা ভাঁড়েই খাইতে হইল। ভাঁড়ে চা বিস্বাদ লাগিল কিনা সে প্রশ্ন করিতে শিবু সাহস করিল না। গাড়ীতে উঠিবার সময় জুতো চাই—শিবনাথ পূর্বেই জুতোগুলি জোড়া মিলাইয়া সারিবন্দী করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছিল। বরযাত্রীরা বলিল—পায়ে যে কাদা, জুতো পায়ে দিই কি করে?

শিবু গাড়োয়ানদের হুকুম করিল—জল এনে দে, বাবুরা পা ধোবেন।

একজন গাড়ীতে বসিয়া পা বাড়াইয়া দিয়া বলিল—এইখানে পা ধুয়ে দাও বাবা, কাদার ওপরে পা ধুয়ে ফল কি?

সহযাত্রীরা তাহাকে তারিফ করিয়া উঠিল—দি আইডিয়া। ব্রেন কি রে বাবা!

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই গাড়ীতে চড়িয়া পা বাড়াইয়া বসিল। গাড়োয়ান পা ধুইয়া গামছা দিয়া মুছিতে উদ্যত হইতেই বরযাত্রীরা বলিয়া উঠিল—থাক্ থাক্। শোন ত হে ইয়ার খানসামা, শোন ত।

শিবনাথ কাছে আসিতেই সে বলিল—খোল ত বাপধন মাথার তোয়ালেখানি, মোছ, পা মুছে দাও।

একে একে সকলের পা মুছিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতেই সে গাড়ীর সঙ্গ ধরিল। গাড়ীতে স্থান তাহাকে কেহ দিল না; অগত্যা সে একজন গাড়োয়ানের স্থানে বসিয়া পাঁচন হাতে গরু ঠেঙাইতে বসিল—হেৎ-তা-তা বাপধন রে আমার!

ভগ্নীপতি গোপালবাবু বলিল—ব্যাপার কি হে শিবু, চাপরাশীরা বললে আমায়, ওরা নাকি তোমার মাথায় চড় মেরেছে, জুতো বইয়েছে—

হাসিয়া বাধা দিয়া শিবনাথ বলিল—যেতে দিন না জামাইবাবু, ওসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে শেষে শুভকর্মে একটা ব্যাঘাত ঘটাবেন?

সজল চক্ষে গোপালবাবু শুধু বলিল—ভাই শিবু!

শিবনাথ তাড়া দিয়া বলিল—যান, কাজে যান। কোথায় কি হয়ে যাবে। শেষে আপনাকে হয়ত, কান নাক মলিয়ে ছাড়বে।

গোপালবাবুও এবার অল্প একটু হাসিয়া বলিল—তোমাকেই ডাকতে এসেছি, আলাপ করবেন বেয়াই মশায়। উনি আবার সাহিত্যরসিক লোক কিনা।

শিবু বলিল—না না, সে হয় না জামাইবাবু। ভারী অপ্রস্তুত হবেন ওরা।

গোপালবাবু বলিল—তুমি না গেলে হয়ত ভাববে তুমি রাগ করেছ, কারণ, জানতে ওরা পারবেই যে তুমিই স্টেশনে আনতে গিয়েছিলে।

শিবুকে দেখা দিতে হইল।

গোপালবাবু শিবুকে সঙ্গে লইয়া আসরে আসিয়া পরিচয় দিতেই গমগমে গরম আসরখানায় কে যেন জল ঢালিয়া দিল। বরযাত্রী

সকলেরই মুখ কালো হইয়া গেল। বরকর্তা উঠিয়া আসিয়া জোড় হাতে সম্মুখে দাঁড়াইলেন। শিবু বলিয়া উঠিল—ডিটেকৃটিভ নভেল লিখব বে-ই মশাই, তাই ছদ্মবেশ প্র্যাকৃটিস করছি।

তুচ্ছ রসিকতা, কিন্তু ইহাতেই সকলে প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইহার পর কিন্তু দুরন্ত বরযাত্রীর দল সুবোধ বালক হইয়া গেল—যাহা পাইল তাহাই খাইল—যাহা অনুরোধ করা হইল তাহাই রাখিল।

বাড়ীতে আসিয়া একথা শিবনাথ প্রকাশ করিল না—গৌরীর উষ্মা আশঙ্কা করিয়া।

সেদিন সে পড়িবার ঘরে বসিয়া একখানা সাপ্তাহিকের একটা প্রবন্ধ পড়িতেছিল। প্রবন্ধটা গল্প সাহিত্যের উপরে লেখা—তাহাতে তাহার সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হইয়াছে। গৌরী ঘরে ঢুকিয়া একখানা খোলা চিঠি তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। শিবনাথ দেখিল, দিদি লিখিয়াছেন চিঠিখানা। সমস্ত কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া পরিশেষে গৌরীকে তিরস্কার করিয়াছেন—তুমি নিশ্চয়ই শিবনাথের সেবা-যত্নে মনোযোগী নও। রত্ন পাইয়া তুই চিনিলি না পোড়ারমুখী।

শিবনাথ মুখ তুলিয়া গৌরীর দিকে চাহিল, তারপর ঈষৎ হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ, বলিনি তোমাকে আমি।

অকস্মাৎ ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া গৌরী কহিল—তুমি চেঞ্জে যাবে কি না বল? নইলে—কথা তাহার অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল।

শিবু বলিল—আবেগ ভাল নয় গৌরী, শোন, আমার কথা শোন!

গৌরী চোখ মুছিল, কিন্তু তাহার ঠোঁট দুইটি কাঁপিতেছিল। সে বলিল—লোকে তোমায় চাকর ভেবে অপমান করে, কতজনে কত কথা বলে। ও বাড়ীর হরির বৌ সেদিন কি বললে জান, বললে—দিদি, বড়ঠাকুর কি নেশা টেশা করেন যে এমন পাক দেওয়া—

তাহার কণ্ঠস্বর আবার রুদ্ধ হইয়া গেল।

শিবু হাসিয়া বলিল—এ যে তোমার মিথ্যে দুঃখ গৌরী!

গৌরী বলিল—না, মিথ্যে নয়। নিজের স্বামী সন্তান কুৎসিত হলেও কেউ সে কথা বল্লে বড় দুঃখ হয়। বুলুর কথা কি মনে নেই তোমার?

শিবু চমকিয়া উঠিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছে।

গৌরী বলিল—বুলুর কথা ত তোমার ভোলবার নয়!

বুলু শিবনাথের মৃতা কন্যা। মেয়েটি শিবনাথের বড় প্রিয় ছিল। কিন্তু সে ছিল কালো, তাহার উপর চোখ দুটি ছিল ছোট ও ট্যারা।

গৌরী বলিল—মনে পড়ে তোমার, গাঙ্গুলীবাবুদের ঠাকুরবাড়ী থেকে যেদিন সে কাঁদতে কাঁদতে—

ঝর ঝর করিয়া গৌরী নিজেই কাঁদিয়া ফেলিল।

শিবনাথের মনশ্চক্ষের উপর ছবিটি ভাসিয়া উঠিল।

শিবনাথ বসিয়া জল খাইতেছিল সেদিন। অঝোর ঝরে কাঁদিতে কাঁদিতে চার বছরের মেয়ে বুলু আসিয়া দাঁড়াইল। সে তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকে লইয়া প্রশ্ন করিল—কি হল মা, কে মারলে তোমাকে?

বুলু উত্তর দিতে পারিল না—চোখের জলে বুকের দুঃখ তখনও তাহার নিঃশেষিত হয় নাই। উত্তর দিল গঙ্গা, শিবনাথের বড় মেয়ে। সে বলিল—ওই ঠাকুরবাড়ী গিয়েছিলাম আমরা পূজো দেখতে। তাই ওদের গিন্নী বল্লে, এই কাদের ছেলে তুই? সরে যা! তা আমি বল্লাম—ও আমার বোন। তাই ওরা কি বল্লে জান বাবা—বল্লে, শিবুর মেয়ে! ওমা কি কুচ্ছিৎ হয়েছে এটা, চোখ দুটো আবার দেখ। শিবু বিয়ে দেবে কি করে গা! বুলু ছুটতে ছুটতে পালিয়ে এল। রাস্তা থেকে কাঁদতে কাঁদতে আসছে।

শিবনাথের মনে পড়িল, সেদিন সে বলিয়াছিল মিথ্যে কথা মা, ওরা মিথ্যে কথা বলেছে; এই দেখ তুমি—আমার চেয়ে কত সুন্দর তুমি!

বুলু সান্ত্বনা পাইলেও শিবনাথের কথা বিশ্বাস করে নাই, সে বলিয়াছিল—বাবা, তুমি কালো আর আমি কালো? ওরা সব সুন্দর!

গৌরী তখন বলিতেছিল—সে আঘাত জীবনে আমি ভুলব না। তুমিও ত সেদিন কেঁদেছিলে।

শিবু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ভুলি নি গৌরী!

গৌরী বলিল—তুমি হাস, কিন্তু আমার বুকে তেমনি আঘাত লাগে! তোমার খ্যাতিতে আমার তৃপ্তি হয় না। তোমার স্বাস্থ্য, তোমার শ্রীতে আমার বেশী তৃপ্তি হয়।

শিবনাথ গৌরীর হাতখানি টানিয়া আপনার কাঁধের উপর রাখিয়া বলিল—এখানটা বড় ধরেছে, একটু হাত বুলিয়ে দাও ত।

গৌরী নীরবে স্বামীর ঘাড়ে হাত বুলাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। আরামে শিবনাথের চোখ বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। মাথাটি হেলাইয়া সে গৌরীর বুকের উপর স্থাপন করিয়া বলিল—আজ থেকে তোমার হাতেই সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করলাম গৌরী। যা করবার তুমি কর।

চোখে জল মুখে হাসি মাখিয়া গৌরী বলিল—তা হ'লে আসছে সপ্তাহেই দিন দেখাই!

এবার চোখ খুলিয়া চোখে চোখ মিলাইয়া শিবু বলিল—কিন্তু আমি সুন্দর হলে আমাকে দেখে তোমার মনে কি বেশী আনন্দ হবে?

গৌরী আরক্তিম হইয়া উঠিল, বলিল···হবে এর চেয়ে ঢের বেশী আনন্দ হবে।

হেমন্ত-গোধূলি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম দেখা কামারকুণ্ডু ষ্টেশনের প্লাটফর্মে। দুটো লাইন মিশেছে এখানে ; নীচে দিয়ে হাওড়া—বর্ধমান কর্ড, ওপরে উঁচু বাঁধ দিয়ে একটা পুল হয়ে তারকেশ্বর ব্রাঞ্চ। জংশন ষ্টেশন, তবে দুটো লাইনের কোনটাতেই তেমন ভিড় থাকে না। মধ্যে কামারকুণ্ডু। দুটো রেল-লাইন ছাড়া আরও একটা টানা রাস্তা আছে, প্ল্যাটফর্ম থেকে একটু সরেই। গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড। তিনটেতে মিলে ষ্টেশন কেন্দ্র করে খানিকটা জায়গা একটু জমকে দিয়ে আবার চারদিকের উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

হেমন্তর বিকাল, সূর্যাস্ত হওয়ার আগেই আকাশে সন্ধ্যার বিষণ্নতা এসে পড়েছে কিছু কিছু। অল্প একটু আগে একেবারে তিনখানা গাড়ি এসে তিনদিকে বেরিয়ে গেল ; ওপরের লাইনে দু'টো, নীচে হাওড়া—বর্ধমানে একটা। ষ্টেশনটা হঠাৎ একটু বেশিরকম গমগমে হয়ে উঠে, অপেক্ষমাণ যাত্রীদের প্রায় সব ক'জনই তিনটে গাড়িতে বেরিয়ে যাওয়ায় তেমনি হঠাৎ আরও বেশিরকম নিঝুম হয়ে পড়ল।

সঞ্জয় নেমেছে ওপরের একটা গাড়ি থেকেই, অর্থাৎ তারকেশ্বর লাইনের। দু' ষ্টেশন আগে হরিপাল থেকে আসছে, যাবে হাওড়া বর্ধমানের ডাউন লাইনে ডানকুনিতে। নেমেছে সাড়ে পাঁচটায়। ওর গাড়ি একঘণ্টা পরে। ওপরের প্ল্যাটফর্মেই একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল সঞ্জয়।

খেয়াঘাটের মতো ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মও মনের ওপর একটা নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ করে সময়টা যদি সন্ধ্যা ঘেঁষা হয়, আর খেয়ার নৌকা বা গাড়ির থাকে বিলম্ব। উঁচু প্ল্যাটফর্মে টানা হাওয়ায় বেশ ভালো লাগতে লাগতে মনটা আস্তে আস্তে বিষণ্ন হয়ে এল সঞ্জয়ের।

দু'টো প্ল্যাটফর্মই শূন্য, ওর মনে হোল এ যেন জীবনেরই সন্ধ্যা, দিনের কাজ সেরে আর সবাই বেশ ঘরে ফিরে গেল, ও-ই রইল একা পড়ে। বড়ই অসহায় বলে মনে হোল যেন নিজেকে, বড়ই নিঃসঙ্গ। ওর খেয়ার নৌকার জন্যে আবার কতদিন থাকতে হবে পথ চেয়ে।

হেমন্ত-গোধূলির ব্যথাতুর সুর, ও-পরিবেশে না এসেই পারে না। অনেকক্ষণ ধরে তার মধ্যে ডুবে রইল সঞ্জয়। এক সময় একটি ছোট যাত্রীদলের অনুচ্চ কোলাহলে একটু চটকা ভেঙে যেতে দেখল দিনের শেষ চিহ্ন মুছে দিয়ে সূর্য পশ্চিম দিগন্তরেখার নীচে বিলীনপ্রায়।

হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে উঠে পড়ল। ডানকুনিতে নামবে, কি সোজাই বেরিয়ে যাবে তখন তাড়াতাড়ি ঠিক করতে না পারায় এই পর্যন্তই টিকিট কিনেছিল। একটা আবার কিনতে হবে। তারপর নীচের লাইনের ডাউন প্লাটফর্মে গিয়ে বসাই ভালো এবার।

তাই যদি করত—করতে পারত—বলাই ঠিক—তাহলে মনটা অন্যমনস্ক হয়ে এ ভাবটা যেত কেটে। এবং সেক্ষেত্রে এ কাহিনীটা সেভাবে শুরু হয়ে যেভাবে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে গেল তার কোন সম্ভাবনা থাকত না।

ওপর থেকে নেমে আসতে আসতে নীচের লাইনের ডাউন প্লাটফর্মের হঠাৎ এক জায়গায় দৃষ্টি পড়তে সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়েই পড়ল সঞ্জয়। একটা গাছের চারদিকে গোল করে গাঁথা রাঙা সিমেণ্টের বেঞ্চে একটি মহিলা কোলে একটা বোধ হয় প্লাস্টিকের বাস্কেট নিয়ে চুপ করে বসে আছে, পাশে জুতো-মোজা হাফপ্যান্ট বুশ-শার্টে ফিটফাট করে সাজানো একটি বছর আটেকের ছেলে। দৃষ্টি তার হঠাৎ আটকে গেল তার কারণ প্ল্যাটফরমটা একেবারে নির্জন। তাহলেও উত্তরপাড়া কি শ্রীরামপুরের প্ল্যাটফর্মে নিশ্চয় দৃষ্টি আকর্ষণ করত না। কিন্তু এই সুদূর মফস্বল ষ্টেশনে, যেখানে মেয়েযাত্রী অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর একরকম রুচিসম্পন্ন গৃহস্থ মহিলার এভাবে, এমন সময় একা গাড়ির প্রতীক্ষা করা কেমন যেন অস্বাভাবিক বলে বোধ হয়। তার ওপর বর্ষীয়সীও নয়, এক

নজরেই যেমন মনে হোল—পঁচিশ ছাব্বিশের বেশি বয়স হবে না। বয়সের দিকে মনটা যেতে সঞ্জয়ের হুঁশ হোল এভাবে ওদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ শোভন হচ্ছে না। দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে নীচের ধাপে পা দিতে থাকে, ছেলেটি হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল। সঞ্জয়ের মনে হোল মহিলাটিই কিছু বলায়। দাঁড়িয়ে উঠেছে ওরই দিকে চেয়ে, সঞ্জয় আর পুলের রাস্তা না ধরে লাইন টপকে এগিয়ে গেল, প্রশ্ন করল—"আমায় কিছু বলবে?"

মেয়েটিও উঠে দাঁড়িয়েছে, সেই উত্তর করল—"একটু মুশকিলে পড়েছি, আপনি এখানেই থাকেন?"

'না'—উত্তরটুকু দিয়ে সঞ্জয় প্রশ্ন করল—'মুশকিলটা কি?'

দৃষ্টি ব্যাকুলভাবে একবার চারিদিক দিয়ে ঘুরিয়ে এনে মেয়েটি অসহায়ের মতো বলল—'কি রকম জায়গা? তিনটের সময় একটা গাড়ি ছিল, সেটা মিস্ করে একেবারে সাড়ে তিনঘণ্টা পরে এইটে। এটাও আবার শুনছি প্রায় লেট থাকে। এমনিই তো সন্ধ্যে হয়ে এল!'

আবার, সেইভাবে দৃষ্টিটা বুলিয়ে আনল চারিদিক দিয়ে।

'কোথায় যাবেন আপনারা?'—প্রশ্ন করল সঞ্জয়।

'ডানকুনি। দেখুন না, এইটুকু, মাত্র ঘণ্টাখানেকের রাস্তা, অথচ একটা গাড়ি ফেল করে এই ঝাড়া সাড়ে তিনঘণ্টা…'

—অনুযোগের সুরে বলেই যাচ্ছিল, সঞ্জয় বাধা দিয়ে বলল—'একটা কথা, সেই থেকে একঠায় এইভাবে বসে আছেন?'

'কি করব? এখানে, না হয় ষ্টেশনে। তার চেয়ে এখানে বরং…'

'চা'টা কিছু খাওয়া হয়নি?'

'তার জন্যে তো…'

'ছেলেটি রয়েছে তো সঙ্গে। একটু অপেক্ষা করুন, এখুনি আসছি আমি।'

প্ল্যাটফর্ম থেকে কয়েক পা গিয়েই গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, কাছাকাছি জায়গাটা একটু একটু ক'রে জমে উঠছে সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। পাশাপাশি দু'তিনটা খাবারের দোকানও রয়েছে। সঞ্জয় একবার ষ্টেশনটা

ঘুরে বেরিয়ে গিয়ে একটা ঠোঙায় ক'রে কিছু খাবার নিয়ে এল।

কাছাকাছি এসে মেয়েটির বিস্মিত চোখের ওপর চোখ রেখে বলল—'আপনি আপত্তি করবেন জানি। আনতুম না—সময়ই থাকত না আনবার—ষ্টেশনে গিয়ে জানতে পারলাম গাড়িটা লেট্ই, প্রায় তিন কোয়ার্টার, তাই আবার বাচ্ছাটি সঙ্গে রয়েছে কিনা···ধর'তো খোকা। চায়ের কথাও বলে এসেছি। আমি একটু জলের ব্যবস্থা দেখি।'

ষ্টেশন থেকেই ঘটি আর গেলাস জোগাড় ক'রে জল এনে দেখল এদের খাওয়া হ'য়ে গেছে। জল খাওয়া হ'য়ে গেলে ও-দু'টো ফেরত দিয়ে চায়ের ভেণ্ডারকে সঙ্গে ক'রেই নিয়ে এল।

মাটির ভাঁড়ে পাশাপাশি দু'কাপ বেঞ্চের ওপর রেখে দিলে মেয়েটি বাস্কেটের মুখ খুলে দাম দেওয়ার জন্য ভ্যানিটি ব্যাগটা বের করবে, সঞ্জয় বলল—'দাম দিয়ে দিয়েছি। কতই বা আর?'

'এর সঙ্গে খাবারের দামটাও তো রয়েছে।'—মেয়েটি অপ্রতিভভাবে হেসে উত্তর করল।

'তাহ'লে অন্তত ছেলেটির জন্যে যা লেগেছে সেটুকু বাদ দিন।'

একটু হাসল মেয়েটিও। আস্তে আস্তে ব্যাগটা আবার বাস্কেটের মধ্যে পুরে দিয়ে ভাঁড়টা তুলে নিয়ে একটু ঘুরে বসল।

একটু দেরি ক'রে পান করা অভ্যাস বোধ হয়, সোজাসুজি ভালো ক'রে দেখবার একটু সময় পেল সঞ্জয়। যদিও দেখবার যেন কিছু নাই, বরং যেটুকু আছে তাতে মনটা আরও উদাস ক'রে ওপর প্ল্যাটফর্মের সেই ব্যাথাতুর ভাবটাই ফিরিয়ে আনল।

পায়ে একটা কালো ষ্ট্র্যাপ-শু, কালো সরু ফিতে-পাড়ের সাদা শাড়ি, সাদাসিধে ভাবেই পরা, একটা সাদা ব্লাউস, বাঁ হাতে একটি রুলি, ডান হাতটা খালি। এই বর্ণহীন নিরাভরণতার মধ্যে যে করুণ কাহিনীটা রয়েছে ইঙ্গিতের আকারে সেটা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সীমন্ত-রেখায়। সেখানেও সিন্দুর নেই। সেই হেমন্ত-গোধূলির সুর—যে সঙ্গে থাকবে তাকে আগেই খেয়াঘাটে বিদায় দিয়ে একলা বসে থাকার। ছেলেটি

রয়েছে, কিন্তু সে তো স্মৃতিটাকে স্পষ্ট ক'রে আরও জাগিয়েই রেখেছে সে মর্মন্তুদ সুরটা।

চা শেষ হলে ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে ঘুরে বসল মেয়েটি ; রুমালে হাত-মুখ মুছে বলল—'ধন্যবাদ। যদিও অযথা এতখানি পরিশ্রম ক'রে লজ্জাতেই ফেলেছেন।'

'কিছু না।'—উত্তর করল সঞ্জয়। বলল—'সময়টুকু পাওয়া গেল, তাই ভাবলাম—ছেলেটি রয়েছে···তা আপনি এসেছিলেন কোথায় এদিকে ? অজানা জায়গা আপনার যেন মনে হচ্ছে।'

'অজানাই।'—উত্তরটা দিয়ে মেয়েটি যেন একটু বিব্রতভাবে বেঞ্চটার দিকে দেখে নিয়ে বলল—'কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন যে।'

গোল বেঞ্চে একজন অপরিচিতা মেয়ের সঙ্গে বসার অসুবিধা আছে। একেবারে কাছাকাছি বসা যায় না, আবার, একটু দূর হয়ে পড়লে দু'জনের মুখ দু'দিকে ঘুরে যায়। কথাটা বলে মেয়েটি উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, সঞ্জয় বলল—'তাতে কি হয়েছে ? আপনি উঠবেন না।'

তখনই আবার মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা ক'রে এগিয়ে অল্প একটু ব্যবধান রেখে তেরছা হয়ে বসে পড়ে বলল—'অজানা যে, বোঝাই যায় সেটা। কি সূত্রে এসেছিলেন ?—এভাবে, একলাই বলতে হয়।'

মেয়েটি চোখ তুলে কি একটু ভাবল, যাতে অন্তরে যে-সুরটা উঠেছে তার জন্যই সঞ্জয়ের মনে হোল, হয়তো নিঃসঙ্গতার কথাটা তোলা ঠিক হয়নি। একটু অপ্রতিভ হয়ে বলল—'যদি আপত্তি থাকে, তো না হয় থাক।'

ঘুরে মুখের ওপর দৃষ্টি রাখল মেয়েটি। সঞ্জয়ের মনে হোল মন থেকে কিছু একটা মুছে দিয়ে একটু হেসেই বলল—'নাঃ, আমি ভাবছিলাম আরও তো একলাই আসতে হোত, তাই ঠিকও করেছিলাম। খোকা বললে—জিদ ধরেই বসল, সঙ্গে আসবে···'

'রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ'।'—একটু হেসে মন্তব্য করল সঞ্জয়। 'তাই অনেকটা। নারে খোকা ?'

পন্থটা নিশ্চয় জানে, ও-বয়েসের প্রায় সব ছেলেমেয়ের মতই। 'ধ্যেৎ' —বলে ঘাড় কাৎ করে একটু হাসল খোকা।

মেয়েটি বলল—'বীরপুরুষের খানিকটা নিগ্রহ গেল। কিন্তু আমি ভাবছি—জিদ করে না এলে এই জনমানবহীন প্ল্যাটফর্‌মে একলা এই তিন ঘণ্টা যে কী ক'রে কাটত।'

'জায়গাটার ওপর যেন আতঙ্ক ধরে গেছে আপনার।'—আবার একটু হেসে বলল সঞ্জয়।

'অস্বীকার করতে পারি না।' হেসেই উত্তর দিয়ে মেয়েটি আগেকার প্রশ্নে এসে পড়ে বলল—'আমি এসেছিলাম একটা ইন্টারভিউয়ে—এইখান থেকে মাইল চারেক দূরে একটা গ্রামে—মেয়ে স্কুলের একটা চাকরি। হয়তো হয়েও যাবে, কিন্তু মুখপাতেই যা অভিজ্ঞতা…'

'রাস্তাঘাট খারাপ?'

'না, সেদিক দিয়ে সুবিধে আছে, গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড থেকে অল্পই ভেতরে যেতে হয়, সেটুকুও খারাপ রাস্তা নয়। ট্রেনের অবস্থার কথা বলছি। একটা যদি ছেড়ে গেল…'

'ভালো না লাগে নেবেন না।'

এর পরে আবার এমন একটা নিস্তব্ধতা এসে গেল যে সঞ্জয়ের মনে হোল এটুকু বলাও একটা ভুল হয়ে গেল আবার। ঘরের কাজ ফুরিয়ে না এলে কি কেউ ঘর ছেড়ে বেরোয়? এই সন্ধ্যায় তো ঘরের দীপ জ্বেলে একজনের জন্য প্রতীক্ষাই করবার কথা। কতদিন যে করেছিল এক সময় তাঁরই কথা হয়তো মনে করিয়ে দিয়ে আজ পদেপদেই আঘাত দেওয়ার একি দুর্ভাগ্য ওর! ভালো করতেই এসো না?

কি করে এ নিস্তব্ধতাটুকু ভাঙবে, ভাঙতে গিয়ে আবার হয়তো কি নূতন স্মৃতি জাগিয়ে তুলবে সেই কথাই ভাবছিল সঞ্জয়। ছেলেটির সঙ্গে আলাপ ক'রে প্রসঙ্গটা বদলেই ফেলতে যাচ্ছে, মেয়েটি আবার দিক-লগ্ন দৃষ্টি হঠাৎ ঘুরিয়ে এনে একটু সচকিত হয়ে উঠেই বলল—'এই দেখুন ভুল! আপনিও আমাদের জন্যে আটকে পড়লেন না তো?'

'না, আমিও এই ট্রেনেই যাবো।'

'এই ট্রেনেই!'—স্পষ্ট একটু উল্লসিত হয়ে উঠেছে। প্রশ্ন করল—'কোথায় নামবেন?'

'ডানকুনিতেই।'

'ওখানেই বাড়ি?'—প্রশ্নটা করে একটু ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থেকে বলল—'এই জন্যে জিজ্ঞেস করছি, আমারও বাড়ি ওখানেই। কিন্তু কখনও আপনাকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।'

সঞ্জয় বলল—'বাড়ি নয় আমার ওখানে। আমি থাকি উত্তরপাড়ায়। একটু কাজ আছে, সেরে বাস ধরে চলে যাব।'

'ভালই হোল'—স্বস্তির স্বরেই বলল মেয়েটি। আমারও বাড়ি ঠিক ডানকুনির মধ্যে নয়। একটু ভেতরের দিকেই যেতে হয়, উত্তরপাড়ার বাসেই। বেশ হোল।'

এরপর আলাপটা একটু ছড়িয়ে পড়ল। খানিকটা ক'রে দু'দিকের পরিচয়। ওর বাড়িতে বিধবা পিসিমা বুড়োই হয়ে এসেছেন। একটি ভাই স্কুল ফাইনালে পড়ছে, আর এই খোকা। দৃষ্টি ছেলেটির ওপর গিয়ে পড়তে একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

সঞ্জয় প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে খোকাকে নিয়েই পড়ল। নাম কি?

খোকার নাম তপনকুমার বসু।

'বীরপুরুষ' হয়ে সে এসেছে সঙ্গে; পারে রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ' আবৃত্তি করতে?

হ্যাঁ পারে খোকা।

করুক না আবৃত্তি তাহলে।

একেবারেই হোল না। তারপর সঙ্কোচ কাটিয়ে প্রস্তুত হয়েছে খোকা; গাড়ির সার্চলাইট এসে পড়ল। লক্ষ্য করা হয়নি, প্ল্যাটফর্মেই ঢুকছে গাড়ি।

ডানকুনিতে নেমে একসঙ্গেই তিনজনে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে আধা-আধি এসেছে, উত্তরপাড়ার বাসটা টানা হর্ন দিয়ে রেলের গেট পেরিয়ে বেরিয়ে গেল। দাঁড়িয়েই পড়ল মেয়েটি। অসহায়ভাবে সঞ্জয়ের দিকে দৃষ্টি তুলে বলল—যাঃ! আবার সেই কখন। এদিকে রাত হয়ে গেছে! খানিকটা পরেই রাস্তাও তো ভালো নয় যে রিকশা করে নোব।'

'সে তো চলেই না একা মেয়েছেলে।' উত্তর করল সঞ্জয়।—একটু ভেবে নিয়ে বলল—'আর একটা রিকশা করে সঙ্গে গেলে কেমন হয়! পরে ওখান থেকে পরের বাস ধরে নোব।'

'কিন্তু আপনার তো কাজ রয়েছে এখানে!'

'কাল এসে সেরে গেলেও হবে।'

রেলের গেটে কিছুটা দেরি হয়ে গেল, একটা মালগাড়ি এসে পড়েছে আপ্ লাইনে। পথও প্রায় মাইলখানেক। রিকশা থেকে নেমে মেয়েটি বলল—'একটুও না হয় আসুন না। এক মিনিটও নয় আমাদের বাড়ি। এত খুসি হবেন পিসিমা!'

'কখন এসে পড়বে বাসটা—' সঞ্জয় উত্তরে বলল।

এসেই পড়েছে। হর্নের শব্দের সঙ্গে দু'টো হেড্ লাইট স্পষ্ট হয়ে উঠল।

'যাঃ!'—নিরাশ হয়ে বলে উঠল মেয়েটি—'একদিন কিন্তু নিশ্চয় আসুন; কী উপকার যে করলেন আজ!'

মোটরের আলো পড়ে চোখ দু'টি চিকচিক করে উঠল। বাস থামিয়ে নমস্কার বিনিময় করে উঠে পড়ল সঞ্জয়।

সমবেদনাই। কিন্তু হেমন্ত-সন্ধ্যায় সুর ধরে এমন গাঢ়ভাবে মনটাকে রাঙিয়ে দিয়েছিল যে, মন নিয়ে একটু বিচারে বসতে হোল সঞ্জয়কে। এ যেন একটা অজানা অনুভূতি—ঐ যে সজল চোখে 'উপকারের' কথা, সেইটুকু ধরে;—কত যে করার আছে, কত যে করা যায়, কত যে করা উচিত···কীই বা পেরেছে করতে ও?

ভয় হয়। বিশ্বাস হয় না নিজেকে। ঐ বর্ণহীন সীমান্তরেখার একটা অলঙ্ঘ্য মর্যাদা আছে। সমবেদনার ছদ্মবেশে যদি অন্য কিছু তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়! বোঝা যায় কি নিজের মনকে সব সময়?

এরপর মাসখানেকের মধ্যে ঐ পথ ধরে যাওয়া আসা করল সভয়ে, তিনবার দিনমানেই, একদিন সন্ধ্যার মুখে। কিন্তু নামল না। এর পরই ঘটনাস্রোত যেন আপনিই ওর পথ ঘেঁষে এসে ওকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল।

ওদের ওখানের মেয়ে-স্কুলের সহকারী সম্পাদক শেখর ওর বন্ধু। একদিন এসে বলল, একটি শিক্ষিকার জায়গা খালি হয়েছে, ওর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যদি কেউ থাকে তো চেষ্টা করে। গ্র্যাজুয়েট হওয়া চাই।

চোখ তুলে ভাবতে একটু বেশি সময় নিতে দেখে বলল—'শুধু পরিচিত হলেও চলে, সত্যি অভাবগ্রস্ত অথচ ভালো, এইরকম।' একটু অনুযোগের সুরে বলল—'এবারেও সিনিয়ার মেম্বার নীলরতনবাবু তাঁর নিজের ক্যাণ্ডিডেট্ বসাতে চান। বাঃ! তা কেন হবে! খাস জমিদারী নাকি!'

স্রোত যেন ছু'দিক থেকে চাপ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল সঞ্জয়কে। বলল—'আছে। ঠিক যেমন চাইছিস সেইরকমই।'

সেইদিনই বিকালে মেয়েটির বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলো। রাস্তার ধারেই তপনের সঙ্গে দেখা। খেলা করছিল, ছুটে এসে বলল—'কৈ এলেন না তো আর?'

'এই তো এসেছি।'—ওদের মতোই একটু রসিকতা করল হেসে সঞ্জয়। প্রশ্ন করল—'সবাই আছেন বাড়িতে?'

'হ্যাঁ।' এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বলল তপন।—'জয়া পিসি এইমাত্তোর স্কুল থেকে এলেন.'

'কে জয়া পিসি!'—দাঁড়িয়েই পড়ল সঞ্জয়।

'বাঃ! সেদিন একসঙ্গে এলাম সবাই, ভুলে গেলে!'

'তোমার মা নয়?'—কী প্রশ্ন করছে যেন হুঁশই নেই সঞ্জয়ের।

'মা কি করে হবেন!'—কৌতুকের আর অন্ত পাচ্ছে না তপন। 'পিসি'-র ওপর একটু জোর দিয়ে বলল—'পিসিমাতো।'

'কে রে—তপু?'—বলে দরজার কাছে এগিয়ে এল জয়া। হঠাৎ আনন্দের বিস্ময়ে চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অনুযোগ করল: 'বাঃ খুব এলেন তো!'

সেদিনের সাজ। পিসিমার কাছে নিয়ে গিয়ে পরিচয় ক'রে দিল: সেদিন যাঁর কথা বলেছিল, যিনি না এসে পড়লে যে কী আতান্তরে পড়তে হোত!···

'আমি এলাম বলে!'—বলে চলে গেল। আনন্দে, চাপা উত্তেজনায় একটু একটু কাঁপছে।

সব সেকেলে বর্ষীয়সীর মতো পিসিমারও বলার অভ্যাস আছে। প্রশ্নও করতে হোল না, আপনি সব বলে গেলেন পরিবারকাহিনী, বিশেষ করে ভাইঝিকে কেন্দ্র করে। বড় ভালো মেয়ে, বড় বুদ্ধিমতী, বি-এ পাস করে এম-এ'ই পড়বে ঠিক করছে এই সময় হঠাৎ বিধি বাম হলেন। নিজে পড়বে কি, কোনও-রকমে কাজল আর তপুকে পড়ানোই একটা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়াল···

অবাঞ্ছনীয় প্রসঙ্গটা এসে পড়তে সঞ্জয় নিজেই অন্য প্রশ্ন তুলে চাপা দিতে যাচ্ছিল, জয়া এসে পড়ল।

শুধু স্কুলের সাজ বদলেই নয়। একটা ট্রেতে ক'রে চা জলখাবারও সাজিয়ে নিয়ে। একটু অনুযোগের স্বরেই বলল—'ওঁকে আর সে-সব শোনানো কেন পিসিমা? মনে ক'রে এতদিন পরে যদিবা একবার এলেন······'

স্কুলের সাজ বদলে এসেছে, কিন্তু প্রায় সেইরকমই। পিসিমাও অনুযোগের সঙ্গেই বললেন—সঞ্জয়কে সাক্ষী মেনে—'বলি কি সাধ করে বাবা? নিজের দিকেও তো একটু চাইতে হয়। এই বয়সে সব সাধ আহ্লাদ খুইয়ে···'

এবারেও তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে দিল সঞ্জয়; এবার তার আসার

উদ্দেশ্যটা এনে ফেলে। জয়াকেই আগে শোনাবে বলে রেখে দিয়েছিল।

চাকরিটা হ'য়ে যেতে যাওয়া-আসা, মেলা-মেশাটা স্বভাবতই গেল বেড়ে। একটি কৃতজ্ঞ পরিবার নিবিড়ভাবেই ওকে আপন ক'রে নিতে তৎপর হয়ে উঠল।···

এ-কাহিনীর নটে গাছটি এইখানেই মুড়িয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু তা পারল না। হয়তো সম্ভবই ছিল না হওয়া। সম্ভব ছিল না, সেদিন সন্ধ্যায় কামারকুণ্ডুর প্ল্যাটফরমে ঘনিয়ে আসা সেই অহেতুক সুরটুকুর জন্য যেটা সত্যসত্যই মূর্তি পেল জয়া তপনের মধ্যে। একটু যে ভুল ভাঙল—তপন জয়ার ছেলে নয়, অতীত স্মৃতির শেষ অবলম্বন নয়, ভাইপো, এতে সেই ব্যথার পূরবীতে কি কোনও পরিবর্ত্তন এনে দিতে পারল? পারল না যে তার কারণ জয়ার জীবনের যা মূল ট্রাজেডি সেটা তো যেমনকার তেমনিই গেল থেকে।

কটা মাস গেল কেটে। যেটা সমবেদনায় হয়েছিল শুরু সেটা মনের অজ্ঞাত কন্দরে কি রূপ নিচ্ছে পরিচয় আর অন্তরঙ্গতার অনুকূল বায়ু পেয়ে ঠিক বুঝতে পারে না সঞ্জয়। শুধু একটা ইচ্ছা, ওর ভালো করবার, ওর ললাট থেকে চিন্তার ছায়া মিটিয়ে দেওয়ার একটা দুর্বার বাসনা যেন পাগল ক'রে দিতে লাগল সঞ্জয়কে। দিনদিনই। তার জন্য যে-কোন আত্মত্যাগ যেন অপর্যাপ্তই বলে মনে হয়। কাজটা ভালো ছোট পরিবারটি সুখী, জয়াও (যদিও জয়াকে বাহ্যতঃ কবে অসুখী দেখেছে তাও মনে পড়ে না), তবু ওরই মনের অতৃপ্তি কেন যে ছড়িয়ে থাকতে দেখে জয়ার মুখে, বুঝে উঠতে পারে না সঞ্জয়।

তারপর একদিন বুঝল। হয়তো শিউরে উঠেই থাকবে প্রথমটা। সঞ্জয় ছেড়ে দিল আর ওদিকে যাওয়া, প্রায় মাস দুই। তাতে ফল এইটুকুই হোল, দেহটাকে সারিয়ে নিতে মনটার একমাত্র আশ্রয় হয়ে উঠল জয়াদের ছায়াস্নিগ্ধ নিলয়টুকু। হাসিখুশির সব ছবিগুলি যায় মুছে।

কি ক'রে বুঝতে পারে না, শুধু একটি ছবি দৃষ্টির সামনে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, সেই প্রথম দিনের ছবি—সামনের বেঞ্চটিতে দিনশেষের মলিন আলোয় নিজের নিঃসঙ্গতা নিয়ে আছে বসে জয়া। এবার উল্টো স্রোত বইল। আর একবার মন নিয়ে বিচারে বসল সঞ্জয়। তাতে একটা জিনিস আবিষ্কার করল—ও যদি চরম আত্মোৎসর্গই করতে চায় জয়াকে সুখী করবার জন্য, তার পথ তো রয়েছে খোলা, অবশ্য জয়া যদি রাজী হয়। জানে, যুগটা একেবারে প্রতিকূল না হলেও, এখনও খানিকটা লোকলজ্জা খানিকটা সমাজভয় আছেই। উপায় নেই বলেই আর ভয় নেই। তাতেই ওর আত্মত্যাগ আরও মহীয়ান হয়ে উঠবে।

তপন যে জয়ার সন্তান নয় এতে পথ খানিকটা সুগমও হয়েছে।

দু'মাস পরে আবার একদিন গিয়ে উঠল।

পরিস্থিতিটা ছিল বেশ অনুকূল। রবিবার, একটা ম্যাচ দেখতে কাজল আর তপন গেছে ডানকুনিতে বেরিয়ে।

জয়া মুখভার করেই অভ্যর্থনা করল—'পড়ল মনে সঞ্জয়দার। আজ ঠিক একমাস সাতাশ দিন পরে এলেন!'

'আশা করেছিলাম কাজল গিয়ে একদিন খোঁজ নিয়ে আসবে।'

একটা উত্তর দিল সঞ্জয়, তোয়েরই ছিল, তবে মুখভারটুকু ভালোই লাগল; দিনগোনাটুকু আরও ভালো। ঠিক ক'রে নিল আজই বলবার দিন, নৈলে আর হবে না।

চা-জলখাবার খেয়ে পিসিমার সঙ্গে খানিকটা গল্প ক'রে ওরা দু'জনে ঘাটে গিয়ে বসল। একটা মাঝারি আকারের খিড়কির পুকুর আছে বাঁধানো ঘাট, কাজল তপন থাকলে চারজনে বসে গল্প-স[illegible] করত।

দেরি করল না সঞ্জয়। বুকটা দুরু দুরু করছে। নিতান্তই এক আধটা এদিক-ওদিক কথা শেষ করে বলল—'এক মাস সাতা[illegible]

দিনের কথা বলছ জয়া, কিন্তু আর হয়তো একেবারেই না আসতে পারি।'

'কেন !!'—উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠে একেবারে কয়েকটা প্রশ্ন ক'রে বসল—'বাইরে চলে যাচ্ছেন কোথায় ? ভালো লাগে না এখানটা ? আমাদের কিছু দোষত্রুটি হ'য়ে গেছে নাকি সঞ্জয়দা ?'

একটু চুপ ক'রে রইল সঞ্জয়, বুকের তুরুতুরুটা বেড়ে গেছে, তারপর ঢোঁক গিলে বলল—'পিসিমা কি তোমার খুব সেকেলে জয়া ?'

'হঠাৎ যে একথা ?'

'আজ একটা কথা বলতে এসেছি তাঁকে, তিনি রাজী না হ'লে আমার এখানে আর আসা সত্যই বন্ধ রাখতে হবে। অবশ্য তার আগে তোমার মত। তোমায় নিয়ে তো কথা।...'

চুপ ক'রে রইল জয়া মাথা হেঁট করে। যে দিন গোনে তার বুঝতে দেরি হবে কেন ? তার বুকও যে তুরুতুরু করেই ওঠে। চুপ ক'রেই বলে একটু তারপর লজ্জার দিকটা এড়িয়ে প্রশ্নের আকারেই একটা বেশ মাঝামাঝি উত্তর গড়ে নিল। বলল—'সব কিছুই তো তাঁর ওপর নির্ভর করে। কি বলবেন না বলবেন আমি কি ক'রে জানব ?'

হেসে জিজ্ঞেস করল—'কিন্তু হঠাৎ একেলে কি সেকেলে একথা জিজ্ঞেস করলেন যে ?'

কি করে কোন্ ভাষায় বলবে যেন ভেবে উঠতে পারছে না সঞ্জয়। কিন্তু লগ্নটা আজ এত সদয় হ'য়েই এসেছে যে বলে দিয়ে নিজের অদৃষ্ট পরীক্ষা না করলেও তো নয় !

ভেঙে ভেঙে যেতে লাগল কথাগুলো—'আমি বলছিলাম—বলছিলাম য়া তোমার সিঁথিতে সিঁদুর—মানে তাহলে আমি যে আশঙ্কা করছিলাম...'

অবাক হয়ে মুখের দিকে চেয়ে আছে জয়া, কৌতুক লজ্জাটাকেও যেন ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। একটু চেয়ে থেকে বলল—'কী আপনার আশঙ্কা কি ক'রে জানব ? কিন্তু কিছু না হ'লে সিঁদুর যে আসবে কোথা

থেকে তাও তো…'

—বলতে বলতেই দু'হাতে মুখ ঢেকে খিলখিল ক'রে হেসে লুটিয়ে পড়ল।

সবচেয়ে হাসির কথাটা কিন্তু সঞ্জয়ের কাছে রয়ে গেল। ওর এক এক সময় মনে হয় (হাসিও পায় বৈ কি তাতে) যে, জয়াকে পাওয়ার মধ্যে কোথায় যেন একটা খুঁৎ থেকে গেল। যেন যথেষ্ট করা হোল না ওকে পেতে। যেন চরম আত্মত্যাগ ক'রে উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হোল না। যেন, যেমন আশা করেছিল (কিংবা আশঙ্কাই), কুমারী না হয়ে জয়া যদি বিধবাই হোত তো আপশোসের আর কিছুই থাকত না।

●

হাসির অশ্রু

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

গাড়িতে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল বিকেলটা যে সন্ধ্যা হয়ে উঠেছে। একটা ঝাপসা নীল মেঘের স্তর দক্ষিণ দিকে উঠে সমস্ত আকাশটা ছেয়ে ফেললে, তারপর ক্রমাগতই হাল্‌কা হাল্‌কা মেঘের স্তূপে সেটা পুরু হয়ে উঠছে। রেন্‌কোটটা বাসায় ফেলে এসে ভুল করেছে গিরীন। মেঘ দেখে আজ বড় অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে, তবুও কথাটা এক-একবার মনে পড়ছিল ; এ যা বৃষ্টি নামবে, শুধু ছাতায় তার কিছুই আটকানো যাবে না।

গাড়ি থেকে নেমে যখন রিক্‌সতে উঠেছে, একেবারে মুষলধারায় বৃষ্টি নামল। তখন মনে পড়ল ছাতাটাও গাড়িতে এসেছে ভুলে। তখন কিন্তু আর উপায় নেই, গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, প্লাটফর্মের শেষে গার্ডের গাড়ির লালটুকু যাচ্ছে দেখা।

পাড়াগাঁয়ের সাইকেল-রিক্‌স, ছইয়ের কাপড়টা শতছিন্ন। চেনা রিক্‌সওলা দুলাল সেই লজ্জাতেই বললে, 'না হয় ফিরে যাবেন দাদাবাবু ইষ্টিশেনে ?···কাপড়টা আজ-কাল করে পাল্‌টানো হয় নি···'

'তোর কষ্ট হবে ?···ফিরে গেলে কিন্তু আজ আর বেরুতে পারা যাবে না স্টেশন থেকে !'

'কি যে কন দাদাবাবু। আমার কথাই যেন ভাবছি !'

জোর পা চালিয়ে দিলে দুলাল।

গিরীনই কি নিজের কথা ভাবছে ? নিজের কথা যে ভাবে, সে কি ভরা শ্রাবণে নিজের রেন্‌কোট বাসায় ফেলে আসে ? তারপরেও কি চৈতন্যোদয় না হয়ে, অমন ঘনঘটা দেখেও ছাতাটা দাতব্য করে আসে রেলগাড়িকে ?······অথচ এই বর্ষার চিত্রই অনুক্ষণ তার চোখের সামনে ভাসছিল।

অবশ্য তার কোলে আছে আরও একটি চিত্র, মেঘের কোলে বিদ্যুতের মতই। প্রভেদ এই যে বিদ্যুৎটি স্থির, নিরবচ্ছিন্নতার দীপ্তি মনের আকাশে।

বাড়িতে সুরবালা এসেছে আজ দিন সাত হলো। মাঝের এই কটা দিন যে কি করে কেটেছে, তা যার কেটেছে সে-ই জানে। কিন্তু বৃষ্টির জলের সঙ্গে সে আপসোসটা ধুয়ে যাচ্ছে গিরীনের, ও-যেন আদর করে গা পেতে নিচ্ছে বর্ষার ধারাকে। আজকের এই মেঘ-মেদুর অম্বর, সব লুপ্ত করা অবিরাম ধারাপাত—এ যে একান্তই ওদের দু'জনের জন্যে। এই যে সন্ধ্যাকে এগিয়ে আনা, এ তো ওদের মিলন-রজনীকে দীর্ঘ করবার জন্যেই—দিনের খানিকটা অংশ ছিন্ন করে নিয়ে তার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে।··· কার উপর অসীম কৃতজ্ঞতায় মনটা আসছে ভরে।

দুলাল বলছে, 'জ্বর-জ্বালা যে হচ্ছে বড় গাঁয়ে, সেই ভয়—নইলে বর্ষার কি আর ভিজে না লোকে? ভিজে—তবে, ঐ জ্বর-জ্বালা যে হচ্ছে বড়···'

—তা হোক জ্বর, সে ত আশীর্বাদ, ছুটি নেবার পথ খুলবে, সেবার হাতে সুরবালা থাকবে বসে পাশটিতে। কিছু একটা বলতে হয়, সেই জন্যেই বললে, 'তা হোক, তুই একটু জোরে পা চালা দিকিন···'

—আজ সব চিন্তার মাঝেই যে সুরবালা এসে পড়ছে। রাস্তার সামনেই যে দোতলার ঘরটা, ফুলশয্যা দিয়ে যেটা ওদের দু'জনের ঘর করে দেওয়া হয়েছে, তার জানলার গরাদ ধরে সুরবালা আছে পথের পানে চেয়ে···ভাগ্যিস বৃষ্টিটা সামনা-সামনি নয়···কিন্তু তবুও তো পাশ ঘেঁষে আসছেই খানিকটা ছাট······সুরবালার কি সাড় আছে কতটা ভিজল, কতটা শুক্‌নো রইল?···চারিদিকে এই জ্বর-জ্বালা!···'আর একটু পা চালাতে পারিস না দুলাল? তোর জন্যেই বলছি, যতটা কম ভিজিস···'

'ছাটটা যে উল্টো আসছে, নইলে···এই ত সিদিন নতুন বৌদিদিরা এল—তেনার ক্যাকা, ছোট বোন—বৌদিদি দু' বোনেরা আমারই রিক্সয়

ছেলো তো—বলোদ-গাড়িতে মালপত্তর···সিদিনও ত বিষ্টি ছেলো গো, তবে এই রকম উলটো ছাট কি?···শুদিও না লতুন বৌদিকে—ড্যাংডেঙিয়ে নে গিয়ে দরজায় দাখিল করলুম···'

—গিরীন হাতটা সিটের গদির ওপর আস্তে আস্তে বুলাতে লাগল—সুরবালার বসে থাকাটুকুকে যে শত বৃষ্টিতেও ধুয়ে ফেলতে পারে না; বললে, 'না হয় আস্তেই চালা, তাড়া কিসের এমন? ট্রেন ধরতে তো যাচ্ছে না লোকে।···হ্যাঁরে, ওরাও তোর এই ছেঁড়া রিক্‌সয় বৃষ্টি মাথায় করে···!'

'কি যে বলে দাদাবাবু!—তিনখানা রিক্‌সা; য'তে ভাবছে আমার রিক্‌সায় চাপুক লতুন বৌদি, ব'দে ভাবছে আমার রিক্‌সায় চাপুক, আমিও কোন্ না সেই কথাই ভাবছি মনে মনে, কর্তা বললেন, দুলালের খানাতেই উঠুন বৌমা ওঁর বোনকে নিয়ে, ওর হুড়ের কাপড়টা ভালো। ভালোই ছেলো কিনা, এই পরশুকার ঝড়ে রিক্‌সাসুদ্ধু উলটে দিয়ে দিলে যে ফাৎরাফাঁই করে···'

গিরীন সিটটাতে সেই রকম আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে, ঝড়ে উলটেছিল বলে আরও যেন মায়া পড়ে গেছে রিক্‌সাটার উপর; বললে, 'তা মেরামত করিয়ে নে কাপড়টা।'

'আমার নাম দুলাল হাজরা দাদাবাবু; ওদের মত সেলাই তালি দেওয়া রিক্‌সা ঠেলতে আমার পা ওঠে না।···তা পয় আছে লতুন বৌদির, সমস্ত হপ্তাটা কামালুম কি রকম। এবার যা হুড়ের কাপড় কিনব ভেবে রেখেছি···'

গিরীন একটু হেসে বললে, 'কিন্তু পয় যে বলছিলি, রিক্‌সা তো তোর গেল উলটে—'

'আর ব'দের যে চাকাই দিলে তেউড়ে, য'তে এখনও পায়ে চুণ-হলুদ নাগাচ্ছে—হিসেব করে দেখুন নোকসানটা। দাদাবাবু বলে পয় নেই!'

একটু চুপ করে রইল গিরীন; তারপর প্রশ্ন করলে, 'তা কত

জমল তোর—নতুন কাপড় যে কিনবি ?'

'ন'টা টাকা লাগবে, সাতটা জমেয় ফেলেছি—কাল হাটের মোয়াড়াটা একাই সামলালুম তো…'

বাইরেটা যে পরিমাণ ভিজল, ভেতরটা ভিজেছে তার চেয়ে ঢের বেশী ; সেখানে তো সাতটা দিনের মেঘ জমে গুমরাচ্ছিল। রিক্‌সা থেকে নেমে ভাড়ার উপর দুটো টাকা বেশী দিলে দুলালকে। ছেলেটা ভাল, একটু লজ্জিতভাবে বললে, 'তা আপনি কেন গুনোগাৎ দেবে দাদাবাবু ; ঝড়ে লোকসান করেছে—সবারই করেছে…'

গিরীন হেসে বললে, 'এ তো গুনোগাৎ নয়—আর তা যদি বললি, আমি নিজের পকেট থেকে দিচ্ছি নাকি ? আদায় করব না তোর বৌদির কাছ থেকে !'

বেশ লাগছিল—গরীব, বিস্তর প্রভেদ গ্রাম-সম্পর্কে বৌদিদি পাতিয়ে বসেছে, হয়তো নিজের অন্তরের প্রেরণাতেই ; এনে যে পৌঁছে দিয়েছে তার গুমর রাখবার জায়গা নেই। আজকের যে সুর তার সঙ্গে চমৎকার মিলে যাচ্ছে।

দুলালও কি ভেবে হাসলে, বললে, 'তা যদি বলছ তো দ্যাও ; তা হলে ভিতরকার কথাটাও বলি দাদাবাবু, আনলুম লতুন বৌদিকে—রিক্‌সার এক হিসাবে জন্ম পাল্‌টে যাওয়াই তো, তা কর্তাবাবু বক্‌শিস করলেন মোটে চার গণ্ডা পয়সা। ভাগ্যিস একটু আড়ালে ছিলুম বলে কারুর নজরে পড়ে নি—সেটাকে আট গণ্ডা বলে চালিয়ে দিলুম।…তা দ্যাও—সোয়ামী হোল গিয়ে ইস্তিরীর অর্ধাঙ্গিনী, মনে করব লতুন বৌদিদির পয়মন্ত হাত থেকেই নিলুম।'

এ পর্যন্ত গৌরচন্দ্রিকা তো বেশ হলো কিন্তু মূল গান এসে পড়া পর্যন্ত যে ক্রমাগতই বেসুরা চলেছে, তার কি করা যায় ?

রিক্‌সাটাকে রাস্তা থেকেই বিদায় করে দিয়েছিল। তারপর বাগানের মধ্যে প্রবেশ করে পুকুরের পাশ দিয়ে খানিকটা গিয়ে বাড়িটা। জল-

কাদার মধ্যে দিয়ে মাইল দেড়েকের পথ, সন্ধ্যা প্রায় হয়েই এসেছে; গাছের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে গেলে সুরবালা যে জানলা ধরে দাঁড়িয়ে আছে, অনেকখানি দেখা যাবে; নইলে রিক্সা আসছে দেখে সে আগে-আগেই সরে দাঁড়াবে না?

গোটা তিনেক গাছের আড়াল কাটিয়েই একটা বাঁকের মুখ থেকে উপরের জানলাটা দেখা যায়। জানলাটা নিতান্ত নির্বিকার ভাবেই রয়েছে বন্ধ!

একটা আঘাত লাগল, তবে খুব বেশী নয়। দাঁড়িয়ে যে থাকবেই একথা তো লেখা ছিল না চিঠিতে; একটা আন্দাজ করে নেওয়া। নানা কারণেই সে আন্দাজ না ফলতে পারে; কিংবা হয়ত ছিল দাঁড়িয়ে, বিলম্ব দেখে সরে গেছে। আর এও তো ভাববার কথা—এক-বাড়ি লোক, নূতন বউ সে স্বামীর পথ চেয়ে কতক্ষণ ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে?···আন্দাজটাই কি ভুল হয় নি?

তবুও হলো নিরাশ। নব-বিবাহিতের মন—কোথা দিয়ে কি হয়, সে যেন কোন যুক্তিই মানতে চায় না। একটু যেন অভিমান নিয়েই বাড়িতে প্রবেশ করলে গিরীন।

তারপর এই অভিমানই যাচ্ছে যেন ক্রমশ বেড়ে, চেষ্টা করছে ঠেকিয়ে রাখতে যুক্তি দিয়ে, কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে যেন।

প্রথমত তার এই ধারাস্নান—এই ভিজে চুপসে যাওয়া নিয়ে বাড়িতে যে একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেল—'তোয়ালে আন্—কাপড় দে শুক্‌নো, চা কর শিগ্‌গির—একি কাণ্ড! না হয় না-ই আসতে আজ!—'

—আশঙ্কা অনুযোগ ভর্ৎসনা, এর মধ্যে সুরবালা কোথায়? মন বোঝায়—মা, বোন, ভাজ, ওঘর থেকে বাবাও যোগ দিচ্ছেন, এর মধ্যে সুরবালার স্থান হয় কি করে? কিন্তু বোঝালে শোনে কে?—

মনে হয়—তবুও···

তবুও কি?···তবুও একজনের ডুরে শাড়ির একটুখানি আঁচল কি এই বাদুলে হাওয়ায় কাছের কোন দোরের আড়াল থেকে একটু উড়ে আসতে

পারত না? গুরুজনদের সামনে একজনের সংযম কি চুটো চুড়ির শিঞ্চনেও একটু শিথিল হয়ে যেতে পারত না?

নীচেই অনেকক্ষণ দেরি করলে গিরীন। জামা-কাপড় নীচেই ছাড়লে, তারপর গল্প-গুজব। কিন্তু সুরবালা বলে যে-কোনও জীব বাড়িতে আছে তার তো কোন লক্ষণই নেই। তারপর মনে হলো উপরেও তো থাকতে পারে তারই প্রতীক্ষায়। যেমন বলা উচিত, উপরেই সবাইকে আসতে বলে সিঁড়ির দিকে এগুল। কেউ আসছে না দেখে একটু আশাও হলো, তারপর গিয়ে দেখে উপরের ঘরও শূন্য।

নূতন করে এই অভিমানটুকু বেশ ভাল হয়ে জমে উঠবার আগেই কিন্তু সুরবালা এসে উপস্থিত হলো। হাতে খাবারের রেকাবি আর চায়ের পেয়ালা।

গিরীন প্রথম সম্ভাষণ করলে—'তুমি এখানেই আছ নাকি?'

সুরবালা একটু চোখ তুলে চেয়ে হাসলে, রেকাবি আর ডিসসুদ্ধ চায়ের পেয়ালা একটা ছোট টেবিলের উপর রেখে টেবিলটা সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'না থাকলে কি একজন এই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে···'

'আসত? ঠিক কথা। কিন্তু এল যে, সেকথা কি একজনের মনে ছিল?'

'এই দেখ, এসেই কবিত্ব, আমার ঘর বিছানাপত্তর ভিজে যাবে যে!'—

তাড়াতাড়ি গিয়ে সুরবালা সামনের জানলাটা বন্ধ করে দিলে, তারপর বিছানার একটা কোণে, গিরীনের চেয়ারের সামনা-সামনি হয়ে বসে বললে, 'চা-টুকু আগে খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে!···মনে থাকবার কথা বলছ, নিজের পায়ের তদারক করারই ফুরসত নেই তো পরের কথা মনে থাকবে কি?'

চায়ের কাপটা ঠোঁটের কাছে নিয়ে গিয়ে গিরীন থমকে গেল, জিজ্ঞাসা করলে, 'কি হলো পায়ে?'

'মচকে গিয়ে যা ব্যথা! রান্নাঘরে বসে ফোমেণ্ট দিচ্ছিলাম··· খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেড়াচ্ছি বিকেল থেকে···কে জিজ্ঞেস করে বল

সে কথা ?

'কই, এখন তো খোঁড়াচ্ছিলে না···মানে, তাইতে জিজ্ঞেস করি নি আমি···কই, দেখি কোন্‌খানটা।'

উঠে এগিয়ে যাবার আগেই সুরবালা চাপা গলায় খিল খিল করে হেসে উঠল, বললে, 'বসো, কি জ্বালা! ফোমেণ্টের ব্যবস্থা না হলে তোমার চায়ের জল তৈয়ের থাকত কি করে? কাপড় ছেড়েই যে এক কাপ পেলে! হ্যাঁ, এইবার গিয়ে বলে দাও যে, ওঁদের বউ উপরে এসে আর খোঁড়াচ্ছে না!'

মুখে কাপড় চেপে হাসতে লাগল।

মুখে অল্প হাসি নিয়ে ছোট ছোট চুমুকে চা খেতে লাগল গিরীন, দুষ্টুমির কথাটুকু ভেবে মাঝে মাঝে চাইছে সুরবালার দিকে। বৃষ্টিটা একটু যেন নরম হয়েছিল, জানলার উপর ঝাপটায় মনে হচ্ছে আবার জোর হলো।

বললে, 'খুলে দেবে না জানলাটা?'

'কি গেরো? জানলা না খুললে···আমার কিন্তু মচকানো পা, বারবার ওঠা-নামা করতে পারব না, জানলা খুলে ঐদিক দিয়ে নেমে যাব। আমার কাজ রয়েছে বিস্তর।'

'মচকানো পা নিয়ে শুয়ে থাকাই ভাল '

'মচকানো পা নিয়ে খেটে বেড়ানো আরও ভাল। সবাই ভাববে—দেখেছ, কি কাজের বউ! এ বউ কি কে এল বাড়িতে, কে গেল, তার খোঁজ রাখতে পারে?'

গিরীন নিজেই গিয়ে জানলাটা খুলে দিলে। ফিরে দেখলে কিন্তু সুরবালা একেবারে সিঁড়ির কাছে। দু'পা এগিয়ে এসে বললে, 'খেয়ে নাও ওগুনো, দিব্যি রইল; আমার ফুরসত নেই এখন বসবার;···বিকেলে মাছ পায় নি, পুকুরে জাল ফেলতে বলেছেন বাবা···'

'তুমি ফেলবে?'

সিঁড়ির একটা ধাপে পা দিয়েছে স্থরবালা, আঙ্গুলটা উঁচিয়ে ঠোঁট নেড়ে জানালে—'পাবে উত্তর।'

এই রকম করে ক্রমাগতই যতিভঙ্গ করে চলেছে স্থরবালা—ক্রমাগতই। বাইরের দুর্যোগ অন্তরের ব্যাকুলতাকে যত দিচ্ছে জাগিয়ে, যত মনে হচ্ছে সার্থক করে তুলি আজকে এই দুর্লভ রাত্রিটিকে, ততই সে ওর এই ছোট ছোট আঘাত দিয়ে, ওর এই অকরুণ হাসি দিয়ে যেন সেটাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। বিশেষ করে এই হাসি—এতটুকু ভাবালুতাকে একমুহূর্তের জন্যও দাঁড়াতে দিচ্ছে না ; এ কি রোগ দাঁড়িয়েছে নূতন।

ভাল হয়তো লাগছে, তার কারণ স্থরবালার সবকিছুই ভালো। কিন্তু তবুও আজকের রাত্রিটি যদি এই করে হয় বিফল—ওর মনের স্থরের সঙ্গে স্থরবালার মনের মিল না থাকে—তা হলে সে আপসোস রাখবার জায়গা কোথায় ওর ? বিয়ের পর এই প্রথম এই রকম একটি বর্ষা রজনী···

কোন রকমে ওর মনের ঠিক তন্ত্রীটিতে দেওয়া যায় না একটু আঘাত ?

সেই উদ্দেশ্যে গল্পটা বলছে গিরীন। মনে করেছিল কখনও বলবে না।···তোমায় পেতে আমার যে কি আত্মত্যাগ—তোমার মহিমায় মুগ্ধ হয়ে একদিন আমার মনও যে কি মহিমময় হয়ে উঠেছিল, একথা কি যায় মুখ ফুটে বলা ? তবু হচ্ছে বলতে—আজ ওর জন্যে যতই দু' হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, ততই আলেয়ার মত ও যাচ্ছে পেছিয়ে ; অথচ একদিন কত আশা নিয়েই না এই স্থরবালার দ্বারে উপস্থিত হয়েছিল সে, ওর মত নিঃশেষ করে কেউই বোধহয়, নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারবে না—

সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে এতক্ষণ পরে পেয়েছে স্থরবালাকে। সমস্ত সংসারের চঞ্চলতা, সব শব্দ থেমে গিয়ে বর্ষার সঙ্গীতটুকু আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—শুধু ঝরঝর শব্দের সঙ্গে ভেকের অবিরাম কলরব। রাত্রিটুকু দুটি প্রাণীর হাতে তুলে দিয়ে সমস্ত পল্লী গভীর স্থপ্তিতে মগ্ন।

জানলাটা খোলা, সামনে একটা কৌচের একটি ধারে গিরীন বসে অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে। সুরবালা আসে নি, পাশেই বিছানা, তাইতেই আছে শুয়ে। অবশ্য জেগেই আছে, গল্পও করছে।

আহ্বানের উত্তরে হেসে বললে—'কি করব, আমি কবি নই, খেটেখুটে এসে বিছানাটাই লাগছে ভাল।'

গল্পই হচ্ছিল—একথা-সেকথা নিয়ে। গিরীন বললে, 'যখন এসে পড়ে কবিত্বের লগ্ন তখন কবি হওয়াতেই লাভ—এই রকম একটি লগ্নে সাড়া দিয়ে আমি একদিন আমার জীবনের যা সবচেয়ে পরম সম্পদ তাই পেয়েছি...'

সুরবালা মাথাটা ঘুরিয়ে দুষ্টুমি করে ভ্রূ কুঁচকে বললে, 'তোমার পরম সম্পদ তো শ্রীমতী সুরবালা দেবী—এই তো এতদিন জানতাম...'

উপরে শুধু ওরা দুজনেই, ছাতের দরজাও বন্ধ; তার উপর বর্ষণের শব্দ—বেশ মুক্তভাবেই হেসে উঠল একটু।

গিরীন বললে, 'শ্রীল শ্রীযুক্তেশ্বরী সুরবালা দেবীরই কথা হচ্ছে।'

'মহারাণী'টা জুড়ে দাও...পরম সম্পদই তো।'

'শ্রীল শ্রীযুক্তেশ্বরী মহারাণী সুরবালা দেবীর কথা।'

'শুনতে হয়তো তা হলে।'

'তা হলে আসতে হয় এখানে।'

সুরবালা খিলখিল করে হেসে ঘুরে শুল।

'কি হলো আবার?'—বিস্মিত ভাবেই প্রশ্ন করলে গিরীন।

'মহারাণীর হুকুম—এইখানে এসে কবিকে তার কাব্যকাহিনী শোনাতে হবে।'

এই পথেই চালিয়ে নিয়ে আসছিল, বিজয়িনীর মত আরও মুক্তকণ্ঠে হেসে উঠল।

গিরীন উঠে গেল, একটা হাত চেপে ধরে বললে, 'দোহাই তোমার সুরো, এই রকম হাসি দিয়ে আজকের এমন রাতটা আর দিও না ছিন্নভিন্ন করে। ওঠ, লক্ষ্মীটি।'

খানিকটা জোর করেই টেনে নিয়ে এসে কৌচটাতে দিলে বসিয়ে। সামনের অন্ধকারের গায়ে স্মৃতির বাতিটা যেন উজ্জ্বল করে দিয়ে বলতে লাগল —

'তোমার আমি যেচে বিয়ে করতে গেলাম কেন—এ নিয়ে সবাই আশ্চর্য হয়েছে···'

আবার পাশে চোখ তুলে হাসলে সুরবালা।

গিরীন বললে—'কেন, তুমি জানতে ব্যাপারটা? কৈ, বল নি তো? তা হলে আর নতুন কি শোনাচ্ছি!'

'কি ব্যাপার তা জানি না, তবে আমি যে সুন্দরী এটা তো জানতাম।'

'ও, আবার সেই দুষ্টুমি।'

আবার বলতে আরম্ভ করলে—

'প্রথম হয়ে পাস করেছি। শ্বশুর হবার জন্যে চারিদিকে রেষারেষি পড়ে গেছে—বিলেত পাঠিয়ে কেষ্ট-বিষ্টু করে আনবে, মেয়েদের ফটো যা আসতে লাগল মাথা ঘুরিয়ে দেয়, এমনও নয় যে বিলেত যাবার অসাধ বা সুন্দরী চেনবার চোখ নেই—এমন অবস্থায় হঠাৎ একি মতিগতি হলো!—হ্যাঁ, মেয়েও যে খুব সুন্দরী তাও তো নয়···'

'ইস্!···নয়!···'

'সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। আসল কথাটা কাউকে বললাম না; শুধু জিদ ধরে রইলাম—ঐ মেয়ে না হলে করবই না বিয়ে। একটু মোলায়েম করে বললাম অবশ্য—এখন থাক, নিজের পায়ে দাঁড়াই—মিথ্যে কথা সব···'

'এখন তার ফল ভুগছি···' একটু খুক্ খুক্ হাসি উঠল কথাগুলোর সঙ্গে।

'বিয়ের চিন্তাতেই কিন্তু মনটা আমার পূর্ণ হয়ে রয়েছে, তবে আমার রোমান্স একটু অন্য ধরনের। তাই নিয়ে তোমাদের বাড়িটা আমায় বড় টানত। আমি তখন ঐ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ নিয়ে কাজ করছি। অজ পাড়াগাঁ, তার মধ্যে একপ্রান্তে ঐ রকম প্রকাণ্ড বাড়ি জীর্ণ হয়ে আস্তে আস্তে

ভেঙে পড়েছে, লোক নেই; বড় নাড়া দিত মনটাকে। বড় রাস্তা থেকে একটু ঘুরে বাড়িটা, কাজে থাকতাম ব্যস্ত, মনও শ্রান্ত থাকত, কাছ দিয়ে কখনও যাই নি। পুরনো ঝাউ আর বটল-পামের ফাঁকে ফাঁকে ওপরের যেটুকু দেখা যেত সেটুকু নিয়েই রোমান্স সৃষ্টি করতে বেরিয়ে যেতাম আমাদের ক্যাম্পের দিকে। বলাবাহুল্য, সেই রোমান্সের কল্পলোকে একটি মেয়েও ছিল, বিয়ে না করায় সম্ভব-অসম্ভব জায়গায় বিয়েরই স্বপ্ন দেখছি তখন। তারপর একদিন সন্ধ্যায় কি মনে হলো— বড় রাস্তা ছেড়ে ঐদিক ঘুরেই আসব। টের পেলাম বাড়িটার নিচের একটা অংশে রয়েছে লোক, যেতে যেতেই দরজার মধ্যে দিয়ে চোখে পড়ল রকে একটা লালঠেম জ্বলছে আর তারই আলোয় রকের উপর দেয়ালে ঠেস দেওয়া একগোছা বাসন ঝকঝক করছে। রোমান্স খানিকটা খোরাক পেলে। দুদিন বেশ অন্যমনস্ক রইলাম, তৃতীয় দিনে আবার ঐ পথে আসতে হওয়ায় ঐদিক হয়েই ঘুরে আসতে আসতে দেখি মেয়েটিও কল্পলোক থেকে নেমে এসেছে, তার কণ্ঠস্বর শুনলাম ছোট্ট একটি কথায়। তুমি অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছ যে সুরো?'

'কল্পলোক থেকে নামতে পারছি না।' এবারের হাসিটা যেন জোর করেই হাসলে সুরবালা।

'কিছুদিন আমার অন্য গ্রামে গিয়ে কাজ করতে হলো। তাতে রোমান্স শুকিয়ে নিশ্চিন্দি হবারই কথা, কিন্তু দিনদিনই যেন, আরও শাখা-পল্লবে সজীব হয়ে উঠতে লাগল, আনন্দটা ক্রমে যেন যন্ত্রণায় দাঁড়াচ্ছে। এই সময়ে মনের অবস্থা অন্যদিক দিয়েও ভাল নয়, দুর্ভিক্ষের অনেক দিন হয়ে গেছে, লোকের দেবার ক্ষমতা বা স্পৃহা এসেছে কমে। প্রথমটা যেমন পাবার বা দেবার উন্মাদনায় মানুষের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠেছিল, তেমনি আর নেই। কেউ দিতে জানে না নিজেকে··· একেবারে নিজেকে ভুলে যদি বিলিয়ে দিতেই না পারলে তো কেমন করে মেটাবে ক্ষুধা? ঐটেই তখন মূল চিন্তা মনের, তারপর এক সময় চিন্তাটা কি করে স্থান আর পাত্র পরিবর্তন করলে, দেখলাম বুভুক্ষুদের

জায়গায় এসে পড়েছি আমি আর দাতার জায়গায় ··'

'সেই মেয়েটি । ··কী উদ্ভুটে রোমান্স বাবা!' এবারেও হেসে ফেলে সুরবালা। কিন্তু সে অকৃত্রিম সুর ফোটাতে পারলে না।

বর্ষার বিরাম নেই। ঘোরটা এবার কাটল না গিরীনের; আবিষ্ট-ভাবেই বললে—'এই সময় সেই ঘটনাটুকু চোখে পড়ল।'

একটু চুপ করলে, মনটা যেন সিক্ত অন্ধকারের মধ্যে কোথায় গেছে তলিয়ে। সুরবালাকে তাগাদা দিতে হলো—'ঘুমে এদিকে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে···'

'সেদিন কিন্তু মেয়েটি নিজের কথা একেবারেই ভাবে নি। কাজ খুব কম, যোগানের অভাবেই প্রায় গুটিয়ে এসেছে। তাইতে নিজের কথাই বড় হয়ে পড়েছে বলে ঐ বাড়িটার ওদিক দিয়েই ক্যাম্পে ফিরে আসছি—বর্ষার সন্ধ্যাই, তবে বৃষ্টি নেই, আকাশে মেঘ থমথম হয়ে রয়েছে। দেখি একজন ভিখিরী নয়, দুর্ভিক্ষ যাদের ভিখিরী করে তুলছে তাদেরই একজন, আর তো আমাদের কাছেও বড় একটা পাচ্ছে না কিছু।'

'যারা এই সব কাজ নিয়ে থাকে তাদের মনটা যে সর্বদাই করুণায় ছলছল করতে থাকে এমন নয়, বরং দেখে শুনে ঘেঁটেঘুঁটে খানিকটা নির্বিকারই হয়ে যায়। এগিয়েই যেতাম, কতবার গেছি এই রকম, সেদিন কিন্তু কি হলো, হঠাৎ মনটা বড় টনটনিয়ে উঠল, মনে হলো ঐ মানুষটা শুধু ঐ মানুষই নয়, জগৎ জুড়ে যারা দীন-নয়নে রয়েছে হাত পেতে তাদের যেন প্রতীক।' একটু এগিয়েই গিয়েছিলাম, ঘুরে দাঁড়ালাম।

'দোরের দিকে একটু তেরছা হয়ে বসেছিল, ঘুরে দাঁড়াতে ভাল করে নজর পড়ল। পুরুষ নয়, মেয়েছেলে। শীর্ণ, কালো, মাথার চুলগুলি এলোমেলো হয়ে ঘাড়ের উপর লুটিয়ে পড়েছে; পরনে একটা শতছিন্ন ময়লা কাপড়, গুটিয়ে-সুটিয়ে উবু হয়ে বসে রয়েছে বলেই যেন কোন রকমে লজ্জা নিবারণ হয়েছে; ঐ কাপড়েরই খানিকটা পিঠের উপর টানা।'

'মুখে কথা নেই। যেন ডেকেছে, সাড়া পায় নি, আর ডাকবার শক্তি নেই, ওঠবারও শক্তি নেই, তাই হাত পেতে আছে বসে। চারিদিকের

ঘন গাছপালার ছায়ার উপর মেঘলা সন্ধ্যার ছায়া এসে পড়ায় সমস্ত দৃশ্যটি অস্পষ্ট, সেই জন্যই যেন আরও করুণ।

'বলতে বাধা নেই, আমায় একেবারে অভিভূত করে ফেলেছিল। কি রকম গৃহস্থ জানি না, তবে ইচ্ছে থাকলেও তো এই ভর-সন্ধ্যার সময় কিছু দেবে না; হাত দুটো আপনিই কখন পকেটে গিয়ে সেঁদিয়েছে, এক পকেটে একটা দোয়ানি আর এক পকেটে আধখানা পাঁউরুটি ঠেকল। ··দিয়ে আসি, তারপর একপাশে বসিয়ে ক্যাম্প থেকে আরও কিছু না হয় নিয়ে আসা যাবে।

'পা বাড়িয়েছি, বাধা পড়ল। দরজার ভেতর দিয়ে উঠোনটার খানিকটা নজরে পড়ে, দেখছি একটি মেয়ে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে যেন বাড়ির সবাইকে লুকিয়ে এগিয়ে আসছে।···বুক ধড়াস করে উঠল—দুটি ভিখিরীকে একসঙ্গে দয়া—এ যে কল্পনাতীত, একজনকে না হয় শুধু দেখা দিয়েই···

একটু আড়াল হয়ে দাঁড়ালাম। আড়াল থেকে আরও একটু অস্পষ্ট, তবু যা দেখবার তা পাচ্ছি দেখতে।···দরজায় এসে একবার ঘাড় ফিরিয়ে ভেতরে দেখে নিলে মেয়েটি, তারপর গলা বাড়িয়ে বাইরেটাও চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রথমে একটা শাড়ি দিলে কোলের উপর ফেলে, তার পর চাপা-গলায় তারই একটু আঁচল মেলে ধরতে বলে কোঁচড় থেকে কতকগুলো মুড়ি বের করে দিলে, খান দুই রুটি, আর একটু লম্বাগোছের গোটা দুতিন কি তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। ভিখারিণী বোধহয় হাত তুলে আশীর্বাদ করতে যাচ্ছিল, হাত তুলে চাপা গলায় বললে—'চুপ।' দাঁড়িয়ে পড়ে একটু যেন কি ভাবলে, তারপর আর একবার ভেতর-বার দেখে নিয়ে পিঠের আঁচলটা আস্তে আস্তে নামিয়ে দিলে! আবার সতর্ক চাউনি, তারপর নিজের গায়ের ব্লাউজটা তাড়াতাড়ি খুলে নিয়ে ওর কোলে ছুঁড়ে ফেলে আঁচলটা আবার জড়িয়ে উঠোনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গিরীন চুপ করে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল—অনেকক্ষণ। তারপর বললে, 'আমার মনে হলো পেয়েছি। যে এই

রকম ভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারলে তার কাছে হাত না পেতে অন্য কার কাছে দিতে যাবে ধরনা ? তার পরদিনই বাড়িতে চিঠিটা লিখি—খোঁজ নিয়ে জানা গেল অভিভাবক দাদা—লিখলাম দাদাকে বোনের বিয়ের প্রস্তাব করে চিঠি দিন।'

মনে আছে সুরবালার। যদিও ঐ সূত্রেই যে বিবাহ এটা জানলে এই প্রথম। ওরা দুশো টাকা পেয়েছিল সেদিন। কোনও সিনেমার একটা অংশ, পুরানো জীর্ণ জমিদারের বাড়ি দরকার, একটি হৃতগৌরব অভিজাত বংশের মেয়ের চরিত্র নাকি দেখান হচ্ছে।—তারই শুটিং হচ্ছিল সেদিন—আরও একদিন হয়েছিল।···মেয়েটির সঙ্গে ওর একটু আলাপও হয়েছিল—তবে মা দিদি কিন্তু পরিচয়টা বাড়তে দেয় নি।

এত বড় হাসির কথা—নির্জলা কবিত্বের এত বড় হাস্যকর পরাজয় আর হয় না। মুখে আঁচল চেপে উঠলই যেন একটু খিল খিল করে সুরবালা ; তার পরেই একটু চুপ, তার পরেই স্পষ্ট মনে হলো যে আঁচলের মধ্যে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ।

অতিমাত্র বিস্মিত হয়ে এগিয়ে বসল গিরীন—সত্যিই ফোঁপাচ্ছে সুরবালা! বুকে চেপে ধরে বললে—'কি! কি হলো সুরো ?—হঠাৎ···'

সুরবালার মুখটা বুকে চেপে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গেই পারলে না কিছু উত্তর দিতে। তারপর ভাঙা ভাঙা কথায় কান্নার মধ্যে দিয়ে বলে চলল—'একদিন শুনবে—যেদিন হাসির মধ্য দিয়েই বলবার ক্ষমতা পাব ফিরে—তার আগে একটা কথার উত্তর দাও—পোড়া হাসির রোগ রয়েছে বলে তোমার কি একটুও এখন সন্দেহ আছে যে, আমি সেদিনকার চেয়ে আরও নিঃশেষ করে তোমার পায়ে লুটিয়ে দিই নিজেকে ?···বল না—এই রকম একটা রাতেই যে বলবার কথা সেটা···'

নির্মোক

আশাপূর্ণা দেবী

না, একই পাড়ায় বাড়ি নয় হু'জনের, একসঙ্গে পড়েও নি কখনো। একজনের বাড়ি লেক্ রোডে, আর একজনের তো পাইকপাড়ায়। তবু সেই ছেলেবেলা থেকে হু'জনের দেখা হবার কামাই ছিল না। হরদমই দেখা হতো। তার কারণ হু'জনের মামার বাড়ি ছিল একই পাড়ায়, আর হু'জনেই বছরের প্রায় সব ছুটিগুলোই তাদের ঝাঁসির রাণী রোডের মামার বাড়িতে কাটিয়ে যেতো।

পাঞ্চালীর বাপ নেই, কাকা-জ্যেঠাদের সংসারে থাকতে হয়, কাজেই তার বিধবা মা মেয়েটার ছুটি হ'লেই, হু'এক দিনের জন্যে হ'লেও ভায়ের সংসারে পালিয়ে আসতেন। আর শিবাজীর তো বরাবরই নিজেদের লেক্ রোডের পাড়াটা এত বাজে আর বিশ্রী লাগতো যে, ছুটি হ'লেই ছুটতো মামার বাড়িতে হাঁফ ফেলতে।

শিবাজী হচ্ছে ওই ঝাঁসির রাণী রোডের বটু ডাক্তারের ভাগ্নে, আর পাঞ্চালী ওখানকার উপানন্দ উকিলের ভাগ্নী। তবে পাড়ার আর সব লোককে ভেবে তবে ঠিক করতে হতো কে কার ভাগ্নে-ভাগ্নী। দেখতে গেলেই দেখা যেতো, হয় বটু ডাক্তারের বারান্দায় শিবাজী আর পাঞ্চালী, নয় উপানন্দ উকিলের ছাতে পাঞ্চালী আর শিবাজী। উকিল বাড়িতে বারান্দা নেই, কাজেই বাধ্য হয়ে তাঁর ভাগ্নীকে এ বাড়ি ছুটে আসতে হতো রাস্তা দেখবার ইচ্ছেটা তীব্র হ'লে। আর ডাক্তার বাড়িতে নেই ছাতে ওঠার সিঁড়ি, কাজেই শিবাজীর ঘুড়ি ওড়ানোর বাসনাটা অদম্য হয়ে উঠলে তার গতি কোথায় পাশের উকিলবাবুর ছাত ছাড়া ?

তা সে সব তো সেই ছেলেবেলাকার ছেলেমানুষী। তখন 'মৌচাক' আর 'শিশুসাথী' নিয়ে কাড়াকাড়ি করে ঝগড়াও হতো কম নয়, 'আড়ি'র পিরিয়ডটা কোনও কোনও বার আপন আপন বাড়ি ফিরে যাওয়া পর্যন্ত

চলতো, এবং ফিরে গিয়ে অনুতাপানলে দগ্ধ হ'লেও চিঠি-পত্রের মাধ্যমে যে সেই অনুতপ্ত হৃদয়কে মেলে ধরা যায় তা তখন তাদের বোধের জগতে ছিল না। অতএব সেই মামার বাড়ির ভরসা, আর পরবর্তী ছুটির আশায় দিন গোণা।

তারপর অবশ্য যখন নাবালকত্বের গণ্ডি কাটলো, তখন আর মামার বাড়ির গণ্ডিটুকুই একমাত্র ভরসা রইলো না। অলিখিত নিয়ম আর অলক্ষিত নিষেধের গণ্ডি ভেঙে নিজেরাই নিয়মিত দেখা হবার মতো জায়গা সৃষ্টি করে নিলো। অর্থাৎ বাল্যের 'ভাললাগা'টা যৌবনের 'ভালবাসায়' পরিণত হ'লে আদি-অনন্তকালের প্রেমিক-যুগল যা-যা কলা-কৌশল করে থাকে ওরা তার কোন কিছুতেই ত্রুটি করল না। অভিভাবকদের সামনে সরল সাজল, অবোধ সাজল. সময় সময় কাণ্ড-জ্ঞানহীনের ভূমিকায় অভিনয় করে কপাল চাপড়ালো, জিভ কাটলো, এবং আড়ালে অনেক বাহাদুরীর হাসি হাসলো সেই অভিভাবকদের নির্বোধ, অবোধ আর অন্ধ ভেবে।

অবশ্য অভিভাবকদেরও তো অন্ধ, অবোধের ভান আর অভিনয়ই করতে হয়! এ যুগে কেউ চট্‌ করে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ক্ষেত্রে নেমে আসে না। আসায় যে বিপদ আছে সে কথা কোন বিজ্ঞ অভিভাবক না জানেন? জানাই তো কথা, যারা নেহাৎ কাণ্ডজ্ঞানহীনের ভূমিকা অভিনয় করছে, একবার তাদের দিকে ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করে জ্ঞান প্রদান করতে গেলেই, মুহূর্তে তারা লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে বসতে দ্বিধা করবে না।

কাজেই ওরা যখন হয়তো পোষ্টকার্ডেই দু'ছত্র প্রশ্ন করে, 'শিবাজীদা অমুক বইটা কি তোমার আছে? না থাকলে যোগাড় করে দিতে পারবে?' আর এক ছত্রে তার উত্তর যায়, 'বইটা আমার নেই, চেষ্টা করবো', তখন অভিভাবকরা সেই নির্দোষ পোষ্টকার্ডখানি নেড়েচেড়ে ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলেন 'হুঁ'।

তবে এক্ষেত্রে অন্ততঃ তেমন সংগ্রামী মনোভাবও তাঁদের নেই, কারণ পাত্র হিসেবে শিবাজী অতীব উত্তম, আর পাত্রী হিসেবে পাঞ্চালী

হেলা করার মতো নয়। ঈশ্বর আনুকূল্যে আবার জাতে-কুলে এক।

তবে আর বাধা দেবার কি আছে? ভালই তো হয়েছে।

নানান ঝঞ্ঝাট পুইয়ে উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী জোগাড় করে বিয়ে দিলেই তো হলো না শুধু, জটিলতা যে অনেক! কে বলতে পারে অভিভাবকদের নির্বাচিত সেই জীবন সাথীকে তাদের মনে ধরবে কি না! কে বলতে পারে, পরে সারা জীবন তাই নিয়ে মা-বাপকে খোঁটা দেবে কি না!

এ বাপু তোমাদের নিজেদের কাটা-খাল, নিজেদের ডেকে-আনা কুমীর, অতএব ভাল-মন্দের দায় তোমাদের। ভাগ্যে সুখ-দুঃখ যা আছে তাই ভুগবে তোমরা; একালে ছেলেমেয়েরা প্রেমে উড়ে ওপরওয়ালাদের অনেক কাজ কমিয়ে দিচ্ছে বৈকি। তাই বাইরে একটু রাগ-রাগ ভাব দেখালেও ভিতরে এক রকম হাঁপ ছেড়ে বাঁচছে মা-বাপেরা।

সবের মধ্যে সব, 'মেয়ের বিয়ে' বলতেই যে মোটা টাকা খরচের অঙ্কটা চোখে ভেসে ওঠে, প্রেমঘটিত বিয়েতে তো সেটা তেমন ভীষণাকৃতি হয়ে দাঁত বসাতে আসে না। এতে কন্যাপক্ষ পারল, পারল, না পারল না পারল! মেয়ে জামাইকে যৌতুক দিলে তো উত্তম, না দিলে বলার কিছু নেই।

পাঞ্চালীর বিধবা মায়ের মেয়ের বিয়ের ভরসা তো দ্যাওর-ভাসুর, ভাই-ভাজ, কাজেই মেয়ে নিজেই সুরাহা করে নিচ্ছে দেখে ভিতরে ভিতরে তিনি খুশি বৈ অখুশি হন নি।

অতএব?

অতএব প্রেমের তরণীতে দিব্যি পাল তুলে মন্দমধুর হাওয়ায় এগিয়ে যাচ্ছিল পাঞ্চালী আর শিবাজী। অবশ্যি 'প্রেম' বলতে দৃশ্যতঃ 'গেলাম গেলাম মলাম মলাম' কিছু নেই, কারণ প্রেমের প্রকাশটা অনুক্তই আছে। চিরদিনের চেনা মানুষটার সঙ্গে তো আর নতুন করে আবেগ, মধুর রোমাঞ্চ ইত্যাদি ভাল ভাল কিছু হয় না? প্রিয়ার হাতটা যদি নিতান্তই ধরতে ইচ্ছা করে শিবাজীর তো ট্রাম থেকে নামতে কি দোতলা বাসে উঠতে, 'পড়ছিলে যে!' বলে নেহাৎই যেন ওকে পড়ে যাওয়া

থেকে সামলাতে চেপে ধরে হাতখানা, হয়তো বা সে হাতটি প্রয়োজনীয় সময়ের থেকে একটু বেশীক্ষণই রাখে হাতের মধ্যে। হয়তো বা প্রিয় স্পর্শসুখ অনুভব করবার বাসনাটা প্রবল হ'য়ে পাঞ্চালী কথা বলতে বলতে শিবাজীকে অহেতুক ঠেলা মারে, 'কোন দিকে মন রেখে বসে আছ ? শুনতে পাচ্ছ ?'

শুধু এই। বাহ্যিক প্রকাশ এর বেশি নয়। দু'জনের কেউ কোন দিন গদগদ ভাষণে বলে নি, 'তোমার নইলে আমার জীবন বৃথা, আকাশ আমার মাটি চন্দ্র সূর্য অর্থহীন।' কিন্তু নইলে, যে জীবন বৃথা, চন্দ্র সূর্য অর্থহীন, সেটা চন্দ্র সূর্যের মতোই স্থিরীকৃত আছে।

বিয়েটা অবধারিত, কাজেই ও নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই, উচাটন নেই। ও তো হবেই। জল্পনা-কল্পনা-শুধু ভবিষ্যতের যুক্ত-জীবন নিয়ে। নিত্যদিন বোকাটে চাতুরী আর জোলো জোলো, কৈফিয়ৎ রচনা করে করে দু'জনে একত্রে এসে ছবিতেই নতুন নতুন রং চড়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে। বিয়েটা তাড়াতাড়ি হচ্ছে না শুধু সামান্য একটা বাধায়।

শুধু শিবাজীর একটু ভালমতো কাজ পাওয়ার ওয়াস্তা। অবিশ্যি পাবেই যে সেটাও অবধারিত। গুণী ছেলে, পিছনে বাপ-কাকা দু'দুটো খুঁটির জোর, স্বাস্থ্য ভাল, চেহারা ভাল। অতএব তার রাজধানী বাস মারে কে ? তবে যেমন তেমন ঢুকে পড়ায় বাপের আপত্তি, তার চেয়ে আপত্তি কাকার। বেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগলেন ওঁরা। ইত্যবসরে খুঁটিহীন বাপ-মরা মেয়েটা ভাবলো বসে না থাকি, বেগার খাটি। হেলায়-খেলায় করি না একটা কিছু, কতদিন আর কাকা-জ্যেঠার অন্ন ধ্বংসাব ?

'দমদম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে' সহকারী প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর একটা পোষ্ট খালি ছিল, সেটা আর খালি থাকলো না।

তা প্রথম প্রথম কম ক্ষেপাত না শিবাজী, যখন তখন দেখা করতো আর বলতো, 'এই যে সহকারিণী, কি খবর ?' পাঞ্চালী বলতো, 'সহকারের খবরটা শোনাব আশায় হাঁ করে আছি, এই খবর।'

'খুঁটি পেকে এসেছে। কাকা বলছেন, 'মারি তো গণ্ডার লুঠি ত ভাণ্ডার! একেবারে মিনিষ্ট্রিতে ঢুকিয়ে তবে ছাড়বো।'

'বলছেন তো অনেকদিন থেকে। হচ্ছে কই? তার চাইতে মোটামুটি গেরস্থালী গোছের একটায় ঢুকে পড়ল—।' এতদিনে যে কী হতে পারতো সেটা আর ভাষায় নিজে ব্যক্ত করে না পাঞ্চালী। ব্যক্ত করে তার রুদ্ধ হয়ে আসা স্বর, অভিমানাহত ছলছলে দৃষ্টি।

শিবাজী বাড়ি এসে নতুন করে আবার কাকার কাছে আক্ষেপ আর বাপের কাছে অভিযোগ জানায়, 'কি হচ্ছে ছাই? কতদিন আর বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াবো?'

'বেড়াচ্ছিস তো কি? খেতে পাচ্ছিস না?' কাকা বলেন।

'খাওয়াটাই বুঝি সব?'

'হবে বাবা, সবই হবে, এই দেখ—' একদিন এক চিঠি দেখাল কাকা। তাঁর দিল্লীর এক হোমড়া-চোমড়া বন্ধু লিখেছেন, 'ভাইপোকে পাঠাও চট্‌পট্, পার তো প্লেনে। মনে হচ্ছে লাগাতে পারলাম।'

প্লেনেই গেল শিবাজী। যাবার আগে 'দমদম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে'র দরজায় গিয়ে ধর্ণা দিয়ে খবর দিয়ে গেল, 'সহকার চললেন। সংবাদ শুভ।'

সে রাত্রে আর ভাল করে ঘুম হলো না পাঞ্চালীর, আবেগে প্রত্যাশায় মন কেমন করার জন্যে। মনে মনে নিজেকে দিল্লী পৌঁছে দিল, তার না-দেখা না-দেখা রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো শিবাজীর সঙ্গে, তার এতখানি ভালবাসায় গড়া সংসারের স্বপ্ন দেখতে লাগলো সারারাত জেগে।

এ সংসার তো আজকের গড়া নয়! এর নক্সা আঁকা হয়েছে সেই কোন্ বাল্যকালে, আর ঘর গড়া হয়েছে তিলে তিলে প্রতিদিনে। বাল্য থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে! আবাল্যের সাহচর্যে যে তৃষ্ণা বাসনা কোনদিনই তেমন তীব্র হয়ে ওঠে নি, সেটাও যেন আজকাল প্রায়ই ভিতরে ভিতরে মাথা তুলছে। বলছে, 'আর কতদিন? আর

তো পারা যায় না।'

সারারাত্রি প্রায় জেগে কাটিয়েও সকালবেলা খোলা জানালায় তাকিয়ে পাঞ্চালীর মনে হলো আকাশ বুঝি আজ নীলের পরশ সাজিয়ে বসেছে। মনে হল সূর্যের সব রং বুঝি রূপোর জল হয়ে গলে গলে ছড়িয়ে পড়ে ঝকঝকে করে তুলছে সেই নীলকে। মনে হলো পৃথিবীর সমস্ত শব্দ একটিমাত্র সঙ্গীত হয়ে সেই রূপোমাজা নীল আকাশের গায়ে তরঙ্গ তুলে তুলে বেড়াচ্ছে। সে সঙ্গীতের সুর 'আর হবে না দেরী, আর হবে না দেরী!'

দেরী নেই, আর দেরী নেই, এখন আর দিন গোণার পালা নয়, গোণা দিনের পালা।

চা খেতে বসে আজ পাঞ্চালীর ছোট খুড়ির তীক্ষ্ণ মুখটা বেশ যেন মোলায়েম মনে হোলো। ভাত খেতে বসে জ্যেঠির চিরবিরক্ত মুখখানা স্নেহমণ্ডিত লাগলো। এ সংসারে যে কুশ্রীতা আর যে সৌন্দর্য অবিরত চোখকে আর মনকে পীড়িত করেছে, আজ যেন মনে হলো সেগুলোর উপর একটা সুষমার আবরণ বিছান। প্রতি মুহূর্তে সেখান থেকে চলে যেতে ইচ্ছে হয়, আজ সেখানটা ছেড়ে চলে যাবার সময় আসন্ন হয়ে এসেছে ভেবে মনটা একটা মনকেমনে টনটন করে উঠলো।

এই কোমল হয়ে আসা মনটায় পাঞ্চালীর ইচ্ছে হলো সামনের বারে মাইনে পেলেই শুধু বাড়ির কুচোকাচাদের টফি লজেন্স দিয়ে না সেরে বড়দের কিছু কিছু উপহার দেবে। জ্যেঠিকে একটা চওড়া লাল পাড় তাঁতের শাড়ি, খুড়িকে ছাপা-পাড়ের সিল্ক। মাসের টাকাটা প্রায় সবই সংসার খরচ বলে জ্যেঠার হাতে তুলে দিতে হ'লেও এই উপহারের ইচ্ছাটা প্রবল হলো।

স্কুলে গিয়েও বাজতে লাগলো একটা মধুর সুরের রেশ। বিষণ্ণ মধুর। এদেরও তো ছেড়ে যেতে হবে। এই ক'মাসেই বেশ ভালবাসা পড়ে গেছে স্কুলটার ওপর। মনে মনে ঠিক করলো ভবিষ্যতে যখনি কোন সময় দিল্লী থেকে আসবে, স্কুলে দেখা করে যাবে। হয়তো বা টুকটাক

কিছু উপহার আনবে বাংলার টিচার উমার জন্যে, অঙ্কর টিচার সুনন্দার জন্যে।

তখন নিশ্চয়, মনে মনে হাসল পাঞ্চালী, শিবাজী ওর ভালবাসার ভাগীদারদের নিয়ে ঠাট্টা করবে। পাঞ্চালীও ঠাট্টা করবে, 'তবু তো ওরা মেয়ে, ছেলে হ'লে না জানি—'

চিন্তায় ব্যাঘাত পড়ল।

স্কুলের সেক্রেটারী ভবেশবাবু এসেছেন, অফিস ঘরে ডাক পড়েছে।

কি ব্যাপার!

ব্যাপার বোঝালেন ভবেশবাবু। হেডমিস্ট্রেস্ তিন মাসের ছুটি নিচ্ছেন, এই সময়টা পাঞ্চালী তাঁর কাজটা চালিয়ে নিতে পারবে কি না!

কাজ চালিয়ে নিতে! হেডমিস্ট্রেসেরও এটা আকস্মিক সিদ্ধান্ত। অসুস্থ মাকে নিয়ে চেঞ্জে যেতে হবে তাঁকে। সঙ্গে আর কার যেন যাবার কথা ছিল, তার যাওয়া হলো না তাই! ভবেশবাবুর কথায় মনে হলো এই নিয়ে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে তাঁর কিছু কিঞ্চিৎ বচসা হয়ে গেছে। মহিলাটি বোধ করি বাধা পেলে কর্মত্যাগেও পশ্চাদ্‌পদ নন।

রাজী হতেই হলো পাঞ্চালীকে! সকালের হাল্‌কা মনটা আর রইল না। কিন্তু কর্মের ভারে একটা মোহও আছে, সে মোহ মানুষের কঠিনের দিকে দুরূহের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

রাজধানীতে মোটা একটা চাকরী বাগিয়ে এল শিবাজী। ক'দিন পরেই জয়েন করতে হবে, দশদিনের কড়ারে কলকাতায় এসেছে গোছগাছ করতে। 'কিন্তু শুধু জামা, কাপড়, বিছানা, বাক্স গুছিয়ে আর কি ফল হলো', বললো শিবাজী হতাশ-নিঃশ্বাস ফেলে, 'জীবনটাকে যদি এর মধ্যে গুছিয়ে-গাছিয়ে নিতে পারতাম তবে না! কে জানতো পাঁজি আর পুরুতকুল এমনভাবে আমার শত্রুতা করবে?'

অবশ্য এটা শিবাজীর মিথ্যা আক্রোশের কথা! পাঁজি আর পুরুতকুলের সাধ্য কি যে শত্রুতা করে যদি বাড়ির লোকেরা তাঁদের সহায় না হন! শিবাজীর বাবা আর পাঞ্চালীর মা যদি ঘোষণা করতেন,

'হোক ভাদ্র মাস, এই মাসেই হোক বিয়ে।' ওরা কি করতে পারতো ?

কিন্তু তাঁরা তা করলেন না, কাজেই শিবাজীর এই হতাশ নিঃশ্বাস। শুধু ভাদ্র নয়, আশ্বিন কার্তিক আরও দু'মাস বন্ধ। পাঞ্চালী ভাবলো তা এক হিসেবে ভালোই হলো, মাত্র ক'দিন আগে সেক্রেটারীকে কথা দিয়েছি তিন মাসের দায়িত্ব নিয়ে, এর মধ্যে হঠাৎ বিয়ের সানাই বেজে উঠলে বিশ্রী একটা অবস্থার সৃষ্টি হতো। লজ্জায় মুখ দেখাতে পারতাম না তাঁর কাছে, কারও কাছে। শিবাজীকে বললো মৃদু হেসে, 'এতদিনই যখন ধৈর্য ধরতে পারলে!'

অগ্রাণ মাসে বিয়েটা হবে ঠিক হলো।

অগত্যাই শুধু জামা-কাপড় গুছিয়ে নিয়ে চলে যেতে হলো শিবাজীকে। গিয়ে লম্বা একখানা চিঠিও লিখে ফেললো। মনে হচ্ছে ধৈর্যের বাঁধ বুঝি আর থাকছে না।

কিন্তু বিধাতা নিষ্করুণ!

পাঁজি-পুঁথি যখন ঘোষণা করলো বাধামুক্ত করে দিলাম, তখন অফিসে ছুটি মিললো না শিবাজীর। তার উপর আর এক বিভ্রাট, চাকরিটা যত সহজে জুটে গিয়েছিল, তত সহজে আস্তানা জুটছে না। কোয়ার্টার্স নেই। কাকার বন্ধুর বাড়িতেই এখনও কাটাতে হচ্ছে। অবশ্য আশ্বাসের কথা—শিবাজীর এবং শিবাজীর অনুরূপ পদমর্যাদা সম্পন্ন কতিপয়দের জন্য সরকার বাহাদুর উপযুক্ত আস্তানা গড়াচ্ছেন! লাখ লাখ টাকা ঢেলে কিছুসংখ্যক ভেতর-ফাঁপা, ওপর-চটক, বাড়ি হচ্ছে, তারই একটা শিবাজীর অধিকারে আসবে আশা পাওয়া গেছে।

পাঞ্চালিকে আশ্বাসলিপি পাঠায় শিবাজী 'সবুরে মেওয়া ফলে' এই নীতিবাক্য স্মরণ করে বসে আছি।

তা সবুরটা পাঞ্চালীর পক্ষে শাপে বর হচ্ছে। কারণ পাকাপাকি ভাবে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর পোস্টটাতেই বসতে হয়েছে তাকে এখন। সেক্রেটারীর সঙ্গে বনি-বনাও না হওয়ায় প্রধানা পদত্যাগ করেছেন।

ইত্যবসরে স্কুলটাও পরিসরে বেড়ে চলেছে, কাজের ভিড়ে পাঞ্চালীর হাঁফ ফেলবার সময় নেই। মোটা গোছের একটা গবর্ণমেণ্ট 'এড' পাওয়া গেছে স্কুল-বিল্ডিঙের জন্য, তাই নিয়ে নিত্য স্কুল কমিটির মিটিং বসছে, পাঞ্চালীকেও তাতে যোগ দিতে হচ্ছে অগত্যা। আগের প্রধানা ছিলেন একটু এক-বগ্‌গা গোছের, বনতো না প্রায় কারো সঙ্গেই, পাঞ্চালীর জেদ কম, ধৈর্য বেশি। বিবেচনা বুদ্ধি আছে, কর্মক্ষমতাও প্রচুর। সকলেই সম্ভ্রমের চোখে দেখে তাকে, পরামর্শ নেয় তার। কাজেরও তার তাই অবধি নেই! ঠাণ্ডা মাথা আর কর্মশক্তি, এই থাকা মানেই তো জগতের যত কাজ এসে ঘাড়ে চাপা।

তবু, স্কুলে আসার পর স্কুলের এই বাড়-বাড়ান্তয় বেশ একটু নেশা এসে গেছে পাঞ্চালীর। কাজের নেশা, ভাল কাজ দেখাতে পারার নেশা। নিজের উপর আস্থা বেড়ে গেছে অনেকটা। স্কুলটাকে সর্বার্থসাধক করে তোলা যায় কিনা তাই নিয়ে নিজেই আলোচনা চালাচ্ছে গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে।

সেক্রেটারী যখন তখন কৃতজ্ঞচিত্তে জানাচ্ছেন ভাগ্যিস আপনাকে পেয়েছিলাম।

এদিকে নতুন বিদ্যালয় ভবনের সংলগ্ন প্রাঙ্গণে শিক্ষয়িত্রীদের জন্য আবাস তৈরী হচ্ছে।

মাঘ মাসটাও যেতে বসলো?

হতাশ নিশ্বাস ফেললেন পাঞ্চালীর মা। 'অতবড় চাকরী হলো শিবাজীর অথচ থাকবার বাড়ী জুটছে না, কি হতচ্ছাড়া কালই পড়েছে বাবা!' ইস্কুল-ইস্কুল আর কাজ কাজ করে এত মেতেছে যে তার সঙ্গে দুটো সুখ-দুঃখের কথা কইবারও সময় নেই। বাড়িতে আসে তাও কাগজপত্র খাতা ফাইল কত কি নিয়ে।

মেয়েকে মাঝে মাঝে বকেন তিনি, 'মাইনে দিচ্ছে কাজ করছিস এই তো সম্পর্ক, তবে আবার তা নিয়ে এত মাথা ঘামানো কেন তোর? ইস্কুলটা কি তোর নিজের হয়ে যাবে?'

মেয়ে তর্ক করে না, প্রতিবাদ করে না, শুধু মা'র দিকে চেয়ে একটু অনুকম্পার হাসি হাসে।

মাঘ গেল, সঙ্গে সঙ্গে সহসাই দীর্ঘ এক টেলিগ্রাফ এসে হাজির হলো শিবাজীর। কোয়ার্টার্স মিলেছে, ছুটিও। তবে অল্পদিনের জন্যে। সামনের সপ্তাতেই আসছে সে, সমস্ত কিছু যেন প্রস্তুত থাকে, সে এসেই যাকে বলে একেবারে ছাদনতলায় এসে দাঁড়াবে।

মুহূর্তে লেক রোড আর পাইকপাড়া প্রায় একপাড়া হয়ে উঠলো।

এবাড়ি ওবাড়ি দু-বাড়িতে নাপিত, পুরুত, স্যাকরা, ময়রা, হালুইকর, ডেকরেটার একযোগে সকলের তলব পড়লো, মার্কেটিঙের সমারোহ সুরু হয়ে গেল বীরবিক্রমে! পাঞ্চালীর মা দিন পেয়ে মেয়েকে গঞ্জনা দিয়ে উঠলেন, 'নাও এবার চাকরিতে দাঁড়ি টানো? গায়ে হলুদ মাখা পর্যন্তও কি ইস্কুলে ছুটবে?'

'চাকরিতে দাঁড়ি।'

পাঞ্চালী বিচলিত সুরে বলে, 'দাঁড়ি আবার কি, ছুটির জন্যে দরখাস্ত করছি।'

'ছুটি! ছুটির জন্য দরখাস্ত? বিয়ে করে তোকে এখানে রেখে যাবে শিবাজী? নাকি রোজ একবার করে প্লেনে চড়ে এসে ইস্কুল সামলে যাবি?'

পাঞ্চালীর চাকরি হয়ে ইস্তক ইস্তক দ্যাওর-ভাসুরের সংসারে মান-সম্মান বেড়েছিল ভদ্রমহিলার, ইচ্ছেমত দু'পাঁচ টাকা খরচ করেও বাঁচছিলেন হাত মেলে, কিন্তু আপাততঃ তাঁর বাক্য-বিন্যাসের ভঙ্গিতে মনে হলো, পাঞ্চালী যেন গোঁয়াতুর্মির বশে খুব একটা কিছু গর্হিত কাজ করছিল, এতদিনে তিনি শাসনের সুযোগ পেয়েছেন।

দেড়হাজারী জামাই পেয়ে মেজাজ গরম হয়ে গেল ভদ্রমহিলার, না কি মেয়ের উপর সন্দেহের আতঙ্কে আগে থেকেই রণসাজে সাজছেন? পাছে পাঞ্চালী তার 'স্কুল-স্কুল' করে দ্বিধাগ্রস্ত হয়, তাই সেই স্কুলকে একেবারে নস্যাৎ করে দিতে চান?

তা নস্যাৎ তো শিবাজীও করেছে। গোড়া থেকেই করে, আজ তো

করবেই। টেলিগ্রামের পরবর্তী যে চিঠি এসেছে তার, সে চিঠি পাঞ্চালীর নামে। এতদিনের প্রতীক্ষা, এতদিনে সফলতার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে বলে বেশ একটু কবিত্বই করে ফেলেছে প্রথমটায়, তারপর উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দিয়েছে সত্যপ্রাপ্ত সরকারী আস্তানার। পাঞ্চালী যে বাড়ী পেয়ে একেবারে বিভোর হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নাস্তি। ভয় হচ্ছে ঘর, সংসার পেয়ে শিবাজীকেই না শেষ পর্যন্ত অবান্তর বলে অবহেলা করে। লিখেছে শিবাজীর সহকর্মী বন্ধুমহল শিবাজীর চিরপরিচিতা এবং নবপরিণীতাকে দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে আছে। আর অবশেষে লিখছে 'তোমার দমদম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবার আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়বে আর কি! এমন একখানি একাধারে সর্বগুণসম্পন্নাকে কি আর পাবে?'

পাঞ্চালী স্কুল থেকে ফিরে মায়ের বকুনি খেতে খেতে চিঠিটায় একবার চোখ বুলিয়েছিস, তারপর ঠেলতে ঠেলতে গিয়ে ঠেকলো একেবারে সেই অনেক রাত্রে। হাতমুখ ধুতে না ধুতে এল স্যাকরা, এল বেনারসীওয়ালা, এলেন বট্টু ডাক্তার, এলেন উপানন্দ উকিল। তাঁরা পাঞ্চালী আজকে পর্যন্তও স্কুলে গিয়েছিল শুনে ভর্ৎসনা করলেন, বিস্ময় প্রকাশ করলেন, এবং কালই কাজে ইস্তফা দিয়ে দেবার জন্যে নির্বন্ধ প্রকাশ করলেন। উপানন্দ উকিল তো ইস্তফা পত্রের খসড়া পর্যন্ত ছকে দিলেন, এবং উদারকণ্ঠে আশ্বাস দিলেন, 'আচমকা ছেড়ে দিলে তোর ওই 'দমদম উচ্চ' যদি কেস্ করতে আসে আমি আছি।'

অনেক কথা, অনেক গোলমাল, অনেক হিজিবিজির পর অনেক রাত্রে চিঠিখানা ফের চোখের সামনে মেলে ধরে বসলো পাঞ্চালী। 'দীর্ঘকাল ধরে এ যাবৎ দু'জনে যে সংসার গড়েছি, এবার একা তোমার সে সংসার গুছোবার পালা এসেছে বুঝলে হে প্রধানা? 'বিশ্বজগৎ থাক বিশ্বের বাইরে, তোমার, আমার মাঝে আর কিছু নাইরে।' অবস্থাটা মন্দ নয়, কি বল?'

সমস্ত চিঠিটা নতুন করে পুঙ্খানুপুঙ্খ পড়বে বলে বসেছিল পাঞ্চালী, যেন কেমন আলিস্যি এল, মুড়ে রেখেছিল বালিশের তলায়, আলো

নিভিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে বসে রইল চুপচাপ। তাকিয়ে রইল নক্ষত্রগাঁথা অনন্ত আকাশের দিকে।

কিন্তু যতই নক্ষত্র খচিত হউক আকাশ তো শূন্য মাত্রই। চিরদিনের জানিত সত্য। তবু হঠাৎ আকাশটা এত বেশি শূন্য লাগছে কেন?

শূন্য আর স্পষ্ট।

যেন আকাশটা হঠাৎ কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে—অনন্ত ধূসরতার।

উপানন্দ যে ইস্তফাপত্রের খসড়া করে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা দেখেশুনে ঠিকমত করে লিখে রাখলে ভাল হতো, সকালে সময় হবে না। অথচ আর দেরী করা চলে না। উঠে ফের আলো জ্বালাল পাঞ্চালী, খসড়া-কাগজটা খুঁজতে লাগলো।

আশ্চর্য, কোথায় যে গেল!

এই তো স্কুলের এই ফাইলগুলোর সঙ্গে রেখেছিল! সেও খসড়াপত্র। মেয়েদের হাফইয়ার্লি পরীক্ষাপত্র তৈরী হচ্ছে, তারই খসড়ার ফাইল।

এ পরীক্ষা যখন হবে, তখন আর পাঞ্চালী এখানে থাকবে না। বিশ্বজগৎ রবে বিশ্বের বাইরে। কল্পনা করলো, একখানি নিভৃত নির্জন নীড়, সেখানে বিশ্ব-বিস্মৃত হয়ে যাওয়া দুটি প্রাণী। আর দু'জনের 'মাঝে আর কিছু নাই রে।'

সমস্ত বিশ্বের বিনিময়ে সেই একখানি নীড়, সেই একখানি ঘর। যে-ঘর আবাল্যের স্বপ্নছবি। কিন্তু স্কুলের এই কাগজপত্রের গোছার সামনে বসে হঠাৎ আগাগোড়া ব্যাপারটাই কেমন অদ্ভুত অসম্ভব লাগল পাঞ্চালীর।

ইস্তফাপত্রের খসড়া খুঁজছিল সে? পাগল হয়ে গেছে নাকি?

এই গতকালই না শিক্ষাবিভাগ থেকে টাকা মঞ্জুর করে প্রতিশ্রুতি-পত্র দিয়েছে? বলেছে না স্কুলকে উপযুক্ত উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে সরকার থেকে উপযুক্ত সাহায্য মিলবে?

এই সময় স্কুলবোর্ডের একান্ত ভরসাস্থল, বলতে গেলে যার চেষ্টাতেই

এতটা সম্ভব হয়েছে, সেই প্রধানা শিক্ষয়িত্রী আচমকা স্কুলটাকে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেকে লালচেলির আঁচলে মুড়ে বরের পিছন পিছন পিছন গুটি গুটি গিয়ে ঢুকবে বাসর-কক্ষে ?

এতবড় একটা বিসদৃশ ব্যাপারের হাস্যকর অযৌক্তিক দিকটা কিছুতেই কারও চোখে পড়ছে না কেন ?

সকালে উঠে বললো, 'মা, তোমার ওই সব তারিখ-টারিখ পিছিয়ে দাও, এখন অসম্ভব।'

'তারিখ পিছিয়ে দেব ? বিয়ের তারিখ ?' মা ঝেঁকে উঠে বললেন, 'তুমি পাগল হয়েছ বলে তো আর সংসার-সুদ্ধ লোক পাগল হয় নি ? পরশু সকালেই শিবাজী আসছে, তা মনে রেখ।'

'ওকে নয় আসতে বারণ করে—তার করে দাও না ?' অসহায়, অসহায়ভাবে বললো পাঞ্চালী, 'এখন যে বড় শোচনীয় অবস্থা।'

'ওকে বারণ করে—তার কবে দেব ? কি কৈফিয়ৎটা দেব শুনি ?'

'বল যে স্কুলের ব্যাপারে আমার এখন মরবার সময় নেই—'

মা কথা শেষ হতে দিলেন না, মেয়েকে ধিক্কার দিয়ে উঠলেন, 'তা সেটা বরং তুমি নিজেই দাও গে। ছি ছি পলি, স্কুল-স্কুল করে এমন অজ্ঞান হয়ে গেছিস্ তুই যে, এতদিনের এত ভাব-ভালবাসা ভুলে যাচ্ছিস ?'

'ভুলে আবার কি যাব ? বলছি আর দু-তিনটা মাস সবুর করতে। অবস্থাটা একটু—'

'দু-তিন মাস ? বলতে তোর একটু আটকাল না পলি ? শিবাজী না জানিয়েছে সাত-আট মাসের মধ্যে আর ছুটি পাবে না।'

'তা বেশ, না হয় তাই-ই। এতদিন যদি গেল —!'

'এতদিন গেছে বলেই—আর একদিনও যাবে না।' মা ক্রুদ্ধমুখে রায় দেন, 'তুই কি মনে করছিস, জগৎসংসার তোর ইচ্ছায় চলবে ?'

'আমার ইচ্ছায় নয় মা,' একটু বুঝি গম্ভীর হলো পাঞ্চালী, 'জগতে একটা কর্মচক্র আছে, তার ইচ্ছায় সংসার চলে।'

'ভারী তোর কর্মচক্র! ক'টা টাকা রোজগার করতে শিখে দেখছি ভারী অহঙ্কার হয়েছে তোর।'

'টাকাটাই আসল নয় মা।'

'বেশ নয়, টাকা নয় মান্যই হলো। খুব মানী হয়েছিস তুই। কিন্তু এতদিন পরে তুই এমন বায়নাক্কা তুলিস, শিবাজীর মন ঘুরে যেতে পারে—সে ভয় নেই?'

'মন ঘুরে যাবে!' পাঞ্চালী হেসে ফেলে বলে, 'কি যে বল! এতদিন ওযে এত বায়নাক্কা করলো, কই আমার তো মন ঘোরে নি?'

মা প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে বললেন, 'পাগলামি, খেয়াল ছাড়, বিয়ে তোমাকে ওই তারিখেই করতে হবে।

'আচ্ছা, ঠিক আছে, বিয়ে ওই তারিখেই হবে!' বলে নিজের ঘরে গিয়ে কাগজপত্রে মন দিল পাঞ্চালী।

নির্দিষ্ট দিনে শিবাজী এলো, শুনল—পাঞ্চালীর আবেদন। তারপর হেসে উঠে বললো, 'আমার শালী নেই বলে কি তুমি সে পোস্টটাও ক্রীয়েট্ করছো?'

'তার মানে?'

'তার মানে, বিয়ের পর অন্ততঃ তিন-চার মাস তুমি এখানে পড়ে থাকবে, এ প্রস্তাবের মতো জোরাল-তামাশা শ্যালিকার পক্ষেই সম্ভব।'

'জিনিসটাকে এতই বা অযৌক্তিক ভাবছ কেন?'

'একেবারে অযৌক্তিক বলেই।'

'বলছি তো, স্কুলটাকে অনেক চেষ্টায় দাঁড় করাচ্ছি—'

'নিকুচি করেছে তোমার স্কুল! 'দমদম বালিকা-বিদ্যালয়' দাঁড়ালো কি ঘাড় ভেঙে পড়লো তাতে তোমার কি এসে যাচ্ছে?'

মায়ের দিকে মাঝে মাঝে যেমন অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকায় পাঞ্চালী, তেমনি দৃষ্টিতে এবার তাকালো।

শিবাজীর অবশ্য এখন এ সব দৃষ্টির কারুকার্য বোঝবার মতো মনের অবস্থা নয়, তাই সরবে হেসে প্রবল সুরে বলে, 'কত মাইনে দেয় তোমার

দমদম ? আমি সেটা পুষিয়ে দেব।'

'মায়ের মতো তুমিও ওই টাকার কথাটা তুলো না দোহাই তোমার।'

'তবে কোন কথাটা তুলবো ?' শিবাজী হতাশ ভাবে বলে, 'তোমার ওই ভবেশ-বুড়ো যদি অত টেকো বুড়ো না হতো, তা হ'লেও না হয় তোলবার মতো একটা বিষয় পাওয়া যেতো। হতভাগা দমদম বিদ্যালয়কে 'সর্বার্থ সাধক' করে তুলতে পারলেই তোমার পরমার্থ লাভ হবে, এটাই কি বিশ্বাস করতে হবে ?'

'তা কথাটা এতই কি অবিশ্বাস্য ? মানুষের জীবনে পরমার্থ তো একটা থাকবেই।'

'তা হলে এটাই তোমার সংকল্প ?'

'এতক্ষণ ধরে তাই তো বোঝাচ্ছি।'

'অর্থাৎ বিয়ে করেও স্বামীর ঘর করবার ফুরসৎ তোমার হবে না ?'

'কি মুস্কিল চিরকালের মতো বলছি কি ? ক'টা মাসের জন্যে—'

হঠাৎ ভারী রুক্ষ গলায় বলে উঠে শিবাজী, 'আর আমি যদি বলি আমার আর কোন দিনই ফুরসৎ হবে না ?'

সত্যি মেজাজকে আর ঠাণ্ডা রাখতে পারছে না বেচারা। কিন্তু পাঞ্চালী নিজেকে আশ্চর্য রকম ঠাণ্ডা রাখে। খুব শান্ত গলায় বলে, 'তা হ'লে মেনে নিতে হবে বিয়েটা এ জন্মের মতো স্থগিত রাখতে হবে।'

শিবাজী কিছুক্ষণ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থেকে ক্ষুব্ধ গলায় বলে, 'আমার চাইতে তোমার ওই স্কুলের কাজটাই বড় হলো ?'

'তোমার চাইতে নয়!'

'তবে ?'

'সে তুমি বুঝবে না।'

না, সত্যিই কিছুই বুঝবে না।

বোঝানোর চেষ্টাও বৃথা। এ সমাজের পুরুষ সমাজ কবে আর মেয়েদের জীবনের পরামার্থকে বুঝেছে ? বুঝতে চেয়েছে ? বুঝলে তো অনেক সমস্যা আর সংঘর্ষের সমাধান হতো !

একটি রাত্রি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বিংশ শতাব্দীর এই অবিশ্বাস, সংশয় ও হতাশার একটি পতিত অভিশপ্ত আত্মার উদ্ধারের কাহিনী বলতে যাচ্ছি শুনলে অনেকের নাসা কুঞ্চিত, অনেকের চোখ সকৌতুক বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠবে জানি।

কিন্তু সত্যই সুব্রতের জীবনে এমনি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে।

এ যুগে আমরা সবই অল্পবিস্তর অভিশপ্ত, পতিত। আমাদের বিবর্ণ জীবনে মৃত্যুর হিমস্পর্শ লেগেছে। আমাদের আকাশ শূন্য হয়ে গেছে, পৃথিবী যান্ত্রিক প্রাত্যহিতায় কঠিন।

এই মৃত্যু থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে কি তপস্যা আমরা করতে পারি? তপস্যায় বিশ্বাসও আমরা হারিয়েছি। শুধু একদিন সুব্রতের মত দৈবের অযাচিত অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহে অন্ধকার বিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে বিদ্যুৎ-ছটায়, এইটুকুই আমাদের আশা।

কলকাতার উপর সেদিন শীতের সন্ধ্যার গাঢ় কুয়াশা নেমেছে।

কুয়াসা নয়—তার ছলনা। ধোঁয়া ধূলির ষড়যন্ত্র। কিন্তু তার জন্যেও বুঝি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। রূঢ় বাস্তবতাকে মুছে দিয়ে সে কুয়াসা রহস্যের ইঙ্গিত এনেছে ক্লান্ত নগরের চোখে। দিনের গ্লানির কথা দিয়েছে ভুলিয়ে। সে কুয়াসার ছোঁয়ায়, মনে হয়, সমস্ত রুক্ষতার আড়ালে নগরের যে অপরূপ হৃদয় আমাদের কাছে গোপন থাকে তাই যেন অস্পষ্ট অন্ধকারে অকস্মাৎ নিজেকে প্রকাশ করেছে।

এই কুয়াসা আমাদের মনের ওপরও নামে বুঝি; প্রতিদিনের তুচ্ছ ঘটনার শৃঙ্খল থেকে আমরা পাই মুক্তি। মনে হয় দিনের পৃথিবী এই মায়ালোকে আর আমাদের অনুসরণ করতে পারেনি। অস্তিত্বের আর কোন পৃষ্ঠায় আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি।

খানিকক্ষণের জন্য এবার নিজেদের ভুলতে পারব যেন। ভোলাই

বা কেন, সেই হয়ত সত্যকার জানা। দিনের আলোয় নিজেদের সত্তার স্পষ্ট অথচ সীমাবদ্ধ যে অর্থ আমরা পেয়েছি তাই অসম্পূর্ণ। রাত্রি সে অর্থকে প্রসারিত করে দিয়েছে।

সুব্রতের অন্ততঃ তাই মনে হয়। এই কুয়াসাচ্ছন্ন নগরের পথে নিরুদ্দেশ্য ভাবে ঘুরে বেড়াতে তার ভাল লাগে। জীবনের কাহিনী যেখানে স্পষ্টভাবে লেখা সেইদিনের পাতাগুলি মুড়ে সে যেন আর কোন অস্তিত্বের আভাস পায় এই অন্ধকারে।

যেন কোথায় আছে অনাবিষ্কৃত ব্যাখ্যা জীবনের। পৃথিবী যখন অন্ধকারে নিজের সীমা লঙ্ঘন করে তারালোক পর্যন্ত প্রসারিত হয় সেই অপরূপ অবসরে সে-ব্যাখ্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সে-ইঙ্গিত সমস্ত মন দিয়ে গ্রহণ করবার শক্তি বুঝি তার নেই। তবু সে অনুভব করতে ভালবাসে নিজের এই অপ্রত্যাশিত বিস্তৃতি, চারিধারের রহস্য-সঙ্কেতের মাঝে।

সুব্রতকে সামান্য একটু পরিচিত করবার চেষ্টা করা যাক। বাইরের পরিচয় নয় ভেতরের—নিজেকে সুব্রত যেমন জানে।

সুব্রত যেখানে এসে পৌঁচেছে, সেখানে অস্তমান যৌবনের আলো এখনো আছে, কিন্তু নেই উজ্জ্বলতা। দেহের নয় মনের যৌবনই এসেছে তার ম্লান হয়ে। সে ক্লান্ত—আত্মার দুঃসহ ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন। আশা, আদর্শ, প্রেরণার ভগ্নস্তূপের মধ্যে সে বাস করছে। প্রতিদিনের সূর্যোদয়কে সাগ্রহে অভিনন্দিত করবার উৎসাহ আর তার নেই।

এমনভাবে জীবনের ভগ্নস্তূপের মধ্যেই নির্বিকারভাবে আরো অনেকে বাস করে। কোন অসন্তোষ, কোন অভাবের বেদনা তাদের থাকে না। যৌবন যে ব্যর্থ স্বপ্ন ও ভগ্ন-আশার জঞ্জাল তার যাত্রাপথে ফেলে চলে যায় তাই নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে তারা জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে পরিতৃপ্ত ভাবে। তারা নিজেদের পরিচয়ও জানে না।

কিন্তু সুব্রত তেমন নয়। সে জানে যে সৃষ্টি তার কাছে বিবর্ণ হয়ে এসেছে মনে আর তার রঙ নেই বলে। তার মন ধূসর হতাশায় আচ্ছন্ন।

অনেক ভাবাবেগ, অনেক অনুভূতির প্রত্যন্ত প্রদেশ ঘুরে এসেও সে কিছু পায়নি সঞ্চয় করে রাখবার মত। সমস্ত জীবনকে ছন্দোবদ্ধ ভাবে বেঁধে রাখা যায় এমন কোন বিশ্বাসের সম্বল তার নেই।

মনের এই নীরব নিরবচ্ছিন্ন ঊষরতার মধ্যে হাঁপিয়ে উঠতে হয় একদিন।

রাত্রির এই কুয়াসা-স্নিগ্ধ সান্ত্বনার জন্যে তখন বেরুতে হয় পথে। হোক তা কুয়াসার ছলনা মাত্র।

সুব্রত এরিমধ্যে অনেকখানি ঘুরেছে উদ্দেশ্যহীনভাবে। কলকাতার রাস্তাগুলি এক-একটি আলাদা জগৎ—তাদের নিজস্ব বিভিন্ন রূপ আছে—বুঝি পৃথক আত্মাও আছে। দিনের আলোর প্রয়োজনের শাসনে তারা এক হয়ে থাকে, তারপর রাত্রির সম্মোহনে নিজেদের তারা উন্মুক্ত করে দেয়। তখনই পাওয়া যায় তাদের সত্যকার পরিচয়।

হঠাৎ দেখতে পাওয়া যায় দীর্ঘ একটি খাড়া প্রাচীরসমেত বাড়ী কোন রাস্তাকে অদ্ভুত একটি ব্যঞ্জনা দিয়েছে। দিনের বেলা যে গাছ চোখেও পড়েনি রাত্রে হঠাৎ সে-ই কোন পথের কর্মস্থল অধিকার করে তার অপরূপ রহস্য করছে উদ্‌ঘাটিত।

বাড়ীগুলির রেখা ও আলো-ছায়ার বিচিত্র বিন্যাসে এক-একটি রাস্তার রূপ ও অর্থ গিয়েছে বদলে।

নির্জন কয়েকটা রাস্তা ঘুরে সুব্রত তখন বুঝি চৌরঙ্গির কাছাকাছি এসে পড়েছে। এ রাস্তাটিও নির্জন। নগরের বর্ণাঢ্য উচ্ছ্বসিত স্রোত আর খানিক দূরেই যে ফেনায়িত হয়ে উঠেছে জনতায়, আলোয়, কলরবে, এখান থেকে তা বোঝা কঠিন শান্ত গাঢ় ছায়াচ্ছন্ন পথ দুধারের বড় বড় ঝাঁকড়া গাছের রহস্য-স্পর্শ নিয়ে সামনে এগিয়ে গেছে যেন অপরূপ কোন মধুর কাহিনী-লোক।

সুব্রতকে সে পথ নিত্যকার বিবর্ণ ক্লান্ত পৃথিবী থেকে সত্যই জীবনের আর এক পৃষ্ঠায় নিয়ে গেল।

অনেক দূরে দূরে এক-একটি আলোর স্তম্ভ। সে আলোর সঙ্গে যেন অন্ধকারের কোন বিরোধ নেই। সে আলো কিছুকে অতি স্পষ্ট করে তুলতে চায় না, সে অন্ধকার কিছুকে একেবারে ঢেকে রাখে না। আলো অন্ধকার মিলে একটি তরল অপরূপ অস্পষ্টতা সৃষ্টি করেছে।

সুব্রত খানিক এগিয়েই থমকে দাঁড়াল। কে যেন পথের ধারে দাঁড়িয়ে। অস্পষ্টতা যেখানে গাছের ছায়ায় গাঢ় হয়ে উঠেছে সেখানে কে যেন তাকে থামতে ইসারা করলে।

আবছায়া নারীমূর্তি—যেন এই পথেরই আত্মা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

জানি পাঠক আর আমার সঙ্গে এগুতে নারাজ।

কলকাতার রাস্তায় যেখানে খুসী একটি সঙ্কেতময়ী অপরিচিত মেয়েকে গল্পের প্রয়োজনে হাজির করার অপরাধ তাঁরা ক্ষমা করতে প্রস্তুত নন।

তবু সত্যের খাতিরে আমায় এগিয়ে যেতেই হবে। তাছাড়া মেয়েটি অপরিচিত নয়।

সুব্রতও তা বুঝতে পারলে মেয়েটি আলোর কাছে এগিয়ে আসার পর।

'তুমি!'

মেয়েটির মুখ ভাল করে এখনো দেখা না যাক, তার শরীরের হিল্লোলটি বোঝা গেল এ কথায়। 'আমি-ই! আমায় এখানে দেখবার আশা নিশ্চয়ই করনি।'

'করা কি স্বাভাবিক!'

'না, কিন্তু আমায় এখানে কেন, কোথাও দেখবার আশা তুমি করনি। দেখতে চাওনি।'

সুব্রত নীরব।

মেয়েটি বললে—'তা জানতাম!'

তারা দু'জনে এবার চলতে সুরু করেছে।

মেয়েটি আবার বললে—'বিশ্বাস করতে পার, আমিও তোমার জন্যে

ওৎ পেতে ছিলাম না ওই নির্জন রাস্তায়।'

'বিশ্বাস না করতে পারলেই খুসী হতাম যে!'

'তা হতে পারে। তোমার অহঙ্কারের সীমা নেই!'

'সে অহঙ্কারকে তুমিই যে প্রশ্রয় দিচ্ছ মীরা!'

'প্রশ্রয়ের অপেক্ষা তুমি রাখ না।'

'আমার ওপর বড় বেশী অবিচার করছ নাকি?'

মীরা একটু শুষ্ক হাসি হাসল।

'এতদিন বাদে দেখা হওয়ার পর আমাদের আলাপটা ঠিক সঙ্গত হচ্ছে না বোধ হয়।'

'দেখা হওয়াটাই যে অসঙ্গত। সুতরাং সেটার উপর জোর নাই দিলে। আর এইখানেই আমায় বিদায় নিতে হচ্ছে।'

কথা বলতে বলতে তারা অনেক দূরে এসে পড়েছে—পথের নির্জনতা এবার শেষ হয়েছে। চারিধারে উজ্জ্বল আলো আর জনতা।

সুব্রত হঠাৎ বাঁ হাতটা বাড়িয়ে মীরার হাতটা ধরে ফেললে। হেসে বললে,—'তা হয় না মীরা। এমন আরম্ভের আচমকা এমন শেষ হওয়ার কথা কোন বইয়ে লেখে না।'

মীরা এবার না হেসে বুঝি পারলে না।

জিজ্ঞাসা করলে—'কোথায়?'

'কোন রেস্তরাঁয়।'

'না।'

'তবে চল ময়দানে!'

মীরা কোন উত্তর দিলে না। বড় রাস্তায় পড়বার পর একটা ট্যাক্সি খানিক আগে থাকতেই শ্বাপদের মত তাদের পিছু নিয়েছে। সুব্রতের ইসারায় কাছে এসে দাঁড়াল।

ট্যাক্সির ভেতর বসে সুব্রত বুঝি আমাদের একটু অবাক করে দিলে। তাকে এতক্ষণ অত্যন্ত সংযত বলেই মনে হয়েছে।

তার বাঁ হাতটা মীরার পিঠের পেছন দিয়ে লুকিয়ে কখন এগিয়ে

গেছে। হঠাৎ মীরা একটা আকর্ষণ অনুভব করলে।

'মীরা ক্ষমা করো, তোমায় আজ অপরূপ দেখাচ্ছে।'

মীরা কিছু না বলে ধীরে ধীরে সুব্রতের হাতটা সরিয়ে একটু সরে বসল।

সুব্রত নিঃশব্দে খানিকক্ষণ রইল বসে, তার পর বললে, 'এবার আমি কৈফিয়ৎ দেবার জন্য প্রস্তুত।'

'কৈফিয়ৎ নেবার জন্যে আমি আসিনি—' অত্যন্ত গম্ভীর স্বর—একটু তিক্ত।

সুব্রত হাসল ; কিন্তু তার হাসির রঙ বদলে গেছে।—'তা জানি মীরা, কিন্তু গরজ আমার নিজেরই!'

মীরার এবারকার জবাবটা যেন সুব্রতের মুখের উপর চাবুকের মত লাগল। মীরা কঠিন স্বরে বললে, 'কিসের জন্যে! একটু ভণিতা করলে হঠাৎ অভিনয়ের পালা সুরু হওয়া বেমানান হয় বলে ত! তুমি ওটুকু উহ্য রেখেই সুরু করতে পার।'

বিবর্ণ মুখে সুব্রত অনেকক্ষণ বুঝি চুপ করে বসে রইল। মীরাও কথাটা বলবার পর মুখ ফিরিয়ে বসেছে।

ট্যাক্সি চৌরঙ্গিতে এসে পড়েছে এরি মধ্যে। দ্রুত তাদের মুখের ওপর দিয়ে রাস্তার আলো ছায়া সরে যাচ্ছে। মুখের ভাব কারুর কিছু বুঝবার যো নেই। তারা যেন পাশাপাশি থেকেও বহুদূরে সরে গেছে পরস্পরের কাছ থেকে। দুস্তর এই ব্যবধান। তাদের দু'ধার দিয়ে পথ বয়ে যাচ্ছে নদীর মত ; মাঝখান দিয়ে সময়ের স্রোত। সে স্রোত তাদের জীবনে কি নূতন কোন উপলব্ধি এনে দিলে। বলা যাচ্ছে না এখনও।

অনেকক্ষণ বাদে সুব্রত বললে,—'ময়দানে যাবার দরকার নেই মীরা, চল তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।' তারপর একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে,—'কোথায় তুমি যাচ্ছিলে, কবে তুমি এলে, তাই ত জিজ্ঞাসা করা হয়নি এতক্ষণ।'

'তার কোন দরকার ছিল না।' এখনও স্বরে একটু ঝাঁঝ আছে।

সুব্রত সে কথা যে শুনতে পায়নি; জিজ্ঞাসা করলে আবার,—'কোথায় তখন যাচ্ছিলে?'

'কোথাও না!'

'তার মানে!'

'কাল সবে কলকাতায় এসেছি পিসিমাদের বাড়ী। তাঁদের সঙ্গেই বায়স্কোপে গিছলাম। ভাল লাগলো না বলে মাঝখানে উঠে বেরিয়ে পড়েছিলাম।'

'আশ্চর্য। তাঁরা কি ভাবছেন!'

'ভালো কিছু ভাবছেন না বোধ হয়!'

'না তা বলছি না, খুব হয়ত উদ্বিগ্ন হয়েছেন।'

'তোমার সঙ্গে আছি জানলে বোধ হয় হতেন না!'

ব্যথিত স্বরে সুব্রত বললে—'আমায় আঘাত দিতে তুমি অবশ্য পার মীরা।'

'তাই নাকি!'

ব্যঙ্গের স্বর উপেক্ষা করে সুব্রত বললে—'তুমি আমার পরিচয় বোধ হয় ঠিকই জেনেছ মীরা! এক জায়গায় ধরা পড়তেই হয়। তবু এখন আমার মনে হচ্ছে আমার আরেকটা পরিচয় আছে, আর সেইটাই আসল, সেটা এখনও আবিষ্কার করবার সময় আছে।'

'বুঝতে পারলাম না।'

'দাঁড়াও বোঝাচ্ছি। কিন্তু আগে ট্যাক্সি কোথায় যাবে বল! তোমার পিসিমার বাড়ী না বায়স্কোপ?'

মীরা খানিক চুপ করে থেকে বললে—'ময়দানেই যাব।'

'না রাত হচ্ছে! তোমায় না দেখতে পেয়ে ওঁরা নিশ্চয় খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। সিনেমায় না হয় তোমাদের বাড়ীতে চল।'

মীরার কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

'কি ভাবছ?' জিজ্ঞাসা করলে সুব্রত।

'ভাবছি, তোমার এমন একটা সুযোগ নষ্ট হ'ল।'

'নষ্ট হয়নি ত।'

'হেঁয়ালিটা আমার কাছে দুর্বোধ।'

'হেঁয়ালি নয় মীরা। তুমি হয়ত শুনলে হাসবে। কিন্তু তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া নয়, এ আমার ফিরে যাবার চেষ্টা।'

'না হেসে পারলাম না। অত রঙ দিয়ে কথা বলা তোমায় মানায় না।'

'সব রঙ উজাড় করে প্রকাশ করা যায় না এমন কথাও বলার দিন জীবনে আসে। হয়ত আমার এসেছে।'

'অবহেলা সহ্য হয়েছিল উপহাসটা হচ্ছে না।'

'উপহাস নয় মীরা। আমার নিজেরই বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না, কিন্তু তোমাকে সত্য করে, ফিরে পাওয়ার জন্যই ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।' সুব্রতের গলার স্বর সত্যি ভারি হয়ে এসেছে আবেগে।

মীরা ম্লান একটু হাসল—'কিন্তু এক ঘণ্টা আগে আমি ত তোমার মনের সুদূর কোন কোণেও ছিলাম না।'

'না, ছিলে না। কিন্তু এখন আছ এবং সেই থাকার কাছে সমস্ত আশা মিথ্যা হয়ে গেছে জেনো।'

'এসব সেই নির্জন রাস্তা আর হঠাৎ সাক্ষাতের যাদু নয় ত।'

'তাই যদি হয় ক্ষতি কি। সে যাদু সমস্ত পৃথিবী আর সমস্ত কালকে ছুঁয়ে দিক।'

'বড্ড চড়া রঙ তোমার কথায়!'

'মনের রঙ আরো যে চড়া।'······

সে রাতে সুব্রত ও মীরার কাছে ওইখানেই আমরা বিদায় নেব। এবং তারপরের সকালে একেবারে উঠব গিয়ে সুব্রতের ঘরে।

ঘরটা অত্যন্ত প্রশস্ত। এধার-ওধার কয়েকবার পায়চারী করলে প্রাতর্ভ্রমণের কাজ সারা হয়। এত বড় ঘরকে কিছুতেই যেন আপনার করে নেওয়া যায় না। এ ঘরে বড় বেশী ফাঁক থেকে যায়। অন্তরঙ্গ অন্তরঙ্গ নয় এ ঘর, যেন উদাসীন।

সুব্রতের এই ঔদাসীন্য এতদিন বাজেনি। কিছুই তার বাজেনি। তার মন ছিল নিঃসাড়। প্রাণের উৎসই তার বুঝি গিয়েছিল শুকিয়ে। আর নিজের এই নিয়তিকে সে স্বীকার করে নিয়েছিল। এমনি করে তাকে টেনে চলতে হবে দিনের পর দিন অস্তিত্বের শ্রান্ত ধারা। সেধারা আর উঠবে না আবর্তে ফেনিল হয়ে, প্রপাত হয়ে পড়বে না ঝাঁপিয়ে অনিশ্চিত কোন ভবিষ্যতে, আর আসবে না তার স্রোতে বন্যাবেগ। শুধু মন্থর ভাবে মনের ধূসরতায় সে যাবে ভেসে।

পৃথিবীর সাথে তার পরিচয় পর্দার আড়াল থেকে অস্পষ্টভাবে, কোথাও উলঙ্গ সাক্ষাৎ হবে না আর কোন সত্যের আর কোন সত্তার সঙ্গে। আত্মার গহনতায় অসীম তার হতাশা।

কিন্তু হঠাৎ কি আলো এল, অন্ধকার বিদীর্ণ করে। মনের অন্ধকার সাগর উঠেছে দুলে। অন্ধকার ঢেউ ভেঙে পড়ছে ফেনায়িত দীপ্তিতে।

শুধু একটি মানুষের আকস্মিক আবির্ভাবে তার জীবনে এল এই অপরূপ জোয়ার। কোষ-মুক্ত তরবারির মত তার চেতনা উঠলো ঝিলিক দিয়ে।

কোন ঘটনা যায় মনের উপর দিয়ে উদাসীন ভাবে চলে আর কোন ঘটনা আসে চারিদিকে বিদ্যুৎস্পন্দন তুলে অকল্পিত সম্ভাবনার। কাল রাতের ঘটনা যেন তাই। সাক্ষাৎ নয়, দুটি সত্তার সে বুঝি সংঘর্ষে। অন্ধকার আকাশের মৃত তারকাপিণ্ডও উঠেছে বহ্নিদীপ্ত হয়ে সে সংঘর্ষে।

শুধু প্রেম বলে ত ব্যাখ্যা করা যায় না সত্তার এই সঙ্ঘাতকে, তার চেয়ে বেশী কিছু। বুঝি তার চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে মীরাকে সে এতদিন অনায়াসে ভুলেই ছিল।

'তোমার মনের কোন সুদূর কোণেও আমি ছিলাম না।'

মিথ্যা সে ত বলেনি। বহুজনের ভীড়ে অতীতের স্মৃতিতে সে ছিল

মিশে। তারপর একি আবির্ভাব! সত্যিই অতীত স্মৃতির সেই সন্ত কৈশোরাতিক্রান্তা উদ্ধত চঞ্চল প্রকৃতির মেয়েটির সঙ্গে এ-মীরাকে কিছুতেই মেলান যায় না! সে মীরা তখনও নারী হয়ে উঠেনি। তাকে অবহেলা করবার ইচ্ছা হয়নি সুব্রতের, জয় করবার উৎসাহও নয়, আলগোছে পথের পরিচয় হিসাবে সে তাকে সম্ভাষণ করেছে অর্ধ উদাসীন ভাবে, তারপর গিয়েছে ভুলে। মীরা তখন সঙ্গী হিসাবে উপভোগ্য। নারীত্বের আভাস তার ভেতর যে-টুকু ছিল তাতে মন স্নিগ্ধ করে রাখে কিন্তু অতিমাত্রায় সচেতন হতে বাধ্য করে না। ছেলেমানুষ হিসাবে তার উপর খানিকটা মুরুব্বীয়ানার ভাব থাকে অথচ একরকম সুন্দরী মেয়ে হিসাবে তার সঙ্গ ভালোই লাগে। কিন্তু ভালো লাগাবার জন্যে মীরা নিজে সেদিন বিশেষ চেষ্টা করেছে বলে মনে হয় না।

যা ধারালো তরবারি হয়ে উঠবে সে ইস্পাতের পরিচয় তখনই বুঝি প্রকাশ পেয়েছিল।

পাতলা একটি মেয়ে, দেহ দীর্ঘ হয়ে উঠেছে উর্ধোৎক্ষিপ্ত ফোয়ারার মত প্রথম যৌবনের প্রেরণায়, পায়নি এখনো সৌষ্ঠবের পূর্ণতা। তীক্ষ্ণতা তার চোখে, তীক্ষ্ণতা তার মুখের কথায়। ঘা না দিয়ে কথা কয় না, বিশেষ করে সুব্রতকে আহত করবার চেষ্টায় তার একটা যেন বিশেষ আনন্দ আছে।

ভালোই লাগত অদ্ভুত তার এই বিরুদ্ধতা।

মীরার বাবা তখন মির্জাপুরে থাকেন।

শীতের শেষ, দুপুরে হাওয়ায় বেশ তাপ আছে। তারা চলেছে 'টাণ্ড্রা ফল্‌সে' পিক্‌নিক করতে। পরিকল্পনাটা মীরার দিদি ও জামাইবাবুর। তাঁরা কয়েকদিনের জন্যে তখন সেখানে বেড়াতে এসেছেন!

তখন সুব্রত বিন্ধ্যাচলে থাকে, স্বাস্থ্যের জন্য নয়, কাজের অছিলায়। সেও একবার কাজে লাগার চেষ্টা করছে। বিন্ধ্যাচলে সে একটা

স্যানোটোরিয়াম গড়বার কল্পনা করছে। সেই সূত্রেই মীরার বাবার সঙ্গে আলাপ। মীরার বাবা তখন মির্জাপুরের সরকারী ডাক্তার। আলাপ থেকে গভীর ঘনিষ্ঠতা হতে দেরী হয়নি। সুব্রতের সে বিষয়ে সহজাত পটুত্ব ছিল।

কিন্তু মীরা সেদিন তার দৃষ্টির সীমার মধ্যে ছিল, লক্ষ্যের বিষয় নয়। চোখ দিয়ে সে দেখেছে মীরাকে, মন দিয়ে টের পায়নি। তাকে লক্ষ্য করল ভাল করে বুঝি পিক্‌নিকের দিন। মনোযোগ দেবার সেদিন নানা দিক দিয়ে সুবিধে হয়েছিল—সময়টা এবং স্থানটা অনুকূল, হাতের কাছে আর কেউ নেই। দল বেঁধে সবাই এদিক-ওদিক সরে পড়েছে। কেমন করে মীরাই শুধু দলছাড়া হয়ে পড়েছিল কে জানে।

পিক্‌নিক নামেই। টাঙ্গায় করে যোড়শপচারে রান্নার উপকরণ এসেছে। এসেছে ঠাকুর চাকর দাসী। দিদি ও জামাইবাবু গেছেন যেখান থেকে সহরে জল সরবরাহ হয় সেই টাণ্ড্রার বিশাল বাঁধান হ্রদ দেখতে। মীরার বাবা ও মা কাছাকাছি এক সাধুর সন্ধান পেয়ে দুর্বলতা আর চেপে রাখতে পারেন নি। সুব্রত খানিকক্ষণ একলা পড়েছিল। তারপর মীরা এসে যোগ দিয়েছে।

সব কথা সুব্রত এখন মনে করতে পারে না। শুধু এইটুকু মনে আছে সমস্ত ঘটনার পেছনে পটভূমিকা ছিল টাণ্ড্রা ফল্‌সের প্রাকৃতিক দৃশ্য শুধু নয় তার অবিরাম নিরবচ্ছিন্ন গর্জন। গম্ভীর বিরামহীন শব্দ কেমন করে যেন সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে দেয়, প্রভাব বিস্তার করে সমস্ত মনের ওপরে।

ফল্‌সের ধারে পাকা কয়েকটা ঘর আছে যাত্রীদের বিশ্রাম করবার জন্যে। তারই দোতলার বারান্দায় একটা ইজিচেয়ার মালীকে দিয়ে পাতিয়ে সুব্রত ছিল বসে। হঠাৎ তার কাছে একটা ক্ষীণ স্বর শুনে সুব্রত চমকে উঠেছিল। মীরা এসে দাঁড়িয়েছে আলিসার কাছে।

হেসে সুব্রত বলেছিল—'ঝগড়া ছাড়া এখানে আর কিছু, শোনা যাবে না মীরা। তুমি অনায়াসে কোমর বেঁধে লাগতে পার।'

তার নিজের স্বর নিজের কানেই অত্যন্ত ক্ষীণ শুনিয়েছিল। প্রপাতের আওয়াজ আর সমস্ত শব্দ ঢেকে দিয়েছে। মীরাও পায়নি শুনতে ভালো করে; কাছে সরে এসে গলা বাড়িয়ে বলেছিল—'ঝগড়ার কথা কি বলছেন?'

'শুনতে যখন পাওনি তখন আর দরকার নেই।'—তারপর ইজিচেয়ার থেকে উঠে পরে বলেছিল—'তুমি বস এইটায়, আমি আরেকটা আনাচ্ছি।'

'থাক আমি বসব না। আপনার সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ। এ জিনিসটা খুব আপনার দুরস্ত।'

'তোমাদের যেটা প্রাপ্য সেটা ত দিতে হবে।'

'আমাদের প্রাপ্য শুধু ওইটুকুই......'

সুব্রত একটু বিস্মিত হয়েছিল বই কি! মীরার কাছে যেন একথা আশা করেনি। এবার ইচ্ছে করেই বলেছিল—'তোমাদের—তোমাদের প্রাপ্য সসাগরা পৃথিবী কিন্তু আমরা এ যুগের অক্ষম দুর্বল পুরুষ, কতটুকু আর দিতে পারি। সৌজন্য দিয়ে তাই আমাদের দৈন্য ঢাকি।'

মীরা হেসে এবার চেয়ারটায় বসে বলেছিল—'আপনি ঘুমোবার আগে বোধ হয় এসব কথা রোজ তৈরী করে রাখেন—না?'

'না, একটা বই কিনেছি; মেয়েদের চমৎকৃত করবার একশ একটি জবাব'—সেইটে মুখস্থ করি। কিছুদিন বাদে হয়ত পুরাণ কথা দুবার বলে ধরা পড়ে যাব।'

এবার দুজনেই হেসে উঠেছিল। মালী তখন আর একটি চেয়ার এনে দিয়েছে। সুব্রত সেটায় না বসে বলেছিল,—'এখনো চেঁচিয়ে কথা বলা ক্ষুর দিয়ে কুটনো কোটার মত, ভাল কথার ধার থাকে না। আপত্তি না থাকে ত চল একটু বেরিয়ে পড়ি।'

'আপত্তি ত আপনারই আছে মনে হচ্ছিল।'

'তখন ছিল, ভালো ভালো কথাগুলোর শ্রোতা পাইনি বলে।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মীরা বলেছিল—'কোন্ দিকে যাবেন?'

'সাধুজির আশ্রমে অদৃষ্টটা যাচাই করে আসি চল, তোমার বাবা মা গেছেন।'

'না, চলুন এমনি এদিক-ওদিক ঘুরে আসি।'

খানিকক্ষণ একসঙ্গে যেতে যেতে দুজনেরই কথা থেমে গিয়েছিল বুঝি প্রপাতের অশ্রান্ত গর্জনের অলক্ষিত প্রভাবে। নিরবচ্ছিন্ন এই শব্দ নির্ঝরের বুঝি একটা নেশা আছে, ধীরে ধীরে সমস্ত মন অভিভূত হয়ে যায়। কিন্তু সেদিন এমন কিছু উল্লেখ করবার মত ঘটেনি। অন্ততঃ সুব্রতের দিক থেকে নয়। হয়ত জলের একটি ধারা ডিঙোতে গিয়ে সুব্রত মীরার হাত ধরেছে, হয়ত দু'ধারের পাথরের স্তূপের মাঝখান দিয়ে যেতে দু'জনের ছোঁয়াছুয়ি হয়ে গেছে। কিন্তু সে স্পর্শ সুব্রতের মনে সঞ্চিত হয়ে নেই। সুব্রত সেদিন মীরাকে সামান্য একটু আবিষ্কার করেছিল মাত্র, উৎসাহিত হয়নি।

পিক্‌নিকের পরেও অনেকদিন সুব্রত বিন্ধ্যাচলে ছিল। মীরার প্রতি হয়ত আগের চেয়ে সে বেশী একটু মনোযোগ দিয়েছে, হয়ত কোন দিন অভিনয় করেছে একটু বেশী। কিন্তু তার ভেতর সত্যকার ব্যাকুলতা কিছু ছিল না। বিন্ধ্যাচলের স্যানাটোরিয়ামের কল্পনার মতই একদিন তার মন থেকে সব মুছে গেছে। মীরার মনে সে সব দিন যে সযত্নে সঞ্চিত থাকতে পারে একথা সে ভাবেনি। আর একবার পাটনায় কিছুদিন আগে মীরার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, দেখবার কথা সেদিনও তার মনে হয়নি। মীরার ব্যবহারে হয়ত সে ভেবে দেখবার মত কিছু পেত যদি না মন থাকত আত্মনিমগ্ন। কিন্তু তার আত্মার ক্লান্তির তখনই সূচনা হয়েছে।

মীরার পরিবর্তন সে লক্ষ্য করেছে একান্ত নির্লিপ্ত নির্বিকারভাবে। কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণ পার হয়ে মীরা নারীত্বের পরিপূর্ণতার একটি মহিমা লাভ করেছে। তবু সুব্রতের কাছে তা ছিল নিরর্থক। মীরা সেদিন বুঝি সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ করে একটু ধরা দিয়েছিল। আভাস দিয়েছিল তার হৃদয়ের উদ্বেলতার। কিন্তু সুব্রত সচেতন হবার প্রয়োজন

বোধ করেনি। সে বিশ্বাসই করেনি। অনুরাগ আকর্ষণের সাধারণ দৈনন্দিন অভিনয় হিসাবে সমস্ত ব্যাপারটাকে গ্রহণ করেছে, মিথ্যা, একটু দুর্বলতার ভান করতেও বাধেনি। এই ভানই তার জীবনের মূল পর্যন্ত শুকিয়ে দিয়েছে সে জানে, তবু উপায় ত নেই। ভান করাই এসব ক্ষেত্রে রীতি। তুমিও অভিনয়ে যোগ দেবে এইটুকুই সবাই আশা করে। সুবিধা তার অনেক। সময় কাটে বেশ। বিদায়ের বেলা কিছু দাগ থাকে না মনে; দেনা-পাওনা বোঝা-পড়ার কোন কোন হিসাব-নিকাশও নয়। মন যাদের মরে গেছে তাদের পক্ষে এর চেয়ে সুবিধার আর কি হতে পারে। এ অভিনয়ে অভ্যস্ত বলেই তার ক্লান্ত মন মীরার সংস্পর্শে কোন সাড়া দেয়নি।

তারপর এই সাক্ষাৎ! সুব্রত এতক্ষণে স্পষ্ট করে গতরাত্রের কথা ভাবতে সাহস করে। মীরা তার কাছে শুধু নূতন করে উদ্ঘাটিত হয়নি তাকেও করেছে উন্মোচন, তার নিজের রহস্যকে। শুধু কি নগরের রাত্রির মোহ আর সাক্ষাতের এই আকস্মিকতা তার মনকে বিহ্বল করে তুলেছে এমন করে! তার ভয় হয় সাবানের বুদ্বুদের মত এখনি সমস্ত রহস্য যদি যায় মিলিয়ে, রাত্রির সুর দিনের আলোয় যদি যায় কেটে, যদি রাত্রির সেই রহস্যময় মেয়েটিকে আর না খুঁজে পায় মীরার মধ্যে!

অনেক স্থূল সংস্পর্শ ত হয়েছে তার জীবনে, সে আর তা চায় না, তার মন অবসন্ন এই সমস্ত সংস্পর্শেরই ভারে আর গ্লানিতে, জীবনে তা কিছুই আনে না, শুধু রেখে যায় ক্লান্তির ভার। বিদ্যুৎগর্ভ মেঘে মেঘে সাক্ষাত সে নয়, আকাশ স্পন্দিত হয়ে উঠে না সে সাক্ষাতের উন্মাদনায় —বিদ্যুতের চেয়ে তীব্র, তার চেয়েও তীব্র, তার চেয়েও সূক্ষ্ম আনন্দের প্রবাহ বয়ে যায় না সত্তা থেকে সত্তায়।

কাল কি এই সাক্ষাতই হয়েছিল? না তারই মনের ভুল?

কিন্তু সাহস হয় না তার এ ভুল যাচাই করতে। তার চেয়ে এইখানেই পড়ুক যবনিকা এ অধ্যায়ের ওপর, এই রাত্রির রহস্যকে কাজ নেই দিনের আলোয় টেনে এনে। জড়ত্বের কুয়াসা ক্ষণিকের জন্য মন থেকে

গিয়েছে কেটে। এইটুকুই যথেষ্ট আর তার লোভ করবার প্রয়োজন নেই।

নাই বা হল আর মীরার সঙ্গে দেখা। জীবনে কাহিনী সম্পুর্ণ হয় না। সম্পূর্ণ করতেই হবে এমন কোন কথা নেই। একটি রাত থাকুক তাদের জীবনে অসম্পূর্ণতায় অপরূপ হয়ে।

একটি অপরূপ রাত, যাতে তার পতিত আত্মা গম্ভীর জড়ত্ব থেকে জেগে উঠেছে, তার জীবনে অক্ষয় হয়ে থাক।

দীপ তার জীবনে হয়ত জ্বলবে, কিন্তু একটি থাক তারকা, সুদূর দিগন্তে আয়ত্তের অতীত হয়ে।

রাত্রির এই রহস্য-পরিচয় সে প্রাত্যহিক জীবনের মাঝে টেনে এনে ধূলিমলিন করবে না।

সবে এখন সকাল হয়েছে। মানুষের দুর্বলতারও অন্ত নেই জানি, তবু সুব্রতের এই সঙ্কল্পটুকু জেনেই আমরা বিদায় নিলাম।

●

স্বীকৃতি

জরাসন্ধ

এক

অলক রায়ের সেদিনের কথাগুলো আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। মানুষটিও চোখের উপর ভাসছে। লম্বায় বোধহয় ছ-ফুটের কিছু বেশী। ছিপছিপে গড়ন। মাথার মাঝখানে একটি ছোট গোলাকার টাক, চারদিক ঘিরে রুক্ষ কোঁকড়ানো চুল। নাকটা খাঁড়ার মত। দুপাশে দুটি গভীরে বসানো চোখ, ইংরেজিতে যাকে বলে, 'ডিপ-সিটেড্ আইজ'। আকারে ছোট, বলতে গেলে অতবড় একটা দেহের পক্ষে নিতান্ত বেমানান। কিন্তু অসাধারণ তীক্ষ্ণ তাদের দৃষ্টি। কারো মুখের উপর পড়লে তার মনে হবে অন্তস্থল পর্যন্ত অনাবৃত হয়ে গেল।

ভারী ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে এবং তার সঙ্গে মানানসই মোটা সিগার টানতে টানতে বলেছিলেন, আমি লিখি আমার নিজের জন্যে। নিজের চিন্তা-ভাবনা খেয়াল-খুশিগুলোকে ইচ্ছামত রূপ দিই। কেউ পড়ল কিনা, কিংবা পড়ে কারো ভাল লাগল কি মন্দ লাগল, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।

কথাগুলোকে আমার দম্ভোক্তি বলে মনে হয়েছিল সেদিন। মুখ ফুটে না বললেও সেই সন্ধানী চোখ দুটো নিয়ে তিনি বোধহয় আমার মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর পরের কথা থেকেই তা বোঝা গেল—তুমি হয়তো ভাবছ, এটা আমার অহঙ্কার। না; একে বলতে পার আত্মপ্রত্যয়, প্রত্যেক লেখকেরই যা থাকা দরকার। তা না-হলে তাকে বলব হ্যাক্-রাইটার, পাঠকের ভাড়াটে লেখক।

এবার আর প্রতিবাদ না করে পারিনি, যদিও তার সুর অতি ক্ষীণ, অতবড় প্রতিভার সামনে আমার মত একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর মাসিক-

পত্রের অনুগ্রহ-প্রার্থী গল্পলেখকের কণ্ঠে যতটুকু সম্ভব। বলেছিলাম, কিন্তু আমার লেখা যদি কেউ না পড়ল তার সার্থকতা কোথায়? কী পেলাম আমি তার থেকে?

পেলাম আনন্দ, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন অলকবাবু, সৃষ্টির আনন্দ, আমার সৃষ্টি থেকে যা স্বতঃ-উৎসারিত।

তাতে মন ভরে?

কেন ভরবে না? তার চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী আছে লেখকের জীবনে?

এ যখনকার কথা, অলক রায়ের প্রতিভা তার আগেই বাংলাদেশের বিদগ্ধ পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করেছে। কিন্তু সাধারণ পাঠক তাকে বড় একটা চেনে না। প্রকাশকের বিজ্ঞাপন দেখে যে সব পাবলিক লাইব্রেরী তাঁর দু-চারখানা উপন্যাস সংগ্রহ করেছিল, তারা আর অগ্রসর হয়নি। বইগুলো প্রায় নতুনই রয়ে গেছে আলমারির কোণে। সুতরাং তার পরে যা লিখেছেন, স্বভাবতই সেগুলোর দিকে তারা আকৃষ্ট হয়নি।

লাইব্রেরীর বাইরেও কিছু বই কাটে। তার বেশির ভাগ বোধহয় বিয়ের উপহার। সে-সব ক্রেতাদের প্রধান লক্ষ্য চারটি—বইয়ের নাম, দাম, মলাট এবং কিছুটা বিষয়-বস্তু। নামের মধ্যে তারা খোঁজে একটি মিষ্টি রোমান্সের সুর, ধ্বনি-মাধুর্য, নয়তো কোনো শুভসূচক ইঙ্গিত। তার পর দেখে দামটা মাঝারি ধরনের কিনা, ইংরেজিতে যাকে বলে মডারেট। একাধিক বই দিতে হবে তো, এবং উপহার-দাতারা অনেকের সাধারণ স্তরের ছাত্রছাত্রী কিংবা ক্ষীণ-পকেট চাকরীজীবি।

সুদৃশ্য রঙীন মলাট, বিশেষ করে তার উপরে নানা ভঙ্গিমার নারী-চিত্র—উপহার নির্বাচনের একটা প্রধান অঙ্গ। ভিতরকার বস্তুটিও কম বিবেচ্য নয়। সকলের চেয়ে বেশী চলে প্রেম; ব্যর্থ নয়, সার্থক প্রেম, অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার সুখ-মিলনে যার পরিণতি। পরের স্থান নেবে কোনো মধুর ঘরোয়া গল্প কিংবা ঐজাতীয় কোনো ভাবাবেগভরা রোমান্টিক কাহিনী।

বিয়ের বাজারে 'অভিশপ্ত' কিংবা 'লগ্ন-ভ্রষ্টার' চেয়ে অনেক বেশী ক্রেতা আকর্ষণ করবে 'স্বপ্নসায়র', 'নূপুর-নিক্কণ' কিংবা 'মধুর লগন'। এখানে পাঁচ টাকার কাছে হার হবে বারো টাকার, এবং নামজাদা সাময়িক পত্রে বাঁধা সমালোচক ও কিছু কিছু সাহিত্য কারবারী বাংলার অধ্যাপক যে সব উপন্যাসকে 'বাস্তবধর্মী', 'জীবনাশ্রয়ী', 'যুগমানসে দর্পণ', 'গভীর মননশীল' ইত্যাদি কটমট বিশেষণে ভূষিত করে থাকেন সেগুলোকে পিছনে ঠেলে এগিয়ে আসবে এমন কতকগুলো ঝকঝকে বই, তাঁদের ভাষায় যারা 'জ'লো 'মেলোড্রাটিক', 'অসার' 'অবাস্তব' কিংবা 'সেন্টিমেণ্টাল'।

তাদের ভিতর থেকেই কয়েকখানা বেছে নিয়ে যাবে বর বা কনের বন্ধুরা, স্বচ্ছ কাগজে জড়িয়ে লাল ফিতেয় বেঁধে তুলে দেবে একরাত্রির মত লব্ধসিংহাসনা নববধূর হাতে, এবং তার কাছ থেকে লুফে নেবে তার সখীরা। তারপর এক হাত থেকে আরেক হাতে ফিরবে সেই বই। তার মধ্যে হয়তো এমন একটি জগতের ছবি আছে, একমাত্র ঐ লেখকের মনোভূমি ছাড়া কোথাও যাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা কি তার পাঠক-পাঠিকারা জানে না? জানে। তবু তন্ময় হয়ে ডুবে যাবে নিছক কল্পনার উপর গড়ে তোলা সেই সব মোহময় ছবির মধ্যে, যেখানে নিউ আলিপুরে অজস্র বিলাসময় রংরুমে বসে কোনো এক লক্ষপতির সুন্দরী কন্যার কানে কানে প্রেম নিবেদন করছে এক 'দীন হীন' উদ্বাস্তু যুবক, কিংবা টালিগঞ্জের দূর প্রান্তে টিনের ঘরের ভাঙা জানালায় কোনো সওদাগরী অফিসের টাইপরাইটার-চালিকা একটি কালো মেয়ের পাণি-প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে বালিগঞ্জবাসী অভিজাত বনেদী ঘরের একমাত্র তরুণ বংশধর।

এই বইয়ের যারা পাঠক-পাঠিকা তারা জানে ঐ জগতটিতে তারা কোনদিন পৌঁছতে পারবে না। তাই সহৃদয় লেখকের হাত ধরে অন্তত: কিছুকালের জন্যে সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়, কয়েক মুহূর্ত সেই অপ্রাপনীয় কল্পলোকের শোভা ঐশ্বর্য এবং মধুরিমার স্বাদ নেই। এও এক ধরনের

জীবনোপভোগ।

আরো কিছু লোক বই কেনে। তারা ডেইলি প্যাসেঞ্জার, সরকারী এবং সওদাগরী অফিসের বড়, মেঝো, সেঝো কিংবা ছোট কেরানীর দল। জুনিয়ার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট থেকে হেড-ক্লার্ক। অর্থাৎ 'বাবু' পর্যায়ের লোক। ছুটতে ছুটতে গাড়ির একটি নির্দিষ্ট কোণ দখল করে একদল যেমন মাঝখানে একটা ঝাড়ন কিংবা চাদর বিছিয়ে তাস নিয়ে বসে, আরেক দল তেমনি এখানে ওখানে ছিট্‌কে পড়ে খুলে বসে কোনো হাল আমলের চটি উপন্যাস। পথটুকু পার করে দেবার সঙ্গী সহজ, কোমল, হালকা, মধুর সুখপাঠ্য গল্প, যার রস পেতে হলে আখের মত দাঁত বসানো হয় না, আঙুর, কমলা, বাতাবির মত চুষে খেলেই চলে। তার মধ্যে 'জীবনবোধ' বা 'যুগমানসের' বালাই নেই, 'মনীষাদীপ্তি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের' কচকচিও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আর বই কেনেন কর্মব্যস্ত সংসারের গৃহিণীরা: ঝি-চাকর, বয়-বাবুর্চি পরিবৃত সংসারের উল-কাঁটা সর্বস্ব গৃহিণীদের বাজেটেও বইয়ের একটা ক্ষুদ্র স্থান আছে। সেগুলো প্রায়ই ইংরেজী, তার একপাশে দুচারখানা প্রসিদ্ধ লেখকের বাংলা গ্রন্থও দেখা যায়। ড্রইংরুমে কিংবা শয়নকক্ষে সুদৃশ্য বুক কেস-এ সাজানো থাকে। 'সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা'। শুধু 'ভৃত্য নিত্য ধূলা ঝাড়ে, যত্ন পুরা মাত্রা'।

কিন্তু খেটে খাওয়া গিন্নীরা বই কেনেন পড়বার জন্যে। সারা সকালটা রান্না-বান্না, ঘর-দোরের কাজ নিয়ে হিমসিম খাবার পর দুটো ভাত মুখে দিয়ে একটু গড়িয়ে নেবার অবসর যখন আসে, তখন হাতে কিছু চাই। এমন একটি গল্প, যার পিছনে হোঁচট খেতে খেতে চলতে হয় না, যে নিজে থেকেই টেনে নিয়ে যায়। বেশী দূর নয়, কয়েক পাতা, চোখদুটো যতক্ষণ না বুজে আসে।

অলক রায় অবশ্যই এদের কারো জন্যে লেখেন নি। বিয়ের উপহার,

ডেইলী প্যাসেঞ্জারের সঙ্গী, কিংবা ক্লান্ত গৃহিণীর নিদ্রাকর্ষণের কোনো স্তরে গিয়ে পেঁচেছে তাঁর বই, এমন দুর্ঘটনা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। আসলে তার সম্ভাবনাও ছিল না; তাঁর যারা পাঠক (সংখ্যায় অতি মুষ্টিমেয় এবং নিজেদের কাছে বুদ্ধিজীবি, ও অপরের কাছে স্নব বলে পরিচিত)—তাঁরা বলতেন, অলক রায়ের লেখা ইজিচেয়ারে বসে পড়বার জিনিস নয়, তার প্রতিটি লাইন পড়তে পড়তে ভাবতে হয়। তাঁদের মধ্যে একজন কোনো একটি সাময়িক পত্রে (যা শুরুতে ছিল মাসিক, পরে হল, ত্রৈমাসিক এবং আরো পরে ষান্মাসিকে গিয়ে দাঁড়াল) অলক রায়ের দু-একখানা উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। সেটা নাকি মূল রচনার চেয়েও দুর্বোধ্য। গ্রন্থকার নিজে অবশ্য তা পড়েন নি, তাঁর লেখা সম্বন্ধে পাঠক বা সমালোচকদের মতামত জানবার কোনো আগ্রহ তাঁর ছিল না। অন্য কেউ কেউ পড়েছিলেন। তাদেরই একজনের মন্তব্য তাঁর কানে গিয়েছিল—'অতি উঁচুদরের রিভিউ, একটু হয়ত অস্পষ্ট। তবে অলক রায়ের প্রতিভার ওর চেয়ে স্পষ্ট পরিচয় বোধহয় সম্ভব নয়।'

শুনে খুশী হয়েছিলেন অলকবাবু। তাঁর উপন্যাস সম্পর্কেও ঐ ধরনের উক্তি প্রচলিত আছে, তিনি জানতেন। একবার এক অর্বাচীন বলেও ফেলেছিল তাঁর মুখের উপর—'আপনার লেখা মোটেই বোঝা যায় না।'

অলকবাবু মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, বোঝা কি নিজে থেকে যায়? তাকে মাথায় করে বয়ে নিতে হয়। ঐ মাথাটাই হল আসল। ওটা না হলে তো চলবে না।

তাঁর উপন্যাসের রিভিউ সম্বন্ধে যে উক্তিটি শুনে তিনি মনে মনে খুশী হয়েছিলেন, সেটি কার, প্রথমটা জানতে পারেন নি। শুনেছিলেন, তিনি একজন মহিলা। সেই জন্যেই হয়তো তার সম্বন্ধে আরো কিছুটা জানবার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু কৌতূহল-নিবৃত্তির

কোনো চেষ্টা করেন নি।

অলক রায়ের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়, স্বাভাবিকও নয়। আপনা থেকেই পরিচয় হয়ে গেল। অনেকটা আকস্মিক ভাবে বলা চলে।

দক্ষিণ কলকাতার নতুন-গড়ে-ওঠা অভিজাত অঞ্চলে একটি মহিলা প্রতিষ্ঠান। সদস্যরাও অভিজাত, তবে স্থূল বা প্রচলিত অর্থে নয়। অন্ততঃ সকলের বেলায় সে-কথা বলা চলে না। স্বামীর চাকরি, বাড়ি, গাড়ি, কিংবা নিজের শাড়ি-গয়না দিয়ে যাদের পরিচয় এমন ক'জন যেমন আছেন, (যদিও এক্ষেত্রে তাঁরা সেভাবে পরিচিত হতে চান না) তেমন আরেকটা সংখ্যা আছে, যাদের আভিজাত্যটা মানসিক, অর্থাৎ ইনটেলেক্‌চুয়াল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উঁচু ডিগ্রি আছে, এবং সেটি অর্জন করতে গিয়ে কফি হাউসের মিশ্র সমাজে যে অতি-আধুনিক চিন্তাধারার প্রবাহ চলে, তার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে ; কলেজ ইউনিয়নের কার্যকলাপের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন কেউ কেউ। কর্মজীবনে কেউ শিক্ষিকা (স্কুলে এবং কলেজে) কেউ সরকারী কিংবা সওদাগরী অফিসে দশটা-পাঁচটা করেন, কেউ আবার মনোমত কোনো পূর্ব-সহচরকে জুটিয়ে নিয়ে সংসার পেতেছেন, বাজার করেন, ঘর-দোর সাজান, রেডিও শোনেন এবং সপ্তাহান্তে চৌরঙ্গীপাড়ায় ছবি দেখতে যান। তাঁদের মধ্যে মা-ও হয়েছেন দু-একজন, কিন্তু মাতৃত্বের পরিধি ঐ জন্মদান পর্যন্ত। পরের অংশে প্রথম অঙ্ক জুড়ে আছে আয়া, সেই প্রাচীন যুগের চেড়ীর আধুনিক সংস্করণ, দ্বিতীয় অঙ্কের ভূমিকা নেয় নার্সিং স্কুল, যেটা স্কুল তো নয়ই, নার্সিং অর্থাৎ শিশু পালনের ক-খ নিয়েও মাথা ঘামায় না।

এরা কয়েকজন মিলে একটি গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেন। মাসান্তে মিলিত হতেন এদের মধ্যে যাঁরা সঙ্গতিপন্ন সাধারণতঃ তাঁদের বাড়ি। স্থান-সঙ্কুলানের প্রশ্ন ছিল, তার সঙ্গে জলযোগের ব্যাপারটাও অবশ্য বিবেচ্য। ওটা একটু ব্যাপক আকারে হত, এবং তার আয়োজন করতেন সভা যেখানে বসত সেই বাড়ির গৃহিণী। উদ্দেশ্য, সাহিত্য এবং সংস্কৃত-বিষয়ক আলোচনা, এবং সেই উপলক্ষ্যে মাঝে মাঝে এঁরা কোনো

সাহিত্যিক কিংবা সংস্কৃতিবান ব্যক্তিকে ডেকে নিয়ে আসতেন। তাঁদেরই ডাকতেন—বিদগ্ধ এবং বুদ্ধিজীবী সমাজে যাঁরা প্রতিষ্ঠাবান, 'জনপ্রিয়' নামক যাত্রার আসরে নেমে যান নি।

এইখানে একদিন অলক রায়ের ডাক পড়ল। ডাকতে এলেন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকা বিশাখা মিত্র, কোনো মহিলা কলেজে দর্শনের অধ্যাপিকা, সঙ্গে তাঁর এক ছাত্রী, মঞ্জুলা। মঞ্জুলা অলক রায়ের বই পড়ে না। শিশির গুপ্ত, অমল মিত্র প্রমুখ 'মিষ্টি' (মিষ্টিক নয়) লেখকদের নিয়ে তার যে একটি জগৎ আছে, অলক রায় তার অনেক ঊর্ধ্বে। সে এসেছিল অন্য কারণে। তার ধারণা সাহিত্যিকরা চেহারায় মানুষ হলেও আসলে এক ধরনের আজব জীব। তাদের দু-একজনকে দূরে থেকে বক্তৃতা করতে শুনেছে, কাছ থেকে কথাবার্তা বলতে দেখে নি। কী কথা বলেন তাঁরা, কেমন করে বলেন, কী রকম ঘরে কীভাবে থাকেন, ওঠেন বসেন, দেখবার ভীষণ ইচ্ছা। এমনি একজন জলজ্যান্ত সাহিত্যিককে সামনের উপর দেখতে পাবে, মুখোমুখি বসে শুনতে পাবে তাঁর অদ্ভুত কথা (বইতে যা লেখেন তাঁরা), এত বড় সুযোগ সে ছাড়তে পারে নি। ভাবতে গিয়েই রীতিমত রোমাঞ্চ হচ্ছিল তার মনে।

বিশাখারও সঙ্গে কেউ একজন চাই যে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেবে, দুটি প্রশস্তিসূচক কথা বলবে তার সম্বন্ধে যা নিজের মুখে বলতে বাধে। সহ-সদস্যা কাউকে নিয়ে আসতে পারতেন, ভরসা করেন নি। কে জানে, সে হয় নিজেই নজরে পড়বার চেষ্টা করবে, এই সুযোগে নিজের সম্বন্ধে একটা বেটার ইম্প্রেশন নিয়ে ফিরবে ওঁর কাছ থেকে। এখানে কেউ বন্ধু নয়, কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। মঞ্জুলার কথা আলাদা। সে আর যাই করুক, বিশাখা মিত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবে না। বয়সের গুণে তাঁর চেয়ে বেশী আকর্ষণ হয়ে উঠবে? পুরুষের চোখ তো? বলা যায় না। ছাত্রীর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন বিশাখা, তারপর দৃষ্টি ফেরালেন নিজের দেহে। ওদিকে ভরা জোয়ার, এদিকে ভাঁটার টান শুরু হয়ে গেছে। একটা সান্ত্বনা, মেয়েটার রূপ নেই, সেদিক দিয়ে তিনি

ওর চেয়ে এগিয়ে আছেন। অতবড় লেখকের দৃষ্টি এখানে বিভ্রান্ত হবে বলে মনে হয় না। তবু মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। তিনি তো জানেন, লেখকই হোক আর বৈজ্ঞানিকই হোক, পুরুষের কাছে নারীর আসল রূপ তার যৌবন। এই মর্মান্তিক সত্যকে অস্বীকার করবেন কেমন করে ?

একবার ভাবলেন দরকার নেই, মঞ্জুলা থাক, তিনি একাই যাবেন।

তারপর মনে হল অলক রায় অন্য জাতের পুরুষ। তিনি 'বুদ্ধিজীবী' ইন্টেলেক্চুয়াল রাইটার। তাঁর সম্বন্ধে এসব কথা মনে করা অশোভন, এতে তাঁর উপরে অবিচার করা হবে। তিনি নিশ্চয়ই এই দুর্বলতার ঊর্ধ্বে।

তাছাড়া, নিজের দিক দিয়ে দেখতে গিয়ে বিশাখার মনে হল তাঁর এই আশঙ্কার মূলে বোধহয় একটা ডিফীটিস্ট মনোভাব কাজ করছে। হেরে যাবার ভয়। অধ্যাপিকার অভিমানে ঘা লাগল। ছাত্রীর কাছে হার মানবেন! ঐ কালো মেয়েটার কাছে পরাজয় ঘটবে বিশাখা মিত্রের!

অলক রায় থাকতেন মধ্য কলকাতায়। হ্যারিসন রোডের কাছে আঁকা-বাঁকা সরু গলির মধ্যে অনেককালের পুরনো বাড়ির দোতলায়। অন্ধকার নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। দু'খানা ঘর, সামনে একফালি ছাত। তার ওপাশটা জুড়ে গোটা কয়েক বিবর্ণ টব, ওঁর নয়, এ বাড়িতে আগে যারা ছিল তাদের ফেলে-যাওয়া সম্পত্তি। একটাতে টিম টিম করছে একটা ফণীমনসার গাছ, বাকীগুলোতেও একসময়ে ফুল-টুল লাগানো হত বোঝা যায়, এখন খালি পড়ে আছে, শুকনো ফাট-ধরা মাটিতে একগাছা ঘাস পর্যন্ত নেই।

অলকবাবুর এক প্রকাশক বন্ধু নতুন-গড়ে-ওঠা দক্ষিণ অঞ্চলে শোভন পরিবেশে একটি সুদৃশ্য ফ্ল্যাট তাঁর জন্যে সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু উনি সেটা নেন নি। কারণ যা দেখিয়েছিলেন, তার মধ্যেও তাঁর অসামান্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। বলেছিলেন, কাককে আমি তার আসল রূপেই দেখতে চাই। ময়ূরপুচ্ছ-জড়ানো নকল কাকের ওপর আমার কোন

মোহ নেই।...কলকাতায় যখন আছি, কলকাতাতেই থাকব।

বন্ধু তর্ক তুলতে পারতেন, বালিগঞ্জ কি কলকাতা নয়? বৃথা হবে বলেই তোলেন নি।

অলকবাবুর একমাত্র বাহন অর্জুন তাঁর 'দেশের' সংগ্রহ। সার্থক নাম দিয়েছিল তার বাপ-মা। সাক্ষাৎ সব্যসাচী। একার সংসার হলেও কাজ কম ছিল না। তার মধ্যে অকাজের সংখ্যাটাই বড়, তার খেয়ালী মনিব যা অনবরত সৃষ্টি করতেন। ছটি হাত সমানে চালিয়ে অর্জুন সব ঠিক রাখত, কোথাও কোন ফাঁক পড়তে দিত না।

মনিবের মত ভৃত্যেরও আমার উপর একটি স্নেহদৃষ্টি ছিল। মাঝে মাঝে দু-একটা সুখ-দুঃখের কথা বলত আমার সঙ্গে। তার কাছেই শুনছিলাম মেদিনীপুরের কোনো গ্রামে কিছু ধানজমি আছে অলকবাবুর। বাবা নেই, লোকজনের সাহায্যে মা সেগুলো দেখা-শুনো করেন এবং মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেন ছেলের জন্যে। তাতেই চলে যায় কোনোরকমে।

আমি প্রতিবাদ করলাম, কেন, বই থেকেও তো—কথাটা শেষ করতে দিল না অর্জুন। মাঝপথেই মৃদু হেসে প্রস্থান করল।

একদিন, সবে বর্ষা শুরু হয়েছে কলকাতায়, তাঁর ছোট্ট ছাতটিকে পায়চারি করতে করতে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন অলকবাবু। অর্জুন বাইরে যাচ্ছিল। তাকে ডেকে বললাম, টবগুলোকে সার-টার দিয়ে তৈরি রেখো তো অর্জুন। কাল আমি ক'টা ফুলের চারা এনে দেব।

অর্জুন তার মনিবের দিকে তাকাল। তিনি হেসে বললেন, ফুল কী হবে? ঐ তো বেশ আছে।

আমার বিস্মিত চোখের দিকে চেয়ে যোগ করলেন, ঐ শূন্য টবের শুকনো রুক্ষ মাটি, ওর মধ্যে জীবনের যে সত্য আছে, ফুল তাকে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করে। সে শুধু আবরণ, অলঙ্কার। ঐ ক্যাকটাসটা বরং মনে করিয়ে দেয় জীবনের আসল এবং চিরন্তন রূপ কী। তাই ত্থাখ না, ফুল গাছগুলো মরে গেলেও ওটা ঠিক দাঁড়িয়ে আছে।

মনে পড়ল, ওই ধরনের উক্তি বোধহয় ওঁর কোনো উপন্যাসের নায়কের মুখে শুনেছি। এইখানেই মননশীল লেখকের পরিচয়।

বিশাখা অনেক অনেক খুঁজে-পেতে বাড়িটা বের করলেন এবং অতি সন্তর্পণে শাড়ি বাঁচিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন উপরে। চিঠি লিখে তারিখ ও সময় নির্দিষ্ট করা ছিল। অলকবাবু উঠে এসে অভ্যর্থনা করে বসালেন ওদের। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিশাখার প্রথম কথা হল,—এইখানে থাকেন আপনি! বলা বাহুল্য, তার মধ্যে একটি গভীর বিস্ময়ের সুর। উত্তরে শুধু একটু হাসলেন অলকবাবু। এর পরেও আবার যখন বাড়ির কথাই তুললেন বিশাখা, তার সঙ্গে এই পুরনো, ঘিঞ্জি অঞ্চল, এই সরু রাস্তা, এই পরিবেশ— অলকবাবু বললেন, মাপ করবেন, আপনি কি আমার বাসস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ?

বিশাখা একটু অপ্রস্তুত হলেও আশ্চর্য হলেন না। এই জাতীয় রূঢ় উক্তিই যেন এঁর মুখে মানায়। সাধারণ মানুষের মত অলক রায় দুটি মহিলার সামনে বিনয়ে বিগলিত হয়ে যাবেন, এটা আশা করা যায় না।

মঞ্জুলার ভূমিকা ছিল সামান্য একটু মুখবন্ধ, বিশাখা মিত্র ব্যক্তিটি কে এবং কী সেই সম্বন্ধে দু-একটি কথা, যার সূত্র ধরে তিনি খানিকটা আত্মবিস্তার করতে পারেন। সেই ইঙ্গিত করলেন ছাত্রীকে প্রথমে চোখ টিপে, তারপর তার হাতেও একটু চাপ দিলেন। কিন্তু অতবড একজন সাহিত্যিকের (শুধু নামে নয়, আকারেও) অত কাছে বসে মঞ্জুলার মাথার ভিতরে সাজানো কথাগুলো সব ওলট-পালট হয়ে গেল। কয়েকবার ঢোঁক গিলেও তাদের বাইরে আসা হল না। অগত্যা বিশাখাই ছাত্রীর কাজ সংক্ষেপে সেরে নিয়ে তাঁর প্রস্তাব পেশ করলেন। অলকবাবু কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, আপনারা কি আমার বই পড়েন ?

প্রশ্নটা শুনেই হঠাৎ হকচকিয়ে গেলেন বিশাখা। প্রশ্নের সঙ্গে দুটি ক্ষুদ্র চক্ষু থেকে যে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ধারালো ছুরির ফলার মত তাঁর মুখে

এসে পড়ল, বিশেষ করে সেই দিকে চেয়ে মিথ্যা কথাটা বলতে পারলেন না, আমতা আমতা করে বললেন, দেখুন, সত্যি কথা বলতে কি এখনো ভালো করে পড়বার সুযোগ করে উঠতে পারি নি। আপনার বই তো যখন তখন যেমন তেমন করে পড়া যায় না। তার জন্যে একটা মানসিক প্রস্তুতি দরকার। সেটি কিছুটা সংগ্রহ করতে পেরেছি, সম্প্রতি একটি রিভিউ পড়ে।

'রিভিউ'টি পড়ে তাঁর কি মনে হয়েছিল যখন জানালেন, অলকবাবুর মনে পড়ল ঠিক এই কথাগুলোই তিনি কিছুদিন আগে শুনেছেন। যে বন্ধুটির থেকে শুনেছেন তার নামটাও বেরিয়ে পড়ল। বোঝা গেল এই 'মহিলাটি'র কথাই বলেছিলেন তিনি।

অলক রায় এবার পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন তাঁর অতিথির দিকে। তার মধ্যে প্রসন্নতার আভাস। এ রকম একজন বিদগ্ধ পাঠিকাও অকপটে স্বীকার করেছেন তাঁর রচনা সহজপাঠ্য নয়, যেমন তেমন করে পড়া যায় না, তাই অন্যের আলোচনার আলোকে তাকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছেন। তার মধ্যে একটি গভীর নিষ্ঠার পরিচয় আছে।

বিশাখার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন অলকবাবু। তারপর মঞ্জুলার দিকে ফিরে হাসিমুখে বললেন, তুমি তো কিছুই বললে না?

উত্তরটা বিশাখাই দিলেন, ও আমার ছাত্রী, আপনাকে দেখতে এসেছে। অর্থাৎ, ওর আর বলবার কী থাকতে পারে? কিন্তু মঞ্জুলারও কিছু বলবার ছিল, এবং বলে ফেলল—আচ্ছা, আপনার বই সিনেমা হয় না?

সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রীকে ধমকে উঠলেন বিশাখা, কী বলছ যা-তা!

অলকবাবু কিছু বললেন না। সিগারেট টানছিলেন, টানতে লাগলেন এবং সেই সঙ্গে শুধু একবার হাসলেন। সস্নেহ প্রশ্রয়ের হাসি। অর্থাৎ, ছেলেমানুষ; বলছে, বলুক। এরা তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত নয়। এদের জন্যে তো তিনি লেখেন না।

দুই

বিশাখা মিত্র যেদিন বিশাখা রায় বলে কলেজের মাইনের খাতায় সই করলেন এবং খবরটা নানা মহলে ছড়িয়ে পড়ল, তা নিয়ে অনেকে অনেক গবেষণা করেছিল। কারো মতে এটা পিওর অ্যাণ্ড সিম্পল লাফ অ্যাফেয়ার যা কোনো বয়সের সীমারেখা মেনে চলে না, বারো থেকে বাহান্ন সকলের জীবনেই আসতে পারে। কেউ বলেছিল, সমস্ত ব্যাপারটাই আগাগোড়া প্ল্যান্‌ড্‌ অ্যাফেয়ার। দু-পক্ষই ভেবে-চিন্তে, সব দিক হিসাব-নিকাশ করে ম্যারেজ-রেজিস্টারে সই দিয়েছে। উভয় তরফেই লাভ (বাংলা শব্দ), বিশাখার দিকে স্থূলের চেয়ে সূক্ষ্মের অংশ বেশী, অলক রায়ের ঠিক উল্‌টো, বেশির ভাগই স্থূল, যাকে বলে মেটিরিয়াল গেন।

আমি এর কোনো দলেই নই। যা ঘটল তাই নিয়ে আমার কারবার, তার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নিয়ে কোনো মাথাবাথা ছিল না। আমি দেখলাম অলক রায়ের প্রতিভা বিকাশের একটা পথ খুলে গেল। বিশাখার মত তাঁর সাহিত্যের একজন মননশীলা অনুরাগিনী সঙ্গিনী হয়ে এলেন তাঁর জীবনে। এ সাহচর্য তাঁর সৃষ্টির সহায়ক হবে।

অর্জুন খুব খুশী। তার কারণ আলাদা। কিছুকাল আগে অলকবাবুর মা মারা গেছেন। তারপর থেকেই তাঁর ধানজমিতে অজন্মা শুরু হয়েছে, বরাদ্দ অর্থের অঙ্কটা দ্রুত নেমে আসছে। এদিকে বই-পাড়া থেকে যে 'বাবুরা' আসত, তারাও বেশ কিছুদিন এ দিকটা আর মাড়ায় না। মনিবের সিগারের খরচ বেড়ে গিয়েছিল। ইদানীং কলমের বদলে এটাই বেশী দেখা যাচ্ছিল তাঁর হাতে। ভাবনায় পড়েছিল অর্জুন। 'দিদিমণি' এসে সংসারের হাল ফিরিয়ে দিলেন। বিয়ের কিছুদিন পরেই 'আদি ও অকৃত্রিম উত্তর কলকাতার' বনেদী পাড়া অর্বাচীন দক্ষিণের হঠাৎ কেঁপে-

ওঠা চকমকে অঞ্চলে চটকদার ফ্ল্যাটে এসে উঠলেন অলক রায়। স্বেচ্ছায় বা খুশী মনে যে আসেন নি, তাঁকে জিজ্ঞাসা না-করেও বলা যায়। আমি তো তাঁর মন জানি। একদিন কোনো একটা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, একটা পাখির কাছে বাসা আর খাঁচায় যে তফাৎ, আমার কাছে এই বাড়িটা আর তোমাদের ঐ সব ফ্ল্যাটে সেই তফাৎ। এখানে বসে আমার মন স্বচ্ছন্দে ডানা মেলতে পারে, ওখানে গেলে মনে হয় কে যেন আমাকে ধরে-বেঁধে বন্দী করে রেখেছে।

সেই খাঁচাতেই এসে উঠতে হল। বিশাখা বললেন, লেখার জন্যে সকলের আগে চাই মনোমত পরিবেশ, তোমার সেই অন্ধকূপের চেয়ে এই খোলামেলা, আলো-হাওয়া ভালো লাগছে না?

অলক রায় মাথা নাড়লেন, অর্থাৎ লাগছে। বললেন না, সকলের মন সমান নয়, সকলের সব জিনিস ভালো লাগে না। বলবার উপায় ছিল না। বিশাখার কলেজ এই দিকে। হ্যারিসন রোড থেকে বাস-এ ঝুলতে ঝুলতে আসা চলে না। তাছাড়া মাস মাস কয়েকটা টাকাও বেঁচে গেল। বর্তমানে সে সাশ্রয়টুকুর দাম অনেক।

বিশাখার বন্ধুদের মধ্যে তাঁর বিদগ্ধ পাঠক-সমাজের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পেলেন অলকবাবু। অভ্যর্থনার অভাব হল না। সৌজন্য, শালীনতার সঙ্গে শ্রদ্ধাও পেলেন। কিন্তু এই প্রথম টের পেলেন শ্রদ্ধাটা অনেক ক্ষেত্রেই নিরালম্ব। তার পিছনে তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে অবগতি অতি সামান্য। অর্থাৎ,—'আসুন, আমার কত বড় সৌভাগ্য যে আপনার মত অতবড় সাহিত্যিকের পায়ের ধুলো পড়ল আমার বাড়ি। কী চমৎকার যে লেখেন আপনি! তবে জানেন, কাজকর্ম নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে হয়, পড়ি নি বিশেষ কিছু।'

আরেকটা সত্য উপলব্ধি করলেন অলকবাবু। এ সমাজে অন্যান্য বহু ফ্যাশনের মত 'অলক রায়'ও একটা ফ্যাশন। সে-সব ফ্যাশন যারা যোগায়, যেমন শাড়ি-জুয়েলারি-ঘড়ি-ফার্নিচারের দোকানদার,

তাদের উপর এঁদের যেমন একটি পেট্রন-সুলভ অনুকম্পা আছে, অলক রায় নামক ব্যক্তিটির প্রতিও সেই মনোভাব। যাকে তিনি 'শ্রদ্ধা' মনে করে গোড়াতে পুলকিত হয়ে উঠেছিলেন, সেটা আসলে তারই মুখোশ-পরা মনোরম রূপ। অনেকটা যেন দামী ও মোলায়েম দস্তানাপরা হাতের পিঠ চাপড়ানো।

এবার অনেকদিন পরে গেলাম তাঁর নতুন ফ্ল্যাটে। বিশাখা ছিলেন না। এর আগে যখনই গিয়েছি, লক্ষ্য করেছি নিজের মধ্যেই যেন নিমগ্ন হয়ে আছেন অলকবাবু। যে স্নিগ্ধ হাসিটি আমাকে সস্নেহ আহ্বান জানাত, তার মধ্যেও একটি নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্তির আভাস পেতাম। এই প্রথম দেখলাম, অলক রায়ের মুখে চিন্তার ছায়া। শোকের চিন্তা নয়, সেটা আমি চিনি। এর জাত আলাদা। বেশী কথা হল না। তার মধ্যে একটি যা শুনলাম তাঁর কাছ থেকে একবারে নতুন এবং অপ্রত্যাশিত।

কি সূত্রে যেন এমন একজন লেখকের কথা এসে পড়েছিল, যিনি সাধারণ পাঠকের চাহিদা বুঝে লেখেন। তাঁর সম্বন্ধে আমি 'জনপ্রিয়' শব্দটা ব্যবহার করেছিলাম, এবং বোধহয় কিছুটা ব্যঙ্গের সুরে। অলকবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, বহুজনের চাহিদা মেটাতে পারলেই জনপ্রিয় হওয়া যায় না। তার জন্যে জনমানসের গভীরে ঢুকবার চাবিটি আয়ত্ত করতে হবে।

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। এই কিছুদিন আগে 'জন' শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়েও তাঁর চোখে-মুখে অবজ্ঞার চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখেছি। স্পষ্টভাষায় বলতে শুনেছি, শক্তিমান লেখকের পক্ষে সবচেয়ে বড় বিপদ জনপ্রিয়তার প্রলোভন। ঐ খপ্পরে একবার যে পড়েছে তার আর রক্ষে নেই। সে গেল।

আর আজ এ কী শুনছি!

কিছুক্ষণ চুপ করে দূরে মাঠের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বললেন, লেখক তাঁর সৃষ্টির ভিতরে যে আনন্দ পায়, সেটা অনেকটা খোলা

পাত্রে রাখা কর্পূরের মত। বড় তাড়াতাড়ি উবে যায়। তাকে টিকিয়ে রাখতে হলে উপরে একটায় আচ্ছাদন দরকার। সেই আচ্ছাদন হল পাঠকের স্বীকৃতি।

মনে পড়ল একদিন ঠিক এর উলটো কথাই শুনেছিলাম ওঁর মুখে। 'সৃষ্টির আনন্দই লেখকের মন ভরে রাখে। পাঠক সেটা নিল কিনা, কিংবা কিভাবে নিল সে সম্বন্ধে তিনি উদাসীন, ইন্‌ডিফারেণ্ট।'

আমি নিজে থেকেই মাঝে মাঝে গিয়ে বসতাম তাঁর কাছে। তিনি কখনো আমাকে ডেকে পাঠান নি। একদিন পাঠালেন। যেতেই একটি অতি-সাধারণ কিন্তু বহুল-প্রচারিত মাসিকপত্রের নাম করে বললেন, ওদের তুমি চেনো?

বললাম, চিনি। বুঝতে পারলাম না, ঐ কাগজটা সম্বন্ধে তিনি হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন কেন। নামে সাহিত্য-পত্রিকা কিন্তু আসলে পাঁচমিশেলী। না আছে এমন বস্তু নেই—সিনেমা থেকে খেলার মাঠ, উলকাঁটা থেকে রান্নাঘর, বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে রঙ্গমঞ্চ এবং আরো অনেক কিছু, যার সঙ্গে সাহিত্যের দূরতম সম্পর্কও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সেই বহুবিধ পণ্যের ফাঁকে ফাঁকে সসঙ্কোচে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে একটি দুটি গল্প, দু-একখানা উপন্যাস, কোনো একটা চলতি বিষয় নিয়ে দুপাতা হালকা সুরের প্রবন্ধ, ওদের ভাষায় যার নাম রম্য-রচনা। সেই অংশটুকুর স্ট্যাণ্ডার্ড বা মান এমন স্তরের এবং বিষয়-বস্তু ও সাজ-সজ্জাদি এমন জাতের, যাতে করে পত্রিকাটি তার সুপুষ্ট দেহ নিয়ে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই স্টল থেকে অদৃশ্য হতে পারে। হয়ও তাই। সাধারণ, স্বল্পশিক্ষিত বহু মেয়ে-পুরুষের হাতে হাতে ঘুরতে ঘুরতে শীর্ণ কলেবর 'শিশি-বোতল-কাগজ বিক্রী'র ঝোলায় গিয়ে ওঠে।

শিক্ষাভিমানী, বুদ্ধিজীবি, মানসিক আভিজাত্য গর্বিত উচ্চস্তরের

এলাকায় তার প্রবেশ নিষেধ।

সেই কাগজের খবরে অলক রায়ের কী প্রয়োজন থাকতে পারে?

প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই তিনি বললেন, ওর সম্পাদক, কি নাম যেন, তাকে একবার গিয়ে বলো, আমি রাজী আছি।

বিশাখা ঘরের ভিতরে কি করছিলেন। ছিট্‌কে বেরিয়ে এসে বললেন, সে কী!

ঐ কাগজে লিখবে তুমি!

আমারও ঐ একই জিজ্ঞাসা এবং বিশাখা দেবীর কণ্ঠে যে গভীর বিস্ময় ফুটে উঠল, আমিও তার সমান অংশীদার। না; আমার বিস্ময় আরো বেশি। আমি জানি, (বিশাখা তখনো আসেন নি,) ঐ কাগজের সম্পাদক একবার গিয়ে হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছিল অলক রায়ের বেনেটোলার বাড়িতে। প্রার্থনা ছিল—যে-কোনো বিষয়ে ছোটখাটো একটা লেখা। বিগলিত কণ্ঠে বলেছিল, 'বেশী কিছু চাই না, স্যার। শুধু আপনার নামটা।' ভদ্রলোকের উদ্দেশ্যটা ছিল নিছক ব্যবসায়িক। অর্থাৎ, জাতে ওঠা; অলক রায়ের যে পাঠক-সমাজ, ওর কাগজের কাছে যেটা অগম্য, ঐ নামের জোরে সেখানে একটু স্থান-সংগ্রহের চেষ্টা।

অলকবাবুর যা নিয়ম, শুধু একটু হেসেছিলেন। 'না' কথাটা তিনি কখনো মুখে উচ্চারণ করেন না, ওটা থাকে ঐ বিশেষ ধরনের হাসির মধ্যে। সেদিন তার মধ্যে 'না'-এর সঙ্গে আরো কিছু কিছু ছিল। ঐ সম্পাদকের উপর এক ধরনের করুণা—লোকটা কি নির্বোধ! কার কাছে কী চাইতে এসেছে!

খবরটা আমি জানতাম। তাই শুধু বিস্মিত নয়, একেবারে থ হয়ে গেলাম।

ব্যাপারটা আরো দুর্বোধ্য মনে হল এই কারণে যে, সেদিন ওঁর পকেট ছিল একেবারে শূন্য। মা মারা গেছেন। দেশ থেকে কিছুই আসছে না, প্রকাশকরা হাত গুটিয়ে বসে আছে, অর্জুন কোনোরকমে

দুটো ডাল-ভাতের যোগাড় করতে পারছে, তাও হয়তো আর বেশিদিন পারবে না। এদিকে সেই সম্পাদক মোটা টাকার চেক্ নিয়ে জোড়হাতে সামনে বসে।

সে তুলনায় আজ তাঁর অবস্থা অনেক স্বচ্ছল। বিশাখা দেবীর রোজগার ভাল। কিছুদিন আগেই ওঁর একখানা প্রবন্ধের বইয়ের জন্য এক নতুন প্রকাশক কিছু টাকা গছিয়ে গেছে। দেশের জমি-জমারও একটা বিলি-ব্যবস্থা হয়ে গেছে। বিশাখাই গিয়ে করে এসেছেন। নিয়মিত মাসোহারা শুরু হয়েছে আবার। অর্জুনের মুখে হাসি। চারিদিকে বেশ একটা স্বাচ্ছন্দ্যের শ্রী, কোথাও কোনো মালিন্যের চিহ্নমাত্র নেই।

অলকবাবু স্ত্রীর কথার কোনো উত্তর দিলেন না। কিন্তু ওষ্ঠপ্রান্তে যে হাসিটা ফুটে উঠল, তার অর্থ আমাদের দুজনের কারো কাছেই অস্পষ্ট রইল না। অর্থাৎ, হ্যাঁ, ঐ কাগজেই লিখবেন বলে স্থির করেছেন।

বিশাখা দেবী এবার হতাশভাবে আমার দিকে ফিরে বললেন, আচ্ছা, আপনিই বলুন তো মলয়বাবু, ওঁর পক্ষে ঐ কাগজটায় লিখতে যাওয়ার কোনো মানে হয়? কী দরকার এমন করে জাত খোয়াবার?

আমি যোগ করলাম, তাছাড়া, আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না, কী লিখবেন উনি ওখানে।

দেখি কী লিখি, তেমনি হাসিমুখে জবাব দিলেন অলকবাবু, যে লোকটা বরাবর সানাই বাজিয়ে এসেছে, চেষ্টা করলে সে হয়তো বাঁশের বাঁশীও বাজাতে পারে।

স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, তুমি জাত খোয়াবার কথা বলছিলে বিশাখা। আজ সত্যিই মনে হচ্ছে, কী হবে এই জাত দিয়ে। এতকাল ধরে যা লিখেছি সবই তো আভিজাত্যের শুকনো অভিমান নিয়ে তোমাদের ঐ 'মেহগিনির মঞ্চ জুড়ি' বসে রইল। এবার না হয় এমন কিছু লিখি যা একটু চলে ফিরে বেড়াতে পারে। তার বেড়াবার জায়গাগুলো যদি একটু নীচু স্তরের হয়, তাতেই বা ক্ষতি কী?

'নীচু স্তর' কথাটা কানে যেতেই বিশাখা দেবীর কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল। তার মধ্যে ঘৃণা যতখানি তার চেয়ে বেশী বোধহয় স্বামীর জন্যে বেদনাবোধ। অলকবাবু সেটা লক্ষ্য করে কৌতুকের সুরে বললেন, এই যেমন ধর কোনো মেস্-এর বাবুদের কেরোসিন কাঠের টেবিল অথবা একশো টাকা মাইনের স্কুল-মাস্টারের একমাত্র শোবার ঘরের ছেঁড়া মাদুর কিংবা বারান্দায় পাতা ন্যাড়া তক্তপোষ। তার বৌয়ের বালিসের তলাও হতে পারে। তখন তার চেহারাটা নিশ্চয়ই সভ্য-ভব্য থাকবে না। কি বল?

এ প্রশ্নটা আমার প্রতি। তার সঙ্গে যোগ করলেন, 'যথাস্থান'-এর সেই লাইন দুটো মনে আছে তোমার?···'কাজল আঁকা, সিঁদুর মাখা, চুলের গন্ধ ভরা—।'

বলতে বলতে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন।

অতিরথ ও পিঙ্গলা

সুবোধ ঘোষ

নৃপতি অতিরথের প্রাসাদে নৃত্যসভা। কাঞ্চনময় মঞ্চের উপরে বসেছিলেন অতিরথ। তাঁর এই রাজসিক উচ্চতার মর্যাদা রক্ষা করে মাণ্ডলিকবর্গ বসেছিলেন নীচে, হর্ম্যতলে উপরে রাঙ্কবে আবৃত এক-একটি দারু-বেদিকার উপর। নৃপতি ও মাণ্ডলিকের মর্যাদার ব্যবধান অনুসারে উভয়ের আসনের মধ্যে যতখানি ব্যবধান থাকা উচিত, তাও ছিল। নৃপতি অতিরথের কাঞ্চনময় মঞ্চাসন থেকে কিঞ্চিৎ দূরে বসেছিলেন মাণ্ডলিকের দল। উভয়ের মাঝখানে শূন্য হর্ম্যতলের অনেকখানি স্থান জুড়ে নৃত্যস্থলী, পুষ্পের বলয় দিয়ে পরিবেষ্টিত। রাজধানীর শ্রেষ্ঠ রূপসী ও কলাবতী বারাঙ্গনারা এসে নৃত্যগীতে প্রতি সন্ধ্যায় অতিরথের প্রাসাদে উৎসব প্রমোদিত করে চলে যায়।

কুমার নৃপতি অতিরথ, তরুণ দেবদারুর মতোই যৌবনাঢ্য মূর্তি। অসাধারণ রূপবান। অতিরথের নেত্রভঙ্গীতে কেমন একটা অসাধারণত্ব আছে। যেন কোন এক উর্ধ্বলোক হতে তিনি অধঃপতিত মানব-সংসারের দিকে তাকিয়ে আছেন। তুচ্ছ করেন, ঘৃণা করেন এবং জোর কখনো বা করুণা করেন চতুর্দিকের এই রূপরসগন্ধ-স্পর্শকাতর মানুষগুলির দুর্বল জীবনের যত লোভ, আশা আর উল্লাসগুলিকে। কত সহজে এরা মুগ্ধ হয়, কত তুচ্ছের উপর এরা প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে।

মুনিজনসুলভ বৈরাগ্যময় জীবনের অন্য কোন আগ্রহ নেই নৃপতি অতিরথের মনে। উৎসবপরায়ণ, মৃগয়াপ্রিয়, রণোৎসুক নৃপতি অতিরথ। প্রেম প্রণয় ও অনুরাগের এই পৃথিবীর মাঝখানেই তিনি আছেন, অথচ এ-জগতের কোন তৃষ্ণা যেন তাঁর হৃদয় স্পর্শ করতে পারে না, এমনি এক দুর্ভেদ্য বর্মে তিনি তাঁর হৃদয়বৃত্তি আচ্ছাদিত করে রেখেছেন।

এই কাঞ্চনময় মঞ্চের উপর সমাসীন থেকে নৃপতি অতিরথ অবিচলিত

নেত্রে কতবার নৃত্যে ও গীতে বিলাসিত সান্ধ্য উৎসবের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করেছেন, নৃত্যপরা বারবিলাসিনীর তাণ্ডবিত ভ্রূলতা মথিত করেছে কত বৃদ্ধ মাণ্ডলিকের সম্বিৎ। কেউ কণ্ঠ হতে গন্ধ-পুষ্পের মালিকা তুলে নিয়ে নর্তকীর মঞ্জীরিত পায়ের উপর নিক্ষেপ করেছে। চঞ্চলবিলোচনা বারসুন্দরীর কুটিল ওষ্ঠসন্ধি হতে বিচ্ছুরিত এক-একটি মদহাস্যের বিভ্রমে আত্মহারা হয়ে কেউ উষ্ণীষ হতে ভূষণরত্ন চয়ন ক'রে অঞ্জলিপুটে তুলে ধরেছে, উপহার দেবার জন্য। গীতপটীয়সী সালভঞ্জিকার কবরীচ্যুত কুসুমকোরকে ব্যগ্র বাহু প্রসারিত করে তুলে নিয়ে উষ্ণীষে ধারণ করেছেন কোন যুবক মাণ্ডলিক। দেখে বিস্মিত হয়েছেন অতিরথ, কত সহজ এবং কত সামান্য লোভনীয়ের জন্য এরা এমন করে নিজেকে বিলিয়ে দেয়।

নৃত্যসভার চারদিকে বিবিধ ধাতব আধারে শিলারস পোড়ে, হেমদণ্ডের শীর্ষে খরদ্যুতি দীপিকা জ্বলে, পরিব্যাপ্ত পুষ্পস্তবক হইতে উত্থিত পরিমলে বায়ু বিহ্বল হয়। আজ এই সন্ধ্যার উৎসব প্রমোদিত করবে বারাঙ্গনা পিঙ্গলা। মাণ্ডলিকেরা প্রতীক্ষাকুলচিত্তে নিঃশব্দে বসেছিলেন। পিঙ্গলা এখনো আসে নি।

অতিরথের চিত্তে কোন প্রতীক্ষা নেই, আগ্রহ নেই, আকুলতা নেই। তিনি যেন অনেক উচ্চে ও অনেক দূরে নিজেকে সরিয়ে রেখে নিত্যদিনের একটা নিয়মিত রাজকার্য মাত্র পালন করার জন্য বসে আছেন।

রাজ্যের সকলেই বিশ্বাস করেন, নৃপতি অতিরথ সত্যই অসাধারণ। অরণ্যে নয়, বৃক্ষকোটরে নয়, গিরিগুহাতে নয়, প্রেমপ্রণয়ে বিচলিতচিত্ত এই সংসারের মধ্যে থেকেও এবং বিপুল রূপরত্ন রাজ্য ও যৌবনের অধিকারী হয়েও নৃপতি অতিরথ অবিচলিত রয়েছেন। মাণ্ডলিকেরা নৃপতি অতিরথের সম্মুখেই স্তোকবচনে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে—বনবাসী ও বায়ুপায়ী কৃচ্ছ্রতপা মুনিজনের বৈরাগ্যের চেয়েও নৃপতি অতিরথের এই নির্লেপ কত বেশী মহৎ।

পৃথিবীর কামনাগুলির নিকটেই থাকেন নৃপতি অতিরথ, কিন্তু মন

তাঁর দূরেই থাকে। কত রাজতনয়ার স্বয়ংবর-সভায় যাবার জন্য আমন্ত্রণ আসে। সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন না অতিরথ। কিন্তু বরমাল্য-প্রয়াসী হয়ে নয়, দর্শক অতিথিরূপে তিনি রাজকুমারীদের স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত থাকেন। নিজেকে এর চেয়ে বেশী দুর্বল ও সাধারণ করে ফেলতে পারেন না তিনি।

স্বয়ংবর-সভায় এসে শুধু দর্শকের মতোই তিনি তাকিয়ে দেখেন, পুষ্পমাল্য হাতে নিয়ে রূপরম্যা রাজকুমারী তাঁর সম্মুখে এসে চমকিত চিত্তের আগ্রহ রোধ করতে গিয়ে একেবারে থমকে দাঁড়ায়। আয়তাক্ষী কুমারীর কম্র দৃষ্টি পিপাসাতুর হয়ে ওঠে। ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘশ্বাস ক্ষণিকের মতো কুমারীর বক্ষঃবাস কম্পিত করে আবার গোপনে মিলিয়ে যায়। স্পৃহাহীন দুই চক্ষু তুলে দেখতে থাকেন অতিরথ। রাজকুমারীর মনে হয়, যেন এক পাষাণের বিগ্রহ তার সম্মুখে রয়েছে, সুকঠিন ও বেদনাহীন। স্পন্দিত হস্তে পুষ্পমাল্য ধারণ করে স্বয়ংবরা রাজপুত্রী ভিন্নপথে সরে গিয়ে বিষণ্নমুখে ও অলস পদক্ষেপে অন্যান্য পাণিপ্রার্থী রাজকুমারদের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়।

আজ পর্যন্ত কোন নারীর কাছে আত্মদানের আগ্রহ অনুভব করেন নি নৃপতি অতিরথ। ইচ্ছা করে না, এত সহজে এত সাধারণের মতো হয়ে যেতে। তার চেয়ে এই ভাল। বরং আনন্দ আছে, অনুপম রূপে ও যৌবনে ভূষিত তাঁর পৌরুষের শ্লাঘা নিয়ে কামনার পুত্তলিকা এই দুর্বল মূর্তিগুলির দুই চক্ষুর আবেদন তুচ্ছ করতে, শৈলভূমির দেবদারু যেমন স্পর্ধিতশিরে তার পদপ্রান্তবাহিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর দিকে শুধু তাকিয়ে থাকে। আনন্দ আছে এই সব বিম্বাধরের অভিমানগুলিকে তুচ্ছ করতে, কজ্জলিত চক্ষুর পিপাসাগুলিকে অমান্য করতে, স্মরমদাতুর ভ্রূবল্লরীর ভঙ্গিমাগুলিকে মনে মনে উপহাস করতে। তাঁর সব আকাঙ্ক্ষা আর হৃদয়বৃত্তিগুলিকেও যেন একটা দেবত্বের গর্বে গঠিত ক'রে নিয়ে তিনি অত্যুচ্চ এক কাঞ্চনমঞ্চে পাষাণ-বিগ্রহের মতো স্থাপিত করে রেখেছেন। পৃথিবীর কোন নারীকে বন্দনা করার জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা সেই গর্বের

উর্ধ্বলোক হতে নেমে আসতে রাজি নয়। রূপাতিশালী কুমার অতিরথ কোন নারীর রূপের কাছে উপাসকের মতো এসে দাঁড়াতে পারেন না।

শুধু কল্পনা করতে ভাল লাগে, পৃথিবীর কোন এক নারী দূরান্তের এক নিভৃত হতে তাঁর এই যৌবনধন্য জীবনের সকল কামনাকে প্রতি মুহূর্তের চিন্তায় ও স্বপ্নে আহ্বান করছে, তপস্বিনী যেমন তার সকল সংকল্প উৎসর্গ করে অহরহ দেবতার সান্নিধ্য প্রার্থনা করে। সে নারীর কাছে জগৎ মিথ্যা হয়ে গিয়েছে, সত্য শুধু নৃপতি অতিরথের প্রেম।

কিন্তু এমন নারী কি আছে? না থাকে, তবু এমনই এক অসাধারণী প্রেম-তাপসিকার মূর্তিকে কল্পনায় দেখতে ইচ্ছা করে, আর ভাল লাগে নিজেকে দেবতার মতোই দুষ্প্রাপ্য ও দুরারাধ্য করে রাখতে।

অকস্মাৎ নূপুরনিক্বণের আঘাতে চমকিত হয়ে ওঠে নৃত্যসভাতল। বারাঙ্গনা পিঙ্গলা প্রবেশ করে।

বিলোলহারাবলীললিত পীনোন্নত বক্ষ, হরিচন্দনবিরচিত চিত্রকে চর্চিত চিবুক, কুন্দাভ স্মিতচন্দ্রিকার মতো হাসি, সিন্ধুজল-বিধৌত রক্তপ্রবালের মতো অধরদ্যুতি, স্তোকোৎফুল্ল কোকনদোপম সুকোমল পদতল, সুধাসারসিতা গ্রীবা, রূপোজীবা পিঙ্গলা তার কস্তুরিকাবাসিত চীনাম্বর আন্দোলিত করে, স্তবকিত চিবুকের মৌক্তিক জালিকা চঞ্চলিত ক'রে আর মণিময় রত্নাভরণ শিঞ্জিত ক'রে পুষ্পবলয়ে চিহ্নিত নৃত্যস্থলীর মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।

সভাস্থলের আর-এক প্রান্তে-উপবিষ্ট বাদকবর্গের ক্রোড়ে সুষুপ্ত এবং নীরব স্বরযন্ত্র অকস্মাৎ জাগ্রত ও মুখর হয়ে ওঠে। বীণা, বিপঞ্চী, মৃদঙ্গ ও মন্দিরা। মাণ্ডলিকবর্গ উৎসুক ও উৎকণ্ঠ হয়ে ওঠেন। কিন্তু দেখা যায়, উল্লাসলিপ্সু এই উৎসবস্থলীর সকল চঞ্চলতার মধ্যে অচঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরী পিঙ্গলা, এবং সুকঠিন পাষাণ-বিগ্রহের মতো অবিচল মূর্তি নিয়ে কাঞ্চনমঞ্চে সমাসীন হয়ে রয়েছেন নৃপতি অতিরথ।

পিঙ্গলার দুই চক্ষুর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল কুমার নৃপতি অতিরথের মুখের দিকে, প্রস্ফুট পুষ্পকোরকের দিকে আসবলুব্ধ মধুপের মতো।

পরক্ষণে, নৃত্যস্থলীর পুষ্পবলয় অতিক্রম ক'রে মদাবেশমন্থরা মৃদুলগতি মরালীর মতো ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে নৃপতি অতিরথের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ায় পিঙ্গলা। অতিরথ বিস্মিতভাবে অপাঙ্গে দৃষ্টিক্ষেপ করেন এবং দূরে উপবিষ্ট মাণ্ডলিকবর্গ অনুমান করেন, রাজপদে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যই রাজধানীর গণিকাগ্রগণ্য পিঙ্গলা রাজাসনের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

নৃপতি অতিরথ অপ্রসন্নভাবে বলেন,—রাজাদেশ বিনা রাজসন্নিকটে আসা উচিত নয় তোমার বারাঙ্গনা।

—রাজসভায় যখন আমন্ত্রণ করেছেন, রাজসন্নিধানে এসে দাঁড়াবার অনুমতি দান করুন নৃপতি।

—তোমার উদ্দেশ্য না শুনে অনুমতি দিতে পারি না।

—আমার দর্শনীয়কে দেখতে চাই, আমার বক্তব্যকে বলতে চাই।

—কি তোমার দর্শনীয়?

—আপনার ঐ নবারুণোপম সুন্দরপ্রভ মুখমণ্ডলের লাবণ্য মহিমা। আজ আমার নয়নকান্তের সেই মুখ নয়নের সন্নিকটে রেখে দেখতে চাই, যে মুখ এতদিন ধরে শুধু দূর হতে দেখেছি। নৃপতি অতিরথ, আমি আপনারই প্রণয়াকাঙ্ক্ষী এক নারী, যে নারী অভিশপ্তা রসাতলবধূর মতো আপনার জগৎ থেকে অনেক দূরে পড়ে আছে, বাঞ্ছিতের সানুগ্রহ আমন্ত্রণ না পেলে যে নারীর কোন অধিকার নেই বাঞ্ছিতজনের সন্নিকটে যাবার, শত অনুরাগের পরাগপুঞ্জে যতই পরিমলবিধুর হয়ে উঠুক না কেন সে নারীর চিত্তোপবনের নিভৃতলীন কামনার কুসুমকোরকনিকর। আমার দুই চক্ষের সকল কৌতূহলের উপাসনা হয়ে আছেন আপনি। বাতায়নপথ হতে দেখেছি আপনার অশ্বারূঢ় বীরমূর্তি, অরাতিদমনে ধাবমান সৈন্যঘটার সম্মুখে আপনি চলেছেন অগ্রনায়ক হয়ে। ইচ্ছা করেছে, সহচরী হয়ে আপনার তূণীর বহন করি। দেখেছি, আপনি রথারূঢ় হয়ে রাজপথ দিয়ে গিয়েছেন ইন্দ্রোৎসবের অনুষ্ঠানে। ইচ্ছা হয়েছে, এই কণ্ঠের সুরভিত মাল্যদাম আপনার ক্রোড়ে নিক্ষেপ করি। দেখেছি, পথে পথে আপনার দানযাত্রার সমারোহ, প্রার্থিতজনতার হাতে অকাতরে রত্ন-বস্ত্র-শস্য দান

করে চলেছেন আপনি। ইচ্ছা করেছে, ছুটে গিয়ে আপনার সম্মুখে দাঁড়াই প্রার্থিনীর মতো, আর নিবেদন করি—প্রণয়দানে কৃতার্থ করো হে কঞ্জকান্তি কুমার, আর কিছু চাই না।

নৃপতি অতিরথ বলেন—শুনে সুখী হ'লাম বারাঙ্গনা।

পিঙ্গলা বলে—রাজ্যাধিপতি অতিরথের কাছে একটি সামান্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে চাই।

অতিরথ—বল।

পিঙ্গলা—আজ আমাকে আর নৃত্যে-গীতে এই সভাস্থলের উৎসব প্রমোদিত করতে বলবেন না নৃপতি।

অতিরথ ভ্রূকুটি করেন—কেন?

পিঙ্গলা—আজ মন চায়, দরদলিত জলনলিনীর মতো আমার এই সতৃষ্ণ অক্ষিদ্বয় বিকশিত করে আপনার মুখময়ূখবিম্ব শুধু পান করি। আজ শুধু ইচ্ছা করি, আপনার ঐ অসিসঙ্গকঠিন বাহুযুগল পিঙ্গলার গ্রীবাসঙ্গমাধুরী পান ক'রে প্রসূনের মতো পরমকমনীয় হয়ে যাক্।

আবার ভ্রূকুটি করেন অতিরথ—প্রগল্‌ভা পণাঙ্গনা, তুমি নিতান্তই দুঃসাহসিনী।

পিঙ্গলা—আমি স্বভাবিনী। স্মরবীথিকাবাসিনী মদামোদমধুরা নারী আমি। মন যাকে চায়, তাকে আহ্বান করার অধিকার আমার আছে নৃপতি।

অতিরথ বিস্মিত হন—তোমার অধিকার?

পিঙ্গলা—আপনিই সে অধিকার দিয়েছেন রাজ্যাধিপতি।

ঈষৎ হাস্যে ও শ্লেষযুক্ত স্বরে অতিরথ বলেন—হীনা পণাঙ্গনার কামনার আহ্বান তুচ্ছ করার অধিকারও সবার আছে, এ-সত্য বিস্মৃত হয়ো না বিভ্রমনিপুণা বারনারী।

পিঙ্গলার ওষ্ঠপুটে সূক্ষ্ম হাস্যরেখা কুটিলায়িত হয়ে ওঠে।—তুচ্ছ করবার শক্তি কি সবারই আছে?

অতিরথ রোষকঠোর কণ্ঠস্বরে বলেন—আহ্বান করার শক্তি কি

সবারই আছে, লাস্যজীবনী নারী ?

পিঙ্গলার আয়ত নয়নে যেন চকিত-স্ফুরিত এক বিদ্যুতের ছায়া নর্তিত হতে থাকে। পৃথিবীর পৌরুষ যেন আজ সস্পর্ধ কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করছে, বারনারী পিঙ্গলার হাস্যে লাস্যে ও কটাক্ষে আহ্বান করার শক্তি আছে কি ? প্রশ্ন উঠেছে, সৌম্য মেঘের বক্ষ বিদ্যুল্লতায় দীপিত করতে পারবে কি ? কেতকীপরাগের আহ্বান উপেক্ষা করবে মদান্ধ ভৃঙ্গ ? পূর্ণিমা রাতের জ্যোৎস্না জাগলে ঘুমিয়ে থাকবে চকোর ? সফেনজলহাসিনী তটিনীর কলস্বর শুনতে পেয়ে আকাশচারী কলহংস নেমে আসবে না তরঙ্গের আলিঙ্গনে বুক পেতে দিতে ?

নিরুত্তরা পিঙ্গলার ঈষদোদ্ধত ভ্রূবল্লরী যেন নীরবে উপহাস করে নৃপতি অতিরথের এই পৌরুষস্পর্ধিত প্রশ্নকে। এই প্রশ্নের মীমাংসা করে দিতে হবে। আহ্বান করার শক্তি তার আছে কি না, নৃত্য-সভার এই সান্ধ্য-উৎসবে তারই প্রমাণ চরম করে জানিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হয় দ্বিতীয় মদনবনিতাসমা রূপরম্যা নারী পিঙ্গলা।

নৃপতি অতিরথ আদেশ করেন—তোমার কর্তব্য পালন কর বারাঙ্গনা, নৃত্যে-গীতে সান্ধ্য উৎসব প্রমোদিত কর।

পুষ্পবলয়ে বেষ্টিত নৃত্যস্থলীর মাঝখানে এসে আবার দাঁড়ায় পিঙ্গলা। প্রত্যূষের সুপ্তোত্থিত বিহঙ্গদলের মতো পিঙ্গলার পদমঞ্জরী অকস্মাৎ কলধ্বনি মুখর হয়ে ওঠে। লীলাপূর্ণ বাহুবিক্ষেপ, ছন্দায়িত অঙ্গহার আর স্মরতরলিত কটাক্ষধারায় রূপ-মাধুরীকণিকা উৎক্ষিপ্ত করে রত্নকান্তিরুচিরা পিঙ্গলা নৃত্য করতে থাকে। বাদকবর্গের সুনিপুণ করন্যাসে স্বরযন্ত্রের বক্ষ হতে তাললয়-সমন্বিত নাদামোদ সভাগৃহ পরিপ্লুত করে তোলে। নিষ্পলক চক্ষে তাকিয়ে থাকেন নৃপতি অতিরথ।

সুধারসদ্রাবিতকণ্ঠ গীর্বাণবধূর মতো মধুস্বরা পিঙ্গলা সঙ্গীতে তার কামনা-বিধুর হৃদয়ের আহ্বান জানায়।

—পূর্ণতোয়া তটিনীর নীহারণসরণিতে কত তৃষিত পান্থ আসে। শুধু তুমি একজন কেন দূরে সরে আছ বুঝি না। অন্ধ নও, তবে এত ভয়

কেন? এস, সকলের সাথে তুমিও এস খরযৌবনবাহিনী এ-তটিনীর হৃদয়োপকূলে। তুমি না এলে সকলজনের সঙ্গ শূন্য মনে হয়। সুতরঙ্গিতসলিলা তটিনীর নীহারণসরণিতে, সকল তৃষিত, পান্থের সাথে তুমিও পান্থ এস।

সঙ্গীত থামে। নৃত্যাকুল দেহলতিকার মত্ত আন্দোলন সংবরণ করে পিঙ্গলা। উদ্দাম কাঞ্চীদামপীড়িত কটিতটে চম্পকপ্রভ করতল ন্যস্ত করে অপাঙ্গে নৃপতি অতিরথের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে পিঙ্গলা।

নৃপতি অতিরথের দুই অধরে তীব্র এক শ্লেষকুটিল হাসি ফুটে ওঠে। নগরমোহিনী বারাঙ্গনার এ আহ্বানে এমন কোন শক্তি নেই যে নৃপতি অতিরথের কামনা বিচলিত করতে পারে। জানে না, তাই ভুল বুঝেছে পিঙ্গলা।

মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকায়। পিঙ্গলা মুহূর্তের মতো কি যেন চিন্তা করে, তারপরেই প্রস্তুত হয়। পিঙ্গলার সনৃত্য গীতস্বরে আবার সভাতল উল্লসিত হয়ে ওঠে।

—ডাকে সন্ধ্যার উপবন, সকল সমীরের মাঝে সবিশেষ হয়ে, সব প্রিয়জন মাঝে প্রিয়তর হয়ে, এস তুমি সুরভিহরণ দক্ষিণ সমীরণ। এই উপবনের, বিচক কুসুমের, কোমল অধরের হাসিরাশিভার, সকলেরই তরে উপহার; কিন্তু সে অধর শুধু তোমার।

গীত বন্ধ করে পিঙ্গলা। চিবুকের চন্দনচিত্রক স্বেদাঙ্কুরে মলিন হয়ে ওঠে। ক্লান্ত বক্ষঃপঞ্জরের স্পন্দন সংযত করে পিঙ্গলা সাগ্রহ দৃষ্টি তুলে নৃপতি অতিরথের মুখের দিকে তাকায়।

হেসে ফেলেন নৃপতি অতিরথ। বারসুন্দরীর আহ্বানের আবেদন যেন সুশাণিত বিদ্রূপের আঘাতে ছিন্ন করে অবিচলিতচিত্তে তাকিয়ে থাকেন অতিরথ।

মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে পিঙ্গলা। শিথিল হয়েছে স্তবকিত চিকুরভার, দেহলগ্ন সকল রত্নাভরণও যেন ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। এক পাষাণ বিগ্রহের কাছে শিরীষমৃদুলাঙ্গী রূপোত্তমা নারীর কামনা বার বার

ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। সত্যি কি তার আহ্বানে শক্তি নেই? কিংবা তার আহ্বানেরই ভাষায় বার বার ভুল হয়ে যাচ্ছে? কিন্তু কোথায় ভুল, কিসের ভুল?

হেমদণ্ডের শীর্ষে দীপিকা জ্বলে। জ্বালা আর আলোকের একটি শিখা। পিঙ্গলার ইচ্ছা করে, ঐ শিখার উপর এই হারাবলীললিত বক্ষঃপট আহুতির মতো তুলে দিতে, যেন এই মুহূর্তে তার সকল ভ্রান্তি মুগ্ধ হয়ে যায়। কাম্যজনের হৃদয় আপন করা গেল না, কি দুঃসহ এই পরাজয়ের অপমান! এই লাস্য-হাস্য-কটাক্ষ সবই ধূলির মতো মূল্যহীন হয়ে গিয়েছে। আহ্বান করার শক্তি নেই, এই ধিক্কার শুনে ফিরে যাবার চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়।

বুঝতে পারে নি পিঙ্গল, কখন বাষ্পায়িত হয়ে উঠেছে তার নয়নদ্বয়। দীপিকার শিখা হতে বিচ্ছুরিত আলোক যেন তার হৃৎপিণ্ডের অন্তরালে বহুদিনের পুঞ্জীভূত একটা অন্ধকার স্পর্শ করেছে। যে পথ কোনদিন চোখে পড়ে নি, সে পথ যেন দেখতে পেয়েছে পিঙ্গলা।

আবার মঞ্জীর রণিত হয়ে ওঠে, আবার গীতমুখরিত হয়ে ওঠে সভাতল। পিঙ্গলা যেন তার অন্তরের সকল সুধা উৎসারিত করে আহ্বান জানায়।

—শুক্লা রজনীর আকাশ আমি, তুমি রাকা রজনীর রমণীয় হিমকর। সকল তারকা নিভে গিয়েছে, শুধু তুমি আছ সত্য হয়ে। আমার এ অন্তরের মহাশূন্যতার মধ্যে আর কেহ কোথাও নেই, আছ একমাত্র তুমি। তুমি আমার সব, তুমিই আমার এক। আমার সর্ববাঞ্ছা তুমি, সর্বতৃপ্তি তুমি। আমার কামনায় একমাত্র আনন্দ হয়ে এসে তুমি, দাঁড়াও আমার হৃদয়কুঞ্জের দেহলীপ্রান্তে, হে সুন্দরতনু অতিথি বন্দনীয়।

গীত সমাপ্ত হয়। নৃত্যপরা নগর-মঞ্জিকার ক্লান্ত চরণের মঞ্জিরধ্বনি দূরান্তের তটিনীকলনাদের মতো ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়, তারপর আর শোনা যায় না। নৃত্যস্থলীর মাঝখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় পিঙ্গলা। নৃপতি অতিরথের মুখের দিকে তাকায়।

নিদাঘতাপে দগ্ধকেশর জলনলিনীর মতো বেদনামলিন হয়ে ওঠে পিঙ্গলার মুখচ্ছবি। দেখতে পায়, নৃপতি অতিরথ কাঞ্চনময় মঞ্চের উপরে বসে আছেন, যেন বজ্রপাষাণে নির্মিত একটা নিঃশ্বাসহীন মূর্তি এবং রত্নে রচিত দুটি উজ্জ্বল অথচ কামনাহীন চক্ষু।

ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় পিঙ্গলা, নৃত্যস্থলীর পুষ্পবলয় পার হয়ে কাঞ্চনমঞ্চের সন্নিধানে এসে দাঁড়ায়।

—নৃপতি অতিরথ!

—বল, কি কথা তোমার নিবেদন করবার আছে।

—নিবেদন করেছি নৃপতি, আর তো বলবার কিছু নেই। শুধু আপনার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়ে ধন্য হতে চাই।

বিরক্তিকুটিল কঠিন ভ্রূভঙ্গী করে অতিরথ রুষ্টস্বরে বলেন—বারাঙ্গনা!

শিশিবায়িতনয়না সুচারুপক্ষ্মলা পিঙ্গলা মৃদুস্বরে বলে—বলুন নৃপতি।

অতিরথ—অয়ি রঙ্গিমতরঙ্গিণি! ধূমলেখা নীলাঞ্জনের রূপ ধারণ করে, কিন্তু সে ছলনায় চাতক আকৃষ্ট হয় না।

কশাহত প্রাণীর মতো বেদনানমিতশিরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে পিঙ্গলা। নৃপতি অতিরথ প্রশ্ন করেন—তোমার কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

—হ্যাঁ নৃপতি অতিরথ।

—তবে এখন প্রীতচিত্তে বিদায় গ্রহণ কর।

স্বর্ণখণ্ডে রজতপাত্র পরিপূর্ণ ক'রে স্বহস্তে উত্তোলন করেন নৃপতি অতিরথ। আহ্বান করেন—পুরস্কার লও কলাবতী পিঙ্গলা!

অবিচলিতনেত্রে তাকিয়ে থাকে পিঙ্গলা।—এ পুরস্কারে আমি প্রীত হতে পারি না নৃপতি অতিরথ।

অতিরথ—কেন প্রীত হতে পারবে না পণ্যা?

পিঙ্গলা—প্রয়োজন নেই।

অতিরথ—তবে বল, কি চাই, কোন্ পুরস্কারে প্রীত হবে?

পিঙ্গলা—অঙ্গীকার করুন নৃপতি, প্রার্থিত পুরস্কার অবশ্যই দান করতে কুণ্ঠিত হবেন না।

বিস্মিতভাবে অতিরথ বলেন—প্রার্থিত পুরস্কার অবশ্যই পাবে।

অতি মৃদু বিনম্র স্বরে এবং সাকাঙ্ক্ষ দৃষ্টি তুলে পিঙ্গলা মিনতি জানায়—আমার সঙ্কেতকুঞ্জে একদিন আসবেন, এই পুরস্কার চাই, আর কিছু চাই না নৃপতি অতিরথ।

ক্রোধোদ্দীপ্ত কণ্ঠে নৃপতি অতিরথ বলেন—দুঃসাহস সংযত কর পণ্যাঙ্গনা!

কবরীলগ্ন মল্লীমালিকা তুলে নিয়ে নৃপতি অতিরথের পদপ্রান্তে নিক্ষেপ করে পিঙ্গলা—তোমারই অনুরাগের অঙ্গনা তোমাকে অনুরোধ করছে অতিরথ। এস, এই কোলাহলময় জনতাজীবনের বাধা-লাজ-ভয়-অভিমান হতে বহুদূরে, এই নগরের বাহিরে, কুশকুসুমে সমাচ্ছন্ন প্রান্তরের শেষপথরেখা পার হয়ে, সপ্তপর্ণবনের নির্ঝরমূলে লতানিকুঞ্জের নিভৃতে পিঙ্গলার সম্মুখে এসে একবার দাঁড়াও। কৃষ্ণা দ্বাদশীর চন্দ্রালোকে এ নারীর মুখের দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিও, এই নারীমুখের সবই ছলনা কি না। অতনুতাপিত এই পিঙ্গলার তনুমাধবীর সান্নিধ্যে নবীন সহকারের মতো তোমার যৌবনরুচির চারুদেহশোভা নিয়ে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে থেক। দেখে যেও, এই তুচ্ছা নারীর মৃণালবাহুর আলিঙ্গনে ও বিম্বাধরের চুম্বনে নিকুঞ্জের চন্দ্রিকাবন্দিত নিশীথপ্রহর তন্দ্রাভিভূত হয় কি না।

অতিরথ—এমন হীন কৌতূহল আমার নেই।

দুই করতলে মুখ আচ্ছাদিত করে পিঙ্গলা, উত্তপ্ত একটা পাষাণের স্তূপ থেকে যেন কতগুলি স্ফুলিঙ্গকণিকা ছুটে এসে মুখের উপর পড়েছে।

অতিরথ বলেন—অন্য অনুরোধ কর পিঙ্গলা।

পিঙ্গলা উত্তর দেয় না।

অতিরথ—তোমার কথা শেষ কর নারী।

করতলে নিবদ্ধমুখ, নতাঙ্গী পিঙ্গলা আবার মুখ তুলে তাকায়। ধারাহত কমলের মতো সে মুখশোভা অশ্রুসিক্ত ও বিশীর্ণ।—আমার শেষ অনুরোধ জানাতে চাই নৃপতি।

—বল।

—কলাবতী পিঙ্গলার সঙ্গীত আপনাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে নি, তাই আর একবার সুযোগ প্রার্থনা করি। আমার শেষ সঙ্গীতে আমার শেষ অনুরোধ শেষ কথা আপনাকে শুনিয়ে দিতে চাই।

—শেষ করো তোমার শেষ সঙ্গীত।

—আজ নয়, এখানে নয় নৃপতি।

—কোথায়?

—সঙ্কেতকুঞ্জে।

উজ্জ্বল পাষাণচক্ষুর দৃষ্টি তুলে পিঙ্গলার দিকে তাকিয়ে থাকেন নৃপতি অতিরথ। ছলনিপুণা বারাঙ্গনার অন্তহীন ছলনার কৌশল আর দৃঢ়তা দেখে বিস্মিত হন। অপলক চক্ষে তাকিয়ে আছে পিঙ্গলা, যেন নিখিলঙ্গিলা এক ভুজঙ্গীর দৃকভঙ্গী। কুমার নৃপতি অতিরথের রূপ-যৌবনের কামনাগুলিকে কাঞ্চনমঞ্চের উচ্চতা থেকে পথপঙ্কধূলির মধ্যে নামিয়ে গ্রাস করার জন্য যেন একটা সর্পিল সঙ্কল্পে নিষ্পলক চক্ষে তাকিয়ে আছে। অথচ সে চক্ষুর উপরে এক প্রেমিকা নারীর অশ্রুসিক্ত আবেদনের আবরণ কি সুন্দর ও করুণমধুর হয়ে ফুটে উঠেছে!

নৃপতি অতিরথ দৃষ্টি নত করে কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হয়ে থাকেন। যেন তাঁর জীবনপথের এই ছলনাকে চূর্ণ করার উপায় অন্বেষণ করছেন অতিরথ।

দূর দেবালয় হতে আরাত্রিক স্তোত্রের সুন্দর ও মাঙ্গল্য মৃদঙ্গের রব তরঙ্গিত হয়ে ভেসে আসে। নৃপতি অতিরথ সুহাস্যনন্দিত মুখে পিঙ্গলার দিকে তাকান।

পিঙ্গলা মুগ্ধভাবে বলে—সুহৃত্তম অতিরথ!

অতিরথ—শোভনাঙ্গী ভদ্রে, শুনতে চাই তোমার শেষ সঙ্গীত,

তোমার কামনার শেষ কথা, যাব তোমার সঙ্কেতকুঞ্জে।

মেরুমরালীর মতো হর্ষোৎফুল্লা পিঙ্গলা নৃত্যসভাস্থল হতে চলে যায়।

কৃষ্ণা দ্বাদশীর কৃশ চন্দ্রলেখার কিরণে যখন শেষ নিশিথিনী আকাশ-পটে শারদাভ্রপুঞ্জ শুচিশুভ্র হয়ে উঠেছে, তখন প্রসাদকক্ষের রত্নপর্যঙ্কে শয়ান নৃপতি অতিরথ হঠাৎ সুপ্তোত্থিত হয়ে বাতায়নের কাছে এসে দাঁড়ান। দেখতে পান, কৃষ্ণা দ্বাদশীর চন্দ্রমা পশ্চিমাচলমুখী হয়েছে। অট্টহাস্য করে ওঠেন নৃপতি অতিরথ। ছলনাকে ছলিত করতে পেরেছেন। কৃষ্ণা দ্বাদশীর নিশাবশেষ ধীরে ধীরে ম্রিয়মাণ হয়ে আসছে, শেষ হয়ে যেতে আর দেরি নেই। কক্ষের দীপ নিভিয়ে দিয়ে রত্ন-পর্যঙ্কের উপর আবার নিদ্রাভিভূত অতিরথ সুখস্বপ্নে মগ্ন হয়ে থাকেন।

দূরে সপ্তপর্ণ অটবীর জ্যোৎস্নামোদিত নিঃশ্বাসবায়ু হতে তরুক্ষীরগন্ধ ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকে। নির্ঝরমূলে এক লতানিকুঞ্জের নিভৃতে পল্লবাসনে বসেছিল অভিসারিকা পিঙ্গলা। শুষ্ক পত্রে সমাকীর্ণ বনপথে শুধু কৃকলাসের গমনধ্বনি উত্থিত হয়, যেন কতগুলি বক্ষঃপঞ্জর চূর্ণ হয়ে শব্দ করছে। প্রহরের পর প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, তবু নিকুঞ্জদ্বারে বাঞ্ছিত প্রেমিকের পদধ্বনি এখনো শোনা যায় নি। সে কি আসছে, সে কি আসবে? উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলিও যে শেষ হয়ে আসছে। ব্যাকুলিতচিত্তা অভিসারিকার নবনীততনু যেন এক নির্মম প্রত্যাখ্যান ও অপমানের হিমদ্রবসম্পাতে কঠোর হয়ে পাষাণমূর্তির মতো বসে থাকে। পরমুহূর্তে দগ্ধপক্ষ বিহগীর মতো নির্ঝর সলিলে দেহনিক্ষেপ করার জন্য উঠে দাঁড়ায় পিঙ্গলা। আবার স্তব্ধ হয়ে যায়, কিন্তু সহ্য করতে পারে না এই স্তব্ধতা। নীল চেলাঞ্চল যেন অনলতন্তু দিয়ে রচিত একটা দুঃসহ জ্বালাময় আবরণ মাত্র, যেন মৃত্যু হবার আগেই ভুল করে স্বেচ্ছায় চিতার মাঝখানে এসে বসেছে পিঙ্গলা।

নির্ঝরনিম্নে সলিলপানতৃপ্ত শিশু-হরিণের হর্ষ শোনা যায়, বৃক্ষচূড়ায় সদ্যোজাগ্রত বিহঙ্গের অস্ফুট কাকলী জাগে, কৃষ্ণা দ্বাদশীর চন্দ্রলেখা লুপ্ত

হয়েছে, রক্তজবার নির্যাসে রচিত রেখার মতো প্রাচীকপোলে অরুণ-চুম্বিত লজ্জারাগরেখা ফুটে উঠেছে। অভিসারিকা কামিনী পিঙ্গলার বাঞ্ছিতজন এল না। সব ছেড়ে দিয়ে এক কাম্য দেবতার মতো যে একজনকে এই জীবনে আহ্বান করা হলো, সেও এল না।

মনে হয়, জগতের সব রূপরসবর্ণগন্ধের আনন্দ হারিয়ে একটা জাগ্রত মৃত্যুর অন্ধকারে সে বসে আছে। বধির অন্ধ রুদ্ধবাক্ ও অচল জীবন। করতলে দুই চক্ষু আবৃত ক'রে অনেকক্ষণ বসে থাকে পিঙ্গলা।

কিন্তু ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসতে থাকে পিঙ্গলার মন। বাঞ্ছিতের প্রত্যাখ্যানের জ্বালা নারীর কামনাময় যে হৃদয়ে দাবদাহ সৃষ্টি করেছেন, সেই হৃদয়টাই যেন ধীরে ধীরে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে। সেই উৎকণ্ঠতা, অস্থিরতা আর প্রতীক্ষার যন্ত্রণাও ধীরে ধীরে নির্বাপিত হয়ে আসছে। নিকুঞ্জের উৎকলিকা লতাভার হতে প্রত্যূষের নীহারবিন্দু অবনতমুখিনী পিঙ্গলার বিশ্লথ কবরীভারের উপর ঝরে পড়তে থাকে।

যেন কার স্নেহাশীষপূত স্নিগ্ধ হস্তের স্পর্শ এসে লুটিয়ে পড়েছে মাথার উপর। মুখ তুলে চারদিকে তাকায় পিঙ্গলা। বিস্মিত হয়ে দেখে, তার প্রবঞ্চিত ও প্রত্যাখ্যাত জীবনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য যেন বিশ্বসৃষ্টির কতগুলি নূতন আনন্দ চারদিকে থেকে তার অন্তরাত্মার আশেপাশে আর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ভূমিলুণ্ঠিত চেলাঞ্চলের প্রান্তে ঘুমিয়ে আছে এক হরিণশাবক। পিঙ্গলারই ক্রোড়ের উপর শীর্ণপক্ষ এক বৃদ্ধ পারাবত চঞ্চুপুটে যবাঙ্কুর নিবদ্ধ করে বসে আছে।

বননির্ঝর প্রদেশ হতে হৃষ্ট দাত্যূহের কলনাদ শোনা যায়। ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করে পিঙ্গলা। লতানিকুঞ্জের বাইরে এসে দাঁড়ায় এবং পূর্বাকাশের দিকে তাকিয়ে অচঞ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

বনবাসিনী উপাসিকার মতোই পিঙ্গলা যেন প্রত্যূষের শান্তির মধ্যে এই চরাচরের অধীশ্বর এক পরমানন্দময়ের পদধ্বনি শোনবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

—তুমি আনন্দ, তুমিই এক তুমিই সর্ব। আর সব মিথ্যা।

নিজের অজ্ঞাতসারেই পিঙ্গলার কম্পিত অধরে অস্ফুটস্বরে প্রার্থনার বাণী গুঞ্জরিত হতে থাকে।—মূঢ়া মানবী পিঙ্গলার সকল মোহ বিদূরিত কর প্রভু, জগতের একনাথ। তুমি প্রেম, আনন্দ, তুমি শান্তি, তুমি সর্ববাঞ্ছা, তুমি সর্বতৃপ্তি। তোমার প্রাপ্য পূজার ফুল মর্ত্যমানবের পায়ে নিবেদন করার ভ্রান্তি হতে রক্ষা কর।

এগিয়ে যায় পিঙ্গলা। নির্ঝরমূলে এসে দাঁড়ায়। দেখতে পায়, তরুগাত্র হতে স্খলিত বল্কল সলিলধৌত হয়ে তটপ্রান্তে পড়ে আছে।

বিশ্বের একনাথ যেন পিঙ্গলারই জন্য উপহার রেখে দিয়েছেন, আনন্দময় জীবনপথের সন্ধান ইঙ্গিতে জানিয়ে দিচ্ছেন। আর বিলম্ব করো না, যত তুচ্ছ আর ক্ষণিকের জন্য মত্ত হয়ে বৃথাই জীবনের অনেক সময় বিনষ্ট হয়েছে। করো কামনার ক্ষয়, তবে পাবে তাঁর সন্ধান, যিনি একনাথ, যিনি সব সুন্দরতা, শান্তি ও আনন্দের সার।

রত্নময় কেয়ুর কঙ্কণ আর কর্ণভূষা নির্ঝরের সলিলপ্রবাহে নিক্ষেপ করে বল্কল পরিধান করে এবং লতানিকুঞ্জের নিভৃতে এসে একনাথের ধ্যানে নিরত হয়। কৃষ্ণা দ্বাদশীর চন্দ্রাস্তের পর এক প্রহরের মধ্যেই এক অভিসারিকা প্রমদা নারীর সঙ্কেতকুঞ্জ তপস্বিনীর আরাধনাস্থলীতে পরিণত হয়।

দিন যায়, মাস যায়, বৎসর অতীত হয়। নৃপতি অতিরথের জীবনে কোন পরিবর্তন ঘটে নি। তাঁর অনুপম রূপযৌবনে অম্বিত পৌরুষের অহংকার নিয়ে কাঞ্চনময় মঞ্চের উপরেই তিনি সমাসীন রয়েছেন। তাঁর প্রণয় লাভের সৌভাগ্য হয় নি কোন নারীর। তাঁর প্রণয় লাভের জন্য, তাঁর মূর্তিকে কল্পনায় দেবতার আসনে বসিয়ে উপাসনা করছে, এমন কোন নারীর পরিচয় পান নি। বারাঙ্গনা পিঙ্গলার কথা মনে পড়েছিল একবার। মনে মনে হেসেছিলেন অতিরথ। সে সুন্দর ছলনাকে কত সহজে একটি উপেক্ষায় এমনি চূর্ণ করে দিয়েছেন যে, বিফল অভিসারের আঘাত পেয়ে ফিরে এসে আর একটি প্রশ্ন করারও শক্তি হলো না সে

নারীর। মদিরেক্ষণা সে নারী তার বিলোললোচনে অশ্রুসিক্ত আবেদন নিয়ে দেখা দিতে আর আসে নি। তুচ্ছা বারসুন্দরীর একটি দিনের সেই লিপ্সার ইতিহাস এখন আর মনেও পড়ে না অতিরথের।

সেদিনও নৃত্যসভার কাঞ্চনমঞ্চে নবোদিত আদিত্যের মতো সুন্দর মূর্তি নিয়ে বসেছিলেন নৃপতি অতিরথ। হঠাৎ মনে পড়ে, আজ কৃষ্ণা দ্বাদশী। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে, বৎসরাতীত সেই কৃষ্ণা দ্বাদশীর কথা। পাষাণবক্ষের নিভৃতে অদ্ভুত এক কৌতূহলের চাঞ্চল্য অনুভব করেন অতিরথ। সভাদূতের প্রতি নির্দেশ দান করেন—আজকের নৃত্যসভার উৎসব প্রমোদিত করার জন্য কলাবতী প্রমদা পিঙ্গলাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এস।

পিঙ্গলা! সুধাকণ্ঠী, সুযৌবনা, মুনিচিত্তচঞ্চলকারিণী, রূপাতিশালিনী পিঙ্গলা স্পর্ধাতিশয়া, কঠিন প্রণয়কলাশীলা, নৃত্যপটীয়সী পিঙ্গলা। কিন্তু কুমার অতিরথের গর্বের কাছে পরাভব স্বীকার করে নিয়ে কোথায় সে আজ মুখ লুকিয়ে পড়ে আছে? সে মুখ আজ নতুন করে দেখতে, সেই পরাভূতা লাস্যময়ীর মলিনবদনের বিষাদ আর একবার স্বচক্ষে দেখে, অত্যুচ্চ কাঞ্চনমঞ্চে সমাসীন তাঁর এই অপরাজেয় পৌরুষের গর্বে আর একবার উল্লসিত হতে ইচ্ছা করেন অতিরথ।

সভাদূত এসে সংবাদ দেয়—পিঙ্গলা নেই।

চমকে ওঠেন অতিরথ—কোথায় গিয়েছে?

সভাদূত—রাজধানীর বাইরে।

অতিরথ—কত দিন হলো?

সভাদূত—এক বৎসর।

রহস্যময় এক অদ্ভুত শঙ্কার ছায়া পড়ে বীরোত্তম অতিরথের দৃপ্ত দুই চোখের দৃষ্টিতে।—কোথায় আছে সে?

সভাদূত—নির্ঝর প্রদেশের সপ্তপর্ণ বনে।

বক্ষঃনিভৃতের বিচলিত নিঃশ্বাসের আলোড়ন দমন করতে গিয়ে অতিরথের কণ্ঠস্বর বিচলিত হয়ে ওঠে—কেন, কি উদ্দেশ্যে?

সভাদূত—তপস্বিনী হয়েছে পিঙ্গলা।

আর কোন প্রশ্ন করেন না নৃপতি অতিরথ। কাঞ্চনমঞ্চ হতে গাত্রোত্থান করেন। নৃত্যসভা ভঙ্গ করে দিয়ে ধীরে ধীরে প্রস্থান করেন। প্রাসাদের দীপহীন নীরব ও শূন্য নৃত্যস্থলী পিছনে পড়ে থাকে। প্রাসাদলগ্ন উপবনের একান্তে তাঁর বৃক্ষবাটিকার নিভৃতে এসে নিঃশব্দে বসে থাকেন নৃপতি অতিরথ।

তপস্বিনী হয়েছে পিঙ্গলা। প্রেমাস্পদের হৃদয়হীন প্রত্যাখ্যানের আঘাত সহ্য করে কী কঠিন সঙ্কল্পের ধ্যানে হৃদয় উৎসর্গ করে এখনো প্রতীক্ষায় রয়েছে সে নারী। উপাসিকা যেমন দূরের দেবতাকে কাছে ডাকে, নির্ঝরপ্রদেশের বনান্তরালে লতানিকুঞ্জের নিভৃতে কামনাসুন্দরী এক নারী তার বাঞ্ছিত পুরুষের আকাঙ্ক্ষাকে তেমনি আরাধনা করে কাছে ডাকছে। অতিরথের এতদিনের সেই কল্পনার নারী যেন স্তবকিত চিকুরশোভা, রক্তিম অধরদ্যুতি এবং চন্দনচিত্রিত চিবুকে মূর্তি গ্রহণ করেছে। নৃত্যসভাতলে নয়, সেই প্রেমিকা নারীর চরণমঞ্জীর আজ যেন অতিরথের হৃৎপিণ্ডস্থলের অণুতে অণুতে রণিত হয়ে উঠেছে।

চঞ্চল হয়ে ওঠেন অতিরথ। ধমনীর প্রতি শোণিতকণিকা যেন উৎসুক হয়ে উঠেছে সেই মধুরাধরা নারীর একটি চুম্বনে চঞ্চলিত হবার জন্য। কল্পনায় দেখতে পান অতিরথ, সপ্তবর্ণ বনের নিভৃতে দুটি আলিঙ্গনোন্মুখে মৃণালবাহু তাঁরই জীবনের সুখস্বর্গ রচনার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। অনির্বাণ নক্ষত্রের মতো প্রতীক্ষায় নিশিযাপন করেছে দুটি নম্র আঁখির তারকা।

বৃক্ষবাটিকার নিভৃত থেকে প্রমত্তের মতো ছুটে বের হয়ে আসেন অতিরথ। রথশালার সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হন। অতিরথের আহ্বান শোনা মাত্র সারথী রথ নিয়ে আসে। প্রাসাদের সিংহদ্বার, তারপর নগরদ্বার পার হয়ে কুশকুসুমে সমাচ্ছন্ন প্রান্তরের পথে তিমিরপুঞ্জ ছিন্ন করে নৃপতি অতিরথের রথ ধাবিত হয়।

সত্যই তপস্বিনীর মতোই ধ্যানমৌনা ও মুদ্রিতনয়না এক নারীর মূর্তি। অযত্নবদ্ধ চিকুরভার সত্যই জটাভারের মতো দেখায়। যৌবন-লাবণ্যমাধুরী যেন বল্কলবসনে আবৃত করে সত্যই কৃশ জ্যোতির্লেখার মতো এক তাপসিকার রূপ মুখায়বে ফুটিয়ে রেখেছে পিঙ্গলা। লতানিকুঞ্জকে বনবাসিনী সাধিকার পর্ণকুটীর বলেই মনে হয়।

পর্ণকুটীরের দুয়ারে প্রজ্বলন্ত শুষ্কপত্রের শিখায়িত আলোর কাছে দাঁড়িয়ে স্তিমিতদেহা পিঙ্গলার তপস্বিনীমূর্তির দিকে তাকিয়েছিলেন অতিরথ। কৃষ্ণা নিশীথিনীর প্রহর একের পর এক শেষ হয়ে গিয়েছে। এখনো তপস্বিনী চক্ষু উন্মীলন করে নি। মনের সকল আবেগ ও আকুলতা কঠিন ধৈর্যে স্তব্ধ করে রেখে অতিরথ একটি পরম মুহূর্তের প্রতীক্ষায় পিঙ্গলার ধ্যানমৌন মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

কিন্তু আর কতক্ষণ? কখন শেষ হবে এই দুঃসহ প্রতীক্ষার শাস্তি, কতক্ষণে শেষ হবে পিঙ্গলার সুকঠিন তপস্যা? পিঙ্গলার ঐ দুটি ভ্রূচ্ছায়ায় লালিত সুপক্ষ্মলা দুটি আঁখি-কনীনিকা সন্ধ্যাতারার মতো যদি এই মুহূর্তে তাকিয়ে ফেলে, দেখতে পাবে পিঙ্গলা, জীবনবাঞ্ছিত তার কুঞ্জদ্বারেই এসেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আর কতক্ষণ?

অতিরথ আহ্বান করেন—প্রিয়া পিঙ্গলা।

তপস্বিনীর মূর্তিতে কোন চাঞ্চল্য জাগে না।

—জীবনদয়িতা, আমার সকল আকাঙ্ক্ষার সারভূতা, সুমধুরা পিঙ্গলা!

পিঙ্গলার অধর স্ফুরিত হয় না, ভ্রূলতিকা স্পন্দিত হয় না, রক্তিমচ্ছটা জাগে না সুকোমল কপোলে।

—ঐ রূঢ় বল্কলের নিষ্ঠুর স্পর্শ বর্জন কর রূপেশ্বরী পিঙ্গলা! নীল চীনাংশুকে, নব মৌক্তিকজালে, মণিবিনির্মিত কাঞ্চী কেয়ূর কঙ্কণ ও নূপুরে পীতকুঙ্কুমের পত্রলিখায় আর নবশিরীষের মাল্যে অতিরূপা হয়ে প্রণয়ীর আলিঙ্গনে এসে ধরা দাও প্রেমমঞ্জুলা পিঙ্গলা।

বল্কলবাসে আবৃততনু, তপস্বিনীর ধ্যান ভাঙে না।

—জাগো পিঙ্গলা, ঐ পাষাণীমূর্তি পরিহার করে চিরনৃত্যচারিণী হয়ে নৃপতি অতিরথের হৃদয়োৎসবের সভাতলে এসে দাঁড়াও।

পিঙ্গলার জটায়িত চিকুরপুঞ্জের উপর প্রজ্বলন্ত শুষ্কপত্রের স্তূপ হতে স্ফুলিঙ্গ এসে পড়তে থাকে। তপস্বিনীর মূর্তি নড়ে না।

—বধিরা পিঙ্গলা, এ তোমার কোন্ নতুন ছলনা?

বধিরা শুনতে পায় না। নৃপতি অতিরথ ব্যাকুল হয়ে আবেদন করেন—কথা বলো পিঙ্গলা।

পিঙ্গলার ওষ্ঠ কম্পিত হয় না।

চিৎকার করে ওঠেন অতিরথ—বারাঙ্গনা পিঙ্গলা!

তপস্বিনীর ধ্যানমুদিত চক্ষু উন্মীলিত হয়। শান্ত, নির্বিকার ও বেদনাহীন দুই চোখের দৃষ্টি।

অতিরথ বলেন—তোমার প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়ো না অভিসারিকা। শেষ সঙ্গীতে তোমার হৃদয়ের শেষ কামনার কথা রাজ্যেশ্বর অতিরথের কাছে নিবেদন কর।

পিঙ্গলা আবার দুই চক্ষু মুদিত করে। ওষ্ঠ স্পন্দিত হয়। ধীরে ধীরে যেন এই বনচ্ছায়ার মর্মলোক হতে এক মধুনিঃস্যন্দী গীতস্বর কোন্ এক দিব্যলোকের মর্মরধ্বনির মতো জেগে ওঠে। নীরব সপ্তপর্ণবনের তন্দ্রায়িত নিশীথবায়ু এক তপস্বিনীর কণ্ঠস্বর-মাধুরীর স্পর্শে জাগরিত হয়। পিঙ্গলার অন্তর হ'তে উৎসারিত সুমন্দ্রিত মন্ত্রস্বরের মতো এই সঙ্গীতকে কৃষ্ণা দ্বাদশীর ঊর্ধ্বলোকে এক পরমকাম্যের দিকে বহন করে নিয়ে যেতে থাকে।

—তুমি একনাথ! তুমি শান্তি, তুমি আনন্দ, নিখিলের প্রাণারাম তুমি। তুমি সকল দুঃখের শেষ, তুমি সকল সুখের শেষ। তুমি সকল হীনের সম্মান, তুমি সকল দীনের সম্পদ! তোমারই করুণায় ক্ষয়ে গিয়েছে এ জীবনের সব কামনার বন্ধন। চিনেছি তোমাকে আনন্দময় একনাথ। নিরঞ্জন, করুণাঘন, হৃদয়েশ্বর একনাথ—তুমি আমার।

সন্ত্রস্ত শ্বাপদের মতো ধীরে ধীরে পিছনে সরে যেতে থাকেন

অতিরথ। অভিসারিকার কুঞ্জদুয়ার নয়, এ যে এক কামনাবিহীনা তপস্বিনীর পর্ণকুটীরের দুয়ার। প্রজ্বলন্ত শুষ্কপত্রের শিখা যেন দাবানলের জ্বালা নিয়ে উদ্যত আকাঙ্ক্ষাচারী অতিরথের বুকের ভিতরে প্রবেশ ক'রেছে। ত্বরিতপদে বনভূমি অতিক্রম ক'রে চলে যেতে থাকেন অতিরথ। পিঙ্গলার গীতস্বর যেন অগ্নিবানের মতো অতিরথের পিছনে মৃত্যুর অভিশাপ নিয়ে ছুটে আসছে। দাবানল-দগ্ধ মদমাতঙ্গের মতো সপ্তপর্ণ অটবীর অভ্যন্তর হ'তে মুক্ত করার জন্য দ্রুতপদে চলে যেতে থাকেন অতিরথ। আর্তনাদ করে ওঠেন—ক্ষমা করো তপস্বিনী।

বনোপ্রান্তে প্রান্তরপথে অপেক্ষমান রথ হ'তে সারথী ছুটে আসে—আজ্ঞা করুন রাজ্যেশ্বর।

রথে আরোহণ করে নৃপতি অতিরথ বলেন—রাজধানী অভিমুখে নয়, এই প্রান্তরপথ ধরে রথ নিয়ে চল সারথী, যতদূর যাওয়া যায় এবং যতক্ষণ না এ রাত্রি শেষ হয়।

সপ্তপর্ণবনের সিদ্ধসাধিকার গীতস্বর আর শোনা যায় না। তবু রথের উপরে শান্ত হ'য়ে বসে থাকতে পারছিলেন না নৃপতি অতিরথ। সেই দাবদাহের জ্বালা যেন কঠিন বন্ধনে বন্দী করে রেখেছে নৃপতি অতিরথের বক্ষাস্থিগুলিকে।

কৃষ্ণা দ্বাদশীর চন্দ্রমা পাণ্ডুর হয়ে এসেছে। ম্লান জ্যোৎস্নালোকে দেখা যায়, অদূরে প্রশান্তসলিলা এক নদী প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে। নৃপতি অতিরথ জিজ্ঞাসা করেন—এ কোন্ নদী সারথী ?

—এ নদীর নাম নীবারা। পুণ্যতোয়া নিবারা। পাতকীরা এই নদীর জলে স্নান করে তাদের প্রায়শ্চিত্ত ব্রত আরম্ভ করে। বাসনা ক্ষয় করার জন্য তপোসাধনার উদ্দেশ্যে বনযাত্রার পূর্বে সংসারবিমুখ মানুষ এই নদীর জলে স্নান করে শুচি হয়।

—রথ থামাও সারথী।

রথ হ'তে অবতরণ করেন নৃপতি অতিরথ! মস্তক হতে মুকুট

উত্তোলন করে রথের আসনে স্থাপন করেন।

সারথী ভীতকণ্ঠে ডাকে—রাজ্যেশ্বর!

নৃপতি অতিরথ শান্তস্বরে বলেন—কথা বলো না সারথী, রাজধানীতে ফিরে যাও।

সারথী—আর আপনি?

উত্তর দেন না অতিরথ। দূরে, গিরিবক্ষের কুহেলিকা আর অরণ্যের ছায়ারেখার দিকে সতৃষ্ণ চক্ষে তাকিয়ে থাকেন, যেন এক তপস্যার জগৎ তাঁকে নীরবে আহ্বান করছে।

সুশীতলা নীবারার প্রসন্ন সলিলে স্নান করবার জন্য তটপঙ্ক অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হতে থাকেন তপস্যাভিলাষী অতিরথ।

●

বেলমোতিয়া

বিমল মিত্র

যত বয়স বাড়ছে ততই মনে হচ্ছে আমার অবাক হবার ক্ষমতা বুঝি আর শেষ হবার নয়। এমন একদিন ছিল যখন মনে হতো সব দেখা সব শোনা সব বোঝা শেষ হয়ে গেছে। দেখবার শোনবার বোঝবার আর কিছু নেই। তবু এখনও সূর্যাস্ত দেখলে দুচোখ ভরে চেয়ে থাকি। একটা ফুল ফোটবার শব্দ শোনবার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কান পেতে থাকি। বই পড়তে পড়তে একটা শব্দের মানে বোঝবার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিই এখনও।

আর মানুষ!

মানুষের বৈচিত্র্যেরই কি শেষ আছে। আজ মনে হয় এ-বৈচিত্র্যের বুঝি শেষ হবে না কোনদিন। এই সেদিনের কথা। দশ বারো বছর আগের ঘটনা। বিলাসপুর থেকে তিরিশ মাইল দূরে নিপানিয়া গ্রামে তখন আছি আমি। উদ্দেশ্য কিছু নয়, বিশ্রাম। নিপানিয়া নাম হলে কী হবে, জল প্রচুর। গ্রামের নাম নিপানিয়া, নদীর নাম নিপানি। অভিধানে তাকেই বলে নিপানি যাতে জল নেই। কিন্তু এ গ্রামের আর এই নদীর নাম যে কে দিয়েছিল তা জানি না কারণ নদীতে জলও প্রচুর। ওই নিপানিই ছিল আমার প্রধান আকর্ষণ।

ইচ্ছে ছিল শহর থেকে দূরে বেশ কিছুদিন নিরিবিলিতে কাটাবো। বিলাসপুরের কারখানা, লোকো-শেড, ইঞ্জিন, ধোঁয়া আর গোলমাল থেকে দূরে গিয়ে সভ্যতাকে ভুলে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু সেখানে সেই অজ পাড়াগাঁয়ের চেয়েও অধম সেই নিপানিয়াতে গিয়ে যে অবাক হতে হবে আমাকে, তা আর ভাবিনি। আমাকে সত্যি অবাক করে দিয়েছিল দুখমোচন কুর্মির বউ বেলমোতিয়া।

আশ্চর্য মেয়ে বেলমোতিয়া। কোনও মেয়েমানুষ যে স্বামীকে এত

ভালোবাসতে পারে, আমি এ-যুগে অন্তত বেলমোতিয়ার আগে তার প্রমাণ পাই নি। আর শুধু আমি কেন, আপনারাও যে পান নি তার সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই।

সেই বেলমোতিয়ার সঙ্গে আজ এতদিন পরে আবার দেখা। আর এই দেখা না হলে হয়তো এ-গল্প লেখার কোনও দরকারই হতো না।

দেখা হওয়ার পর থেকেই কেবল ভাবছি এ কেমন করে হয়। ভাবছি এ কেমন করে হতে পারে। ভাবছি এ কেমন করে সম্ভব হলো! বেলমোতিয়া এ কাজ কেন করতে গেল? বেলমোতিয়া কি তবে তার মরদকে ভালোবাসতো না? সবটাই কি তার ছলনা? দুখমোচনের জন্যে কেন সে সেদিন অমন করে কেঁদেছিলো? কেন সে তার মরদের চিতার ওপর ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলো? সবটাই কি তার লোক-দেখানো না কি কুন্দনলাল দুখমোচনের চেয়েও দেখতে সুন্দর, না কি কুন্দনলাল কিছু যাদু জানে।

কে জানে! আমি কুন্দনলালকে আর কতটুকুই জানি! কুন্দনলালের তখন আর কী-ই বা বয়েস!

আসলে কুন্দনলালের বাপ হরবনস্‌লালই আমাকে নিপানিয়াতে নিয়ে গিয়েছিল। নিপানিয়া হল হরবনস্‌লালের জন্মভূমি। কুন্দনলালের জন্মভূমি। দুখমোচন কুর্মি আর বেলমোতিয়ারও দেশ ওই নিপানিয়া।

হরবনস্‌লাল আমাদের বিলাসপুরে রেলওয়ের লেবেল ক্রসিং-এ গেটম্যানের চাকুরি করতো। রেলের খাতায় হরবনস্‌লালের বয়েস যা-ই লেখা থাক, যখন সে রিটায়ার করে তখন কম করেও তার বয়েস সত্তরের কম নয়। কোন্ সাহেবের বুঝি হঠাৎ একদিন নজর পড়লো তার ওপর। তারপর খোঁজ-খবর নিয়ে দেখা গেল সে, যে-বয়সে তার রিটায়ার করবার কথা তার পরেও সে চাকুরি করে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নোটিশ দেওয়া হলো তাকে। আর একদিন তার কোয়ার্টার ছেড়ে দিয়ে তাকে তার নিপানিয়াতে ফিরে যেতে হলো চিরকালের মত!

যাবার আগের দিন আমার কাছে এসেছিল হরবনস্‌লাল। যথারীতি

প্রণাম করলে। ছেলে কুন্দনলালও সঙ্গে ছিল। সেও আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

বললাম—তাহলে তুমি দেশেই ফিরে যাচ্ছো হরবনস্‌লাল ?

হরবনস্‌লাল বললে—জী হুঁজুর, আমার দেশ নিপানিয়াতেই যাচ্ছি—

আরো অনেক কথা বললে। হরবনস্‌লালের বউ মারা গিয়েছিল বহুকাল আগে, এই কুন্দনলালের জন্ম হবার সঙ্গে সঙ্গে। সাহেবকে অনেক ধরেছিল কুন্দনলালের চাকুরীর জন্য। কিন্তু মাত্র বারো বছর বয়সের ছেলেকে কী করে আর গেট-ম্যানের চাকরি দেওয়া যায়, তাই সাহেব বলেছিল আঠারো বছর বয়েস হলেই তার চাকরি করে দেবে।

জিজ্ঞেস করেছিলাম—এখন চালাবে কি করে তুমি ?

হরবনস্‌লাল বলেছিল—ক্ষেতি আছে, চাষ-বাস করবো, আর আছে এই কুন্দনলাল—

—গাঁয়ে তোমার আর কে আছে ? কোনও ভাই কি কাকা কি জ্যাঠা কিংবা তাদের ছেলেমেয়ে কেউ নেই !

—না হুঁজুর, আমার কোন রিস্তাদারও নেই। শুধু আমি আর আমার এই লেড়কা কুন্দলাল। তামাম দুনিয়ায় আর আমার কেউ নেই।

—দূর সম্পর্কের কোনও আত্মীয়-স্বজন।

না হুঁজুর, তাও নেই। মাথার ওপর শুধু ভগবান আছে, তার ওপর ভরসা করে দিন কাটিয়ে দেব কোনওরকমে। যদি সাহেব কুন্দনলালকে কোনদিন রেলে চাকরি দেয় তো তখন আবার আসবো এখানে, কুন্দনলাল কোয়াটার পেলে সেখানে থাকবো। কুন্দনলালের সাদি দেব, ওর বউ তখন আমাকে দেখবে, ওর বাল-বাচ্চা যদি হয় তো তখন তাদের নিয়ে থাকবো—

এই রকম অনেক সাধ ছিল হরবনস্‌লালের! যা সব বাপেরই থাকে। কিন্তু হরবনস্‌লাল কি জানতো তার সব সাধ সব আশা এমন করে নষ্ট হয়ে যাবে ?

কিন্তু সে কথা এখন থাক।

আর তা ছাড়া এ তো হরবনস্‌লালের গল্প নয়, এ বেলমোতিয়ার গল্প। সুতরাং বেলমোতিয়ার গল্পটাই বলি। যে বেলমোতিয়ার সঙ্গে এই এতদিন পরে আবার দেখা হলো।

সেই বারো বছর আগে কিছুদিনের জন্যে হঠাৎ মনটা একটু নিরি-বিলির জন্যে ছটফট করে উঠলো। এ-রকম মন ছটফট-করা আমার প্রায়ই হয়। তখন আমার কিছু ভালো লাগে না। তখন শহর ছেড়ে সভ্যতা ছেড়ে লোকালয় ছেড়ে অনেক দূরে নিরিবিলিতে যেতে ইচ্ছে করে।

ঠিক সেই সময়েই হরবনস্‌লালের কথা মনে পড়েছিল। বলেছিল, তার দেশ নিপানিয়া খুব নিরিবিলি গাঁ! সেখানে না আছে ইলেকট্রিসিটি, না আছে পাকা রাস্তা, না ড্রেন, না কিছু। একেবারে আদিম পৃথিবী নিপানিয়া। রেডিও, সিনেমা, খবরের কাগজ, মোটর গাড়ি, কিছুই এখনও সেখানে পৌঁছায় নি। হরবনস্‌লাল আরো বলেছিলো, আমি যদি তার দেশে যাই তো আমার থাকতে কোন অসুবিধে হবে না। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা নিয়ে সে তার বাড়িটা মেরামত করে নিয়েছে। টিন দিয়ে ছাদ ঢেকেছে। ক্ষেতি কিনেছে, খামার করেছে। অর্থাৎ মাথা গোঁজবার মত একটা আশ্রয়, আর মোটা খাওয়ার জোগাড় আছে।

যা ভেবেছিলাম সত্যিই তাই। অমন একখানা গ্রাম যে এখনও ইণ্ডিয়াতে থাকতে পারে তা কল্পনাও করতে পারা যায় না।

প্রথম দিকে হরবনস্‌লাল আমাকে দেখে যেন স্বর্গ পেয়ে গিয়েছিল। সে যেন আশা করে নি, সত্যি-সত্যিই আমি গিয়ে পৌঁছুব তার দেশে। সংসার বলতে বাপ আর বেটা। হরবনস্‌লাল আর কুন্দনলাল। আমি গিয়ে যেন তাদের গৌরব বাড়িয়েছি। আমাকে নিয়ে হরবনস্‌লাল ক'দিন খুব ঘোরাঘুরি করলে। বাপ-বেটায় মিলে আমাকে গ্রামের ঐশ্বর্য দেখিয়ে বেড়াতে লাগলো। ঐশ্বর্য মানে খোলা আকাশ, অবারিত চানার ক্ষেত আর নিপানি নদী। নদীর ওপারে শ্মশান।

কিন্তু দু'দিন যেতে-না-যেতেই মুশকিল হলো।

হরবনস্‌লাল অসুখে পড়লো। ভাবলাম, বুড়ো হয়েছে, অসুখ তো হবেই। আবার একদিন সেরেও যাবে।

হরবনস্‌লাল আমাকে বললে—আমার কী হবে বাবু?

আমি বললাম—তুমি অত ভাবচো কেন, শিগ্‌গির সেরে উঠবে।

—কিন্তু আপনাকে কে দেখা-শোনা করবে? আপনিও এলেন আর আমিও অসুখে পড়ে গেলাম—

—তাতে কি হয়েছে? আমার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না—

—কিন্তু আমি মারা গেলে কুন্দনলালের কী হবে বাবু, কুন্দনলালকে কে দেখবে?

বুড়ো বয়সে সব বাপের মনেই যে-দুর্ভাবনা হয়, হরবনস্‌লালেরও তাই হয়েছিল। কুন্দনলালের কেউ নেই যে তাকে দেখবে। সবে তখন বারো বছর বয়েস তার। কুন্দনলালও বাপ বলতে অজ্ঞান। ছোটবেলা থেকেই বাপকেই সে একমাত্র নিজের বলে জানে। আমিও অভয় দিলাম, হরবনস্‌লালকে যে, সে এখনও অনেকদিন বাঁচবে। আর তেমন কিছু হলে আমি তো আছি। আমিই কুন্দনলালকে দেখবো। আমিই সাহেবকে বলে রেলেতে কুন্দনলালের নোকরি করে দেব। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক বোঝালাম। শুনেই আরাম পেয়ে হরবনস্‌লাল চোখ বুজলো। আর সেই রাত্রেই হরবনস্‌লাল মারা গেল।

আমার অবস্থা সত্যিই কাহিল হয়ে উঠলো।

কোথায় আমি এসেছিলাম নিরিবিলিতে কিছুদিন কাটাবো বলে, তা নয়, সেই কুন্দনলালকেই তখন আমার ঠাণ্ডা করবার পালা। আশে-পাশের বাড়ির কিছু লোকজন খবর পেয়ে এল। আমি নতুন লোক। বিদেশ বিভুঁই। আর ওদের সমাজের নিয়ম-কানুন কিছুই জানি না। কোথায় ডাক্তার, কোথায় শ্মশান, তাও জানি না। কোথায় কাঠ, কোথায় পুরুত তাও আমার অজানা। টাকাকড়ি আমার সঙ্গে ছিল। সেজন্য আমার ভাবনা ছিল না। কিন্তু এ-সব ব্যাপারে টাকাটাই তো

সব নয়। শুধু টাকা ঢাললেই তো আর মৃতদেহ সৎকার করা যাবে না। আর সবচেয়ে মুশকিল হলো কুন্দনলালকে নিয়ে; সে বাবার নিষ্প্রাণ দেহটাকে জড়িয়ে ধরে রইল। কিছুতেই আর তাকে ছাড়বে না। সবাই মিলে তাকে ধরে রইল।

কিন্তু মৃত্যু তো কারো হুকুম মানবার গোলাম নয়। মানুষকে যখন মৃত্যু এসে ধরে তখন সে আর বড়লোক গরীবলোক বিচার করে না। কার কী কাজ বাকী রইল তা দেখবারও দায় নেই তার। তাকে স্বীকার করে নিতে হয়। স্বীকার করে নেওয়াই স্বাস্থ্যকর।

এ-সব কথা আমি বুঝলেও কুন্দনলালকে বোঝানো বৃথা। . এ বোঝাবার জিনিসও নয়। কেবল যার হয়েছে সেই বুঝতে পারে। গ্রামের দু'চারজন লোক যারা এসেছিল, তারা ছেলেটাকে তাদের নিজেদের ভাষায় অনেক বোঝাতে লাগলো। বুড়ো হলে সকলেরই বাপ মারা যায়, একদিন সকলকেই মরতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক আজে-বাজে কথা।

শেষ পর্যন্ত সেই রাত্রে নিপানির ধারে শ্মশানে নিয়ে গেলাম হরবনস্‌লালকে।

হরবনস্‌লালকে কত বছর দেখে আসছি। সেই সব কথা মনে আসছিল। শ্মশানে গেলে যে-সব কথা মনে আসা স্বাভাবিক সেই সব সাময়িক বৈরাগ্যের কথাই সকলের মনে আসে। হরবনস্‌লাল মানুষটা সত্যিই ভালো ছিল। বড় সৎ, বড় বিনয়ী, বড় ভদ্র, বড় অল্পে তুষ্ট। রেলের চাকরিতে এমন একটা বড় দেখা যায় না। সেই তারই মধ্যে হরবনস্‌লাল নিজের সততার জোরে এতদিন চাকরি করে এসেছে মাথা উঁচু করে এটা কম কথা নয়।

চারিদিকে শাঁ শাঁ ফাঁকা মাঠ। দূরে আকাশের গায়ে জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মত সার-সার পাহাড়। আর সামনে হরবনস্‌লালের চিতাটা দাউ-দাউ করে জ্বলছিল। আর আমি সেই বিদেশ-বিভুঁই-এর শ্মশানের এককোণে কুন্দনলালকে কোলে নিয়ে চুপ করে বসে ছিলাম। মনে

আছে সান্ত্বনা দেবার ভাষা পর্যন্ত সেদিন খুঁজে পাই নি আমি। মাত্র বারো বছর বয়েস।

আশে-পাশে আশ্রয় পাবার মত কেউ নেই তার! একমাত্র আমিই বলতে গেলে সেদিন তার পরম আত্মীয়। আর যারা শ্মশানে গেছে তারা শুধু শেষ কর্তব্য করতে গেছে! কর্তব্য শেষ করে তারা আবার যে যার বাড়ি চলে যাবে। তখন কুন্দনলালকে একলাই এই কুটিল পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার নিজের অস্তিত্বের জন্যে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হবে। তখন তার আশে-পাশে কেউ থাকবে না। যারা তার মৃত বাপকে শ্মশানে নিয়ে গেছে তারাই হয়তো আবার তার বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা করে তার জমি, তার ক্ষেত, তার বাড়ি, সব দখল করে নেবে। এই-ই হয়, এই-ই হয়ে আসছে, এই-ই হবে চিরকাল।

কুন্দনলাল তখনও আমার বুকে মুখ লুকিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ করে কাঁদছিল। আমি তার মাথার মধ্যে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। আর কিছুক্ষণ পরেই হরবনস্‌লালের মরা দেহটা ছাই হয়ে যাবে, তারপর আমি কুন্দনলালকে নিয়ে তার ফাঁকা বাড়িতে ফিরে যাবো।

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটলো। অভাবনীয় কাণ্ড।

বোধহয় জন-বারো লোক অন্যদিক থেকে একটা মৃতদেহ আনছিল। সাধারণত মৃতদেহ আনবার সময় যে ধরণের গোলমাল হয়, সমবেত চিৎকার হয়। এ যেন অন্য রকম। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা মেয়েলি গলার আর্তনাদ।

আমি কুন্দনলালকে নিয়ে উঠলাম। যারা এলো তারা বেশ দলে ভারি। কিন্তু মনে হল আকণ্ঠ মদ্যপান করেছে। দুর্গন্ধে তাদের কাছে টেঁকা যায় না। তারা চিতার আয়োজন করতে লাগলো। তার মধ্যে একটি মেয়েকে সবাই ধরে শান্ত করবার চেষ্টা করছে। মেয়েটা যতবার ছাড়া পেতে চাইছে ততবার তারা জোর করে ধরে রাখছে।

আমি বুঝলাম, মেয়েটি সদ্য বিধবা হয়েছে। স্বামীর শোকে অধীর! অবশ্য এটাও স্বাভাবিক। শ্মশানে এ-রকম বিচিত্র ঘটনা অনেকবার

অনেকে দেখেছে। এ দৃশ্য যে দেখেছে একবার, কেবল সেই এর মর্মন্তুদ দিকটা উপলব্ধি করতে পারবে।

কুন্দনলালও বোধহয় এই দৃশ্য দেখে খানিকটা আত্মস্থ হয়ে এসেছিল। সে বোধহয় বুঝতে পেরেছিল যে শোক শুধু তার একলার নয়। তার একার শোক অন্যের মধ্যে দেখে কিছুটা সান্ত্বনা পেয়ে চুপ করে গিয়েছিল।

কিন্তু তারপর যে ঘটনা ঘটলো তা দেখে আর চুপ করে থাকতে পারলাম না।

দেখি চিতাটা যখন তৈরী হয়ে গেছে, তখন হঠাৎ হৈ-চৈ গোলমাল চেঁচামেচি শুরু হল।

আর স্থির থাকতে পারলাম না। সোজা গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে তোমাদের ?

ওদের ভাষাও ভাল বুঝি না। তার ওপর মদে চুর হয়ে আছে।

আমাদের দলেরই একজন বললে—হুজুর ওই বেলমোতিয়া—

মেয়েটার কিন্তু সেদিকে কান নেই। সে তখন জ্বলন্ত চিতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে সকলের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছে।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম—ওকে ধরে রেখেছ কেন ?

—হুজুর ও "সতী"-হবে। ওর মরদের সঙ্গে পুড়ে মরবে—

—কেন ?

ওরা যে-সব উত্তর দিচ্ছিল, আমাদের দলের লোকেরা তা আমাকে স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

ব্যাপারটা যে ঐ রকম একটা কিছু তা আমি আগেই একটু অনুমান করতে পেরেছিলাম। এবার আরো খোঁজ-খবর নিতে লাগলাম। ওর নাম বেলমোতিয়া। নিপানিয়ার পাশের গ্রামে থাকে। ওর মরদের নাম দুখমোচন। বেশ সুন্দর স্বাস্থ্যবান মানুষটা ছিল। স্বামী-স্ত্রীতে খুব সদ্ভাবও ছিল। একজনকে ছেড়ে আর একজন নাকি কখনও থাকতে পারতো না, এমনই প্যায়ার ওদের। ছেলে-মেয়ে কেউ নেই। এমন কি

ছ'জনেরই শ্বশুর-শাশুড়িও কেউ নেই। এমন দুখমোচনের দুঃখে বেলমোতিয়া প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়বার অবস্থা। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একেবারে নিঃসহায় হয়ে পড়েছে।

লোকগুলো দেখলাম, সত্যিই মদে একেবারে চুর।

একজন বললে—হুজুর, ও যদি পুড়ে মরতে চায় তো আমাদের কী হুজুর?

আর একজন বললে—আমরা মানা করেছি হুজুর, ও শুনবে না কিছুতেই—

সবাই ওই এক-কথাই বলতে লাগলো। কিন্তু মনে হলো সবাই যেন মজাটাও দেখবে মনে মনে। এ-রকম দেখবার জিনিস তো রোজ রোজ মেলে না কোথাও। বিশেষ করে নিপানিয়ার মত অজ্ পাড়াগাঁয়ে। এদেশে সকাল বেলা সূর্য ওঠে, তারপর থেকে মাঠে আর ক্ষেতে কাজ করতেই বেলা পুইয়ে যায়, আর তারপর সূর্য ডুবে যায়। এমনিই চলে দিনের পর দিন। হঠাৎ তারই মধ্যে বৈচিত্র্য আসাতে যেন সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে।

যারা এতক্ষণ কাঠ সাজাচ্ছিল তারা দুখমোচনকে চিতায় তুলে দিলে।

আর সঙ্গে সঙ্গে বেলমোতিয়া নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চিতায় গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। লোকগুলো তাকে ধরতে গেল না। একজন চিৎকার করে উঠলো—কালী মাঈ কি জয়—

'জয়' কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে দলের অন্য লোকরাও দোহার দিয়ে উঠলো—জয় !!!

সারা শ্মশান তখন বেশ গুলজার হয়ে উঠেছে। একজন বেশ সকলের সামনেই একটা মদের হাড়ি থেকে হুড়-হুড় করে মদ ঢালতে লাগলো গলায়।

বেলমোতিয়া তখন চিতায় উঠে দুখমোচনকে জড়িয়ে ধরেছে। ধরে সেই মড়ার সঙ্গেই যেন কথা বলতে শুরু করে দিলে। এ যেন

তাদের বিয়ের রাত। এ যেন ফুলশয্যায় শুয়ে স্বামী-স্ত্রীর একাকার হওয়া। শ্মশানে যে আমরা এতগুলো চেনা-অচেনা লোক রয়েছি এ যেন বেলমোতিয়ার খেয়ালই নেই। সে তখন তার স্বামীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছে। সে যেন তার স্বামীকে ফিরে পেয়েছে। সে তার স্বামীর মৃত্যু-পথের সহযাত্রী হয়ে বেহুলার মত তার লখীন্দরকে যেন পুনর্জীবন দিয়েছে।

একজন কোত্থেকে এসে কী সব মন্ত্র পড়তে লাগলো। আর একজন কোত্থেকে একটা ঢোল এনে ঢাঁই ঢাঁই করে বাজতে লাগলো। অন্য লোকগুলোরও তখন নাচ পেয়ে গেছে। তারা নাচতে সুরু করে দিলে। সে এক বীভৎস কাণ্ড।

আমাদের দলের যারা তারাও বোধহয় কিছু ভাগ পাবার আশায় কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের হরবনসলালের চিতাটা তখন প্রায় নিবু-নিবু অবস্থা।

আমি আর থাকতে পারলুম না।

কুন্দনলালের হাতটা ছেড়ে দিয়ে সোজা গিয়ে চিতার ওপরে লাফিয়ে উঠেছি। আর সঙ্গে সঙ্গে বেলমোতিয়ার হাত ধরে টেনে তাকে নীচেয় নামিয়ে এনেছি। তখন তার চরম অবস্থা। কাপড়েরও ঠিক নেই খোঁপারও ঠিক নেই। বেলমোতিয়া যেন তখন আর এই মরজগতেই নেই।

বেলমোতিয়াকে নামিয়ে নিয়েই একটা লোককে চিতায় আগুন দিতে বলে দিলাম।

অন্য লোকদের আপত্তিতে বেলমোতিয়া বিশেষ কান দেয় নি, কিন্তু আমাকে অচেনা লোক দেখে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। তারপর একপলক দেখে নিয়েই আবার হাত-পা ছুঁড়ে চিতার ওপর ওঠবার চেষ্টা করলে।

আমি এক ধমক দিলাম—থামো—

বেলমোতিয়া ঠিক এমন হুকুম আমার মুখ থেকে আশা করে নি।

সেই অবস্থাতেই আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

আমি বললাম—চিতায় উঠলেই তোকে পুলিশে ধরিয়ে দেব—

তারপর অন্য সকলের দিকে চেয়ে বললাম—আর তোদেরও সকলকে পুলিশের হাতে তুলে দেব—

সামনের লোকটা হাত জোড় করে বললে—না হুজুর, আমরা ওকে মানা করেছিলুম ও শোনে নি কিছুতে—

আরো যে-কজন লোক ছিল তাদের নেশা তখন মাথায় উঠেছে।

বললে—হুজুর, আমরা কিছু জানি না, আমরা কোনও কসুর করি নি—

এবার সবাই আমার পায়ে ধরতে এল। আমার এক হাতে বেল-মোতিয়া। তাকে একটা হাত দিয়ে গায়ের জোরে ধরে রেখেছি।

অন্য হাতে তাদের সকলকে পা ছুঁতে বারণ করলাম। বললাম—চল, সবাই থানায় চল আমার সঙ্গে।

—হুজুর, আমাদের রেহাই দিন হুজুর।

বেলমোতিয়াটা কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে তখন প্রাণপণে আমায় হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইছে। জোয়ান মেয়েমানুষ। তার ওপর তার স্বামী মারা গেছে। কেঁদে চোখ-মুখ ফুলিয়ে ফেলেছে। তার জোরের সঙ্গে আমি পারবো কেন? আর সত্যিই তো, স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর অসহায় অবস্থা অনুভব না করতে পারলেও কিছুটা তো অন্তত বুঝতে পারি। কিন্তু আমার যত রাগ ওই লোকগুলোর ওপর, যারা মজা দেখবার জন্যে এই যতদূর শ্মশান পর্যন্ত এসেছে। আর হয়ত বেলমোতিয়ার ঘাড় ভেঙেই ভাঁটিখানা থেকে মদ গিলেছে। আর এখন শ্মশান শবদাহ করবার নাম করে মজা দেখতে এসেছে।

আমি ধমক দিয়ে আবার বললাম—চলো, সবাইকে একসঙ্গে হাজতে পুরবো—

বেলমোতিয়া এবার এক কাণ্ড করলে। হঠাৎ আমার অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে আমার হাতে এক কামড় বসিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু বোধহয় ভাগ্যটা ভাল ছিল। আমি যদি যন্ত্রণায় হাতটা ছেড়ে দিতাম তো সঙ্গে সঙ্গে সে চিতায় গিয়ে লাফিয়ে উঠতো। চিতা তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে। তখন আর তাকে বাঁচাতে পারতাম না।

—ছাড় আমাকে ছাড়—

সেদিনকার সেই বেলমোতিয়ার চেহারা। সেই আচরণ আমার আজও মনে পড়ে। মনে পড়ে সেই এলোমেলো এক মাথা রুক্ষ-চুল, সেই আলুথালু কাপড় আর সেই নিপানিয়ার মাঝরাতে শ্মশান। যেন বীভৎস ভয়াল অবস্থার মধ্যে একদিকে একদল মজা-লোভী অশিক্ষিত মাতাল চাষা।

আমার কথা শুনে বোধ হয় বেলমোতিয়ার শ্মশান-বন্ধুরা—মনে মনে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল। চেয়ে দেখলাম তাদের সবাই একে একে নিঃশব্দে কখন গা-ঢাকা দিয়েছে। বেলমোতিয়াও বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলো তার দলের কেহই সেখানে আর নেই।

আমি তখন তাকে বোঝাতে লাগলাম—সে মারা গেছে—তার সঙ্গে এক চিতায় পুড়ে মরে কোন লাভ নেই। পৃথিবীতে একদিন সবাই মারা যাবে। শুধু কেউ আগে আর কেউ বা পারে। মানুষ এ পৃথিবীতে শুধু কিছুদিনের জন্যে এসেছে। তারপর তার কাজ শেষ হোক না হোক তাকে একদিন চলে যেতেই হয়। এর জন্য—কেঁদেও কোন ফল হয় না, প্রাণপাত করেও উপকার হয় না কারো। প্রাণ দেবার ক্ষমতা যেমন মানুষের নেই, প্রাণ নেবার ক্ষমতাও তেমনি বে-আইনী ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক ছেঁদো কথা।

কিন্তু বুঝতে পারলুম, বেলমোতিয়ার কানে কোনও কথাই যাচ্ছে না। এবং না যাওয়াটাই স্বাভাবিক! সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে চোখে কাপড় চাপা দিয়ে এক নাগাড়ে কেঁদে চলেছে। একবার দুখমোচনের জ্বলন্ত চিতাটার দিকে চায় আর কেঁদে ওঠে। বোধহয় তার সমস্ত পুরোনো কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে। একদিন তাদের বিয়ে হয়েছিল। একসঙ্গে একঘরে, এক ক্ষেতে তারা কাজ করেছে। বর্ষায় শীতে গ্রীষ্মে

তাদের জীবন একই খাতে কেটেছে। সেই সমস্ত অতীতের স্মৃতির ওপর তখন আগুন জ্বলছে। আর কিছুক্ষণ পরে দুখমোচনের শেষ চিহ্নটুকুও নিঃশেষ হয়ে আকাশে বাতাসে মিলিয়ে যাবে।

মনে আছে অনেকক্ষণ কথা বলার পর যেন বেলমোতিয়া একটু শান্ত হলো।

দুখমোচনকে যারা শ্মশানে বয়ে নিয়ে এসেছিল তারা ততক্ষণে পুলিশের ভয়ে সরে পড়েছে। তাদের একজনকেও আর তখন আশেপাশে কোথাও দেখা গেল না।

আস্তে আস্তে দুখমোচনের চিতাটাও নিবে এল। দুঃখমোচনের শেষকৃত্য আমিই সম্পন্ন করলাম শেষ পর্যন্ত। কী জানি কী হলো, বেলমোতিয়া আমাকেই যেন তার পরম নির্ভরস্থল হিসেবে মেনে নিয়েছিল। আমার একটা কথাতেও তখন আর আপত্তি করলো না।

আমি নদী থেকে মাটির কলসী করে জল নিয়ে আসতে বললাম। নিঃশব্দে জল নিয়ে এল।

বললাম—চিতার ওপর জল ছিটিয়ে দাও নিজের হাতে—

চিতাটা যখন সম্পূর্ণ নিভে গেল, তখন বেলমোতিয়া আবার আমার কাছে এসে দাঁড়াল। যেন আমি ছাড়া তখন কারো কাছে দাঁড়াবার জায়গাই নেই।

আমাদের দলের ধনীরামকে জিজ্ঞেস করলাম—বেলমোতিয়ার বাড়িতে কে আছে আর?

ধনীরাম বললে—এর আর কেউ নেই হুজুর—

শ্বশুর কী শাশুড়ী?

—না, তারা অনেকদিন আগে মারা গেছে।

—দেওর কি ননদ?

—তাও নেই হুজুর।

—বেলমোতিয়ার নিজের বাপ-মা, ভাই কি বোন, তারা?

—না, হুজুর কেউ কোথাও নেই ওর, সেই জন্যেই তো পুড়ে মরতে

যাচ্ছিল।

ভারি ভাবনা হতে লাগল বেলমোতিয়ার জন্যে। এই অজ গণ্ড-গ্রামের কোথায় কার কাছে কার হাতে বিশ্বাস করে ছেড়ে দিয়ে যাব এই অনাথা বিধবাটাকে?

—জমি-জমা কিছু নেই ওর?

—হ্যাঁ হুজুর তা আছে। কিন্তু বিধবার সম্পত্তি কি আর থাকবে? কে হয়ত ঠকিয়ে সব হাত করে নেবে!

সত্যিই মুশকিলে পড়ে গেলাম। রাত তখন শেষ হয়ে আসছে। ভোর হলেই বেলমোতিয়ার জীবনে নতুন করে নতুন সমস্যা দেখা দেবে। কাল আবার সূর্য উঠবে পৃথিবীতে। আবার সংসার তার পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নেবে। সংসার তার নিজের নিয়মেই চলবে। কে এল, কে গেল, কে মরলো, কে বাঁচলো তা দেখবার দায়-দায়িত্ব নেই। তখন কোথায় থাকবে এই কুন্দনলাল আর কোথায় থাকবে এই বেল-মোতিয়া, তাও কেউ খোঁজ রাখবার সময় পাবে না। আর আমি? আমিই বা কোথায় থাকবো বা থাকবো কিনা তা-ই বা কে বলতে পারে। আমি এসেছিলাম নিপানিয়াতে দুদিন বিশ্রাম করতে। এই দুদিনের মধ্যেই মহাকালের অমোঘ-লীলা চোখের সামনে দেখে গেলাম। এইটেই আবার পরম লাভ বলে মনে হলো। এর বেশি কিছু চাইবারও যেন রইল না তখন। তখন মনে হল এর বেশি যেন কিছু চাইতে নেইও।

ধনীরাম আমার দিকে চেয়ে বললে—আপনি যাবার আগে একটা কিছু বিহিত করে দিয়ে যান হুজুর—

কিন্তু আমি বিহিত করবার কে? আমার নিজের ব্যাপারই বা কে বিহিত করে?

তা অত কথা ভাববার সময়ও ছিল না।

তখন বেশ সকাল হয়েছে। বেশ স্পষ্ট মুখটা দেখতে পেলাম বেলমোতিয়ার। চরম শোকের ছাপ তখনও লেগে আছে কচি মুখখানার ওপর। আমার দৃষ্টিটা লক্ষ্য করেই বোধহয় ময়লা মোটা হাতে বোনা

দেহাতী শাড়ির আঁচলটা দিয়ে মুখখানা ঢেকে ফেললে।

আমি সান্ত্বনা দিতে গেলাম। বললাম—তুমি ভেবো না বেল-মোতিয়া, তোমার একটা কিছু ব্যবস্থা করে তবে আমি যাবো—ধনীরামও বেলমোতিয়াকে বুঝিয়ে বললে—হুজুর আমাদের রেলের বড় অফিসার। তোর একটা ব্যবস্থা করে যাবেনই—

তখন শ্মশানে আস্তে আস্তে আরো কয়েকটা মৃতদেহ আসতে শুরু করেছে। গত রাত্রের অন্ধকারে যে শোক উত্তাল উদ্দাম হয়ে সমস্ত শ্মশান-ভূমিকে আলোড়িত করে তুলেছিল, এখন দিনের আলোর রুক্ষতার স্পর্শ পেয়ে তা যেন ক্রমেই স্তিমিত হয়ে এল। আমি আর ধনীরামরা মিলে বেলমোতিয়াকে তার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে এলাম। খাঁ খাঁ করা বাড়ি, বাড়িটার মধ্যে ঢুকেই বেলমোতিয়া আবার কান্নায় ভেঙে পড়লো। আশেপাশের প্রতিবেশীদের কয়েকজন এল। তাদের বলে এলাম বেলমোতিয়ার দেখাশুনা করতে। তারপর কুন্দনলালকে নিয়ে হুরবনস্‌লালের বাড়ি চলে এলাম।

সেখানেও সেই একই শোক একই শূন্যতা!

কুন্দনলাল বাড়িতে ঢুকেই হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো। আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো—সাহেব আমাকে ছেড়ে চলে যাবেন না হুজুর, আমি আপনার সঙ্গে যাবো!

কী মুশকিল! আমি বললাম—আমার সঙ্গে তুই কোথায় যাবি কুন্দনলাল। আমার নিজেরই কি থাকবার বাঁধা ঠাঁই আছে? আমার বদলির চাকরি।

কুন্দনলাল বললে—আমি আপনার সঙ্গে থাকবো হুজুর, আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেখানে যাবো।

ছোট ছেলে! সে বোঝে না যে আমি তার কেউ নই, ঘর-বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই সারাজীবন আমি ছটফট করে ঘুরে বেড়াই।

তবু কিছুতেই কুন্দনলাল আমার কথা শোনে না। আমার পা জড়িয়ে ধরে রইল!

শেষে একটা মতলব বার করলাম।

সেই দিনই বিকেলবেলা কুন্দনলালকে নিয়ে গেলাম বেলমোতিয়ার বাড়িতে। বেলমোতিয়ারও তখন সেই অবস্থা। সেও সারাদিন কিছু রান্না করে নি, খায় নি, জল স্পর্শও করে নি। পাড়ার লোক যারা এসেছিল, তারা বললে—সারাদিন কেবল কেঁদেছে হুজুর, আমাদের কথা মোটে শোনে নি—

আমি বেলমোতিয়ার কাছে গিয়ে বসলাম।

বললাম—আমার একটা কথা রাখো বেলমোতিয়া, তোমারও কেউ নেই কুন্দনলালের কেউ নেই—এক বাপ ছিল, তাও গিয়েছে। আমি বলি কুন্দনলালকে তুমি তোমার নিজের ছেলের মত মানুষ করো—ছেলে থাকলে তুমি ত আর মরতে পারতে না। মনে করে নাও না কুন্দনলাল তোমার ছেলে—

পাশে দাঁড়িয়ে যারা শুনছিল তারাও কথাটা সমর্থন করলে।

প্রস্তাবটা সকলেরই বেশ মনঃপুত হলো বলে মনে হলো।

বললাম—কুন্দনলাল নিজের বাপকে হারিয়েছে, মনে করো না দুখমোচনই ওর বাপ ছিল—তুমিই ওর মা। মায়ে-ছেলেতে মিলে আবার তোমরা দুজনে মাথা তুলে বাঁচবার চেষ্টা করো না—মিছিমিছি কেঁদে কী করবে? যে গেল সে তো আর হাজার কাঁদলেও ফিরবে না। এমনি করেই তোমাদের বেঁচে থাকতে হবে! এমনি করেই সবাই বেঁচে আছে। সংসারে একটা লোক দেখাও দিকিনি যে কোন শোক পায় নি?

এসব ছেঁদো-কথাতে কাজ হয় না জানি। তবে শোকের সময় এই কথাই বলতে হয়। এই কথা বলাই নিয়ম।

সেই ব্যবস্থাই সবাই স্বীকার করে নিলে সেদিন। সেদিন থেকে কুন্দনলাল সেই ছেলে হয়েই কাটাতে লাগলো। যে-কদিন ছিলাম নিপানিয়াতে সেই সম্পর্ক পাতিয়েই চলে এসেছিলাম।

এরপর কয়েক বছরের মধ্যে আমার জীবনের ওপর দিয়ে যেন কাল-বৈশাখী ঝড় বয়ে গেল। সাত বছরে সাত জায়গায় বদলি হলাম। বিলাসপুর থেকে খড়গপুর। খড়গপুর থেকে ওয়ালট্রেয়ার। ওয়ালট্রেয়ার থেকে খুরদা রোড। খুরদা রোড থেকে কলকাতা। আবার ঘুরে ফিরে কলকাতা থেকে সেই বিলাসপুর।

বিলাসপুরে এসে হঠাৎ একদিন দেখি, লেভেল-ক্রসিং-এর গেট-এ নীল পাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কুন্দনলাল। ঠিক যেমন করে দাঁড়িয়ে থাকতো হরবনস্‌লাল।

আমি ট্রলি করে যাচ্ছিলাম। কুন্দনলালকে দেখে থেমে গেলাম।

কুন্দনলালও আমাকে দেখতে পেয়েছে। আমাকে দেখেই সেলাম করলে সে।

জিজ্ঞেস করলাম—তুমিই কুন্দনলাল না?

কুন্দনলাল বললে—হ্যাঁ হুজুর, হ্যারিস সাহেবকে ধরে আমি আমার বাপের জায়গায় নোক্‌রি পেয়েছি—

তোমার দেশের খবর কী? নিপানিয়া? জমি-জমা সব কে দেখছে?

—হুজুর, গেল বছরে গরমিতে ক্ষেতি-খামার সব শুকিয়ে গেল, তাই দেশ ছেড়ে চলে এসেছি, এবার ছুটি পেলে আবার জমি-জমা দেখতে যাবো।

তখন বলি বলি করেও বলতে কেমন সঙ্কোচ হচ্ছিল। শেষকালে আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করে ফেললাম—আর বেলমোতিয়া?

কুন্দনলাল বললে—ওইতো—

বলে আমাকে তার গুমটি ঘরটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখালে।

দেখলাম ছোট গোল ছাদ-ওয়ালা গুমটি ঘরের সামনে ছেলে কোলে একটা বউ দাঁড়িয়ে আছে—চিনতে পারলাম না ঠিক।

কুন্দনলালই আমাকে সঙ্গে করে গুমটির সামনে নিয়ে গেল। এই কি

সেই বেলমোতিয়া ? কিছুতেই চিনতে পারলাম না। মাথার সিঁথিতে তেল সিঁদুর লেগে রয়েছে। আমি কিছুতেই সেদিনকার সেই পুরোন বেলমোতিয়াকে তার মধ্যে খুঁজে পেলাম না। তার ওপর মাথায় সিঁদুর। তবে কি বেলমোতিয়া আবার বিয়ে করেছে। যে একদিন মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় উঠে 'সতী' হতে চেয়েছিল সে আবার বিয়ে করলো নাকি শেষ পর্যন্ত ? কাকে ?

আমি বোধহয় মনের বিস্ময় আর চেপে রাখতে পারি নি।

জিজ্ঞেস করে ফেললাম—তোমার কি আবার বিয়ে হয়েছে নাকি বেলমোতিয়া ?

মনে মনে সত্যিই খুসী হয়েছিলাম এই ভেবে যে, যাক্, বেলমোতিয়া যে তার দুখমোচনকে ভুলতে পেরেছে, সেটা ভালই হয়েছে। কারণ ভুলে যাওয়াটাই তো স্বাস্থ্যকর।

কুন্দনলালই আমার ভুল ভেঙে দিলে।

বললে—না হুজুর, সাদি করতাম না আমরা ; কিন্তু আমাদের ওই ছেলেটা হবার পরই নিপানিয়ার সব লোক আমাদের একঘরে করে দিলে, আমাদের ধোপা-নাপিত বন্ধ করে দিলে, তাই সাদি করে ফেললাম। বেলমোতিয়া নিজেই যে আমাকে সাদি করে নিতে বললে !

আমার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নি। দেখলাম, কুন্দনলালও কথাটা বলে বেশ হাসছে। বেলমোতিয়াও একটু লজ্জার হাসি হেসে কোলের ছেলেটাকে নিয়ে নিচু হয়ে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে। কাণ্ডটা দেখে আমি তখন এমন হতবাক হয়ে গিয়েছি যে, আশীর্বাদ করার সহজ কথাটাও যেন আমি একেবারে ভুলে গেলাম। তখন আমি হাঁ করে শুধু বেলমোতিয়ার মুখের দিকে চেয়ে নিস্পন্দ হয়ে দেখছি।

●

সম্পর্ক

বিমল কর

দুধের কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে অনিলা সামনের চেয়ারটায় বসল। শৈলেশ বলল, "আজ আবার কে এসেছিল ? তোমার কোন ফ্রেণ্ড ?"

কথাটার অর্থ বুঝতে অনিলার দেরী হল ; তাকিয়ে তাকিয়ে খাবার ধরন দেখল শৈলেশের। ডিমের তরকারি মুখে দিয়েই রেখে দিয়েছে শৈলেশ ; চারটে মাত্র পাতলা রুটি, অতি কষ্টে যেন তার দু'টো খেয়েছে। শীত পড়ায় ক'দিন থেকে বাঁধাকপির পাতা, গাজর-বিট, টমাটো এইসব সবজি দিয়ে সুপ্ না স্টু খাবার বাতিক হয়েছে, নিয়মিত দু'বেলা অনিলাকে রেঁধে দিতে হয়, সেই স্টু-এর বাটিটাও ছুঁয়েছে কি ছোঁয় নি, ভাজাভুজি কিছু মুখে দিয়েছে !

অনিলা প্রায় নিঃসন্দেহ হল, বাতিক-গ্রস্ত মানুষ হলেও কোথাও কারও পাল্লায় পড়ে কিছু খেয়েছে এখন মুখে রুচছে না, অগত্যা একটু অছিলা করার চেষ্টা। জবাবে অনিলা বলল, "আমার কে এসেছিল তা নিয়ে তোমার কি। তোমার যা বলার বলো।"

শৈলেশ অক্লেশে বলল, "ডিমে ভয়ংকর নুন—পুড়ে গেছে।"

"তোমার ওই স্টু নাকি ছাই ওটায় বুঝি খুব ঝাল হয়েছে ?"

"ওটা অখাদ্য, টেস্টলেস…"

"রুটি ?"

শৈলেশ আর রুটির খুঁত বর্ণনা করল না ; বলল, "তোমার কোনো জিনিসে মন নেই। রান্না করতে বসে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গল্প জুড়লে এই রকমই হয়।"

অনিলা অনেকক্ষণ যাবৎই অসন্তুষ্ট, এবারে বিরক্ত হল। রাগের গলায় বলল, "তুমি কাকে কি শেখাও। আমি কচি খুকি নাকি !"

"তোমায় কে শেখাবে।" শৈলেশ অনেকটা যেন উপহাসের স্বরে বলল, বলে জলের গ্লাস মুখে তুলল।

অনিলা আরও রাগল। বলল, "তোমার মুখে এখন কিছুই রুচবে না।"

শৈলেশ কথাটা গায়ে মাখল না, দুধের কাপ টেনে নিল। তারপর নিতান্ত যেন পরিহাস করছে, বলল, "কে এসেছিল আজ?"

"কেউ না। আমার আর কে কবে আসে?"

"কেন, সেদিন যে কোন্ বন্ধু এল।"

"বন্ধু নয়, প্রতিবেশী। দয়া করে এসেছিল।"

শৈলেশ দুধের কাপ মুখে তুলল। বেশ গরম।

অনিলা অল্পক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল—শেষে তার কালো নরুনপাড় থান-ধুতির আড়াল থেকে বাঁ হাত বের করল। হাতের মুঠোয় একটা পোস্ট-কার্ড। আলোয় সেই চিঠি সামান্য মেলে ধরে শৈলেশের দিকে ঠেলে এগিয়ে দিল।

শৈলেশ বুঝল না, বলল, "কি?"

"চোখ আছে, দেখ। সুখবরই পাবে।"

পোস্টকার্ড তুলে নিয়ে শৈলেশ তার নাম ঠিকানা দেখল। অপরিচিত হস্তাক্ষর। চিঠির আধখানাও পড়া হয়নি, তার মুখে কেমন একটা বিব্রত আড়ষ্ট ভাব ফুটে উঠল। মুখ তুলে পলকের জন্যে দেখল অনিলাকে, অনিলা স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে বাকি চিঠিটা অতি দ্রুত পড়ে নিয়ে শৈলেশ কেমন সঙ্কুচিত, লজ্জিত ও অস্থির হয়ে বলল,—"বা, এ তো বেশ রসিকতা!—কে এই রসিকতা করল!"

"তুমিই জানো।" অনিলা শুকনো গলায় ছোট করে জবাব দিল।

"আমি কিছু জানি না।" শৈলেশ খুব জোর গলায় প্রতিবাদ করল। তারপর যেন তার কিছু মনে পড়ে গেল, বলল, "এ নিশ্চয় শিবদাস কিংবা মজুমদারের কাণ্ড। সেদিন হাসি-ঠাট্টা হচ্ছিল, ওরাই কেউ করেছে।...

ননসেন্স। ছি ছি, ভদ্রলোক কি ভাববেন।"

"ভাববার কি আছে! তিনি তো খুশীই হবেন।" অনিলা পাল্টা জবাব দিল।

শৈলেশ দু'পলক অনিলার মুখ দেখল। অনিলার এই বাঁকা পরিহাস তার পছন্দ হল না, ভাল লাগল না, বলল, "কে খুশী হবে না হবে তাতে আমার কিছু আসে যায় না।" বলে সামান্য থেমে, যেন তৃতীয় জন কাউকে শোনাচ্ছে, বলল, "আমার আর কাজ নেই, কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে বিয়ের চিঠি লিখব! পঁয়তাল্লিশ বছরে বিয়ে! ছেলেমানুষি করার বয়স আমার নেই।"

"বয়েস না থাক, সাধ তো হতে পারে।" অনিলা যেন ঠোঁট জুড়ে হাসল।

শৈলেশ প্রথমে কিছু বলল না, তারপর বলল, "তা পারে," বলে গম্ভীর হয়ে গেল। দুধের কাপের ওপর চোখ রেখে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল, নিশ্বাস ফেলল, তারপর বলল, "সাধ মেটাবার ইচ্ছে থাকলে আরও আগে মেটাতে পারতাম।"

অনিলা আর কিছু বলল না।...

কিছু সময় পরে শৈলেশের শোবার ঘরে হাতের ক'টা খুচরো কাজ সারতে এল অনিলা। জলের গ্লাস রাখল; সকালে মাঝে মাঝে ফ্রুট সল্ট খায় শৈলেশ, গরম জলের ফ্লাস্ক, কাচের গ্লাস, চামচ গুছিয়ে রেখে দিতে হয়। অনিলা একে একে সব গুছিয়ে রাখতে রাখতে শৈলেশকে

সাবেকী ইজিচেয়ারে শুয়ে একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছে শৈলেশ, বাঁ হাতের আঙুলে সিগারেট। বইটা কিসের অনিলা বলে দিতে পারে, সস্তার ইংরেজী গোয়েন্দা বই।

অনিলার মনে হল, শৈলেশ বেশ কিছুটা ক্ষুণ্ণ; বই পড়ছে বলে মনে হয় না, পাতা ওল্টাচ্ছে কিংবা অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে আছে! উত্তরের জানালাটা বন্ধ করে দিল অনিলা, বিছানার মোটা চাদরটা

উঠিয়ে পাট করে পায়ের কাছে রাখল, হাত দিয়ে সাদা চাদরের ভাঁজ ভেঙে দিল, ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে রাখল। পায়ের দিকে পাতলা কম্বল, আর ক'দিন পরেই লেপ চাইবে ; কম্বলটা খুলে রাখল অনিলা।

"তা তুমি একটা বিয়ে করোই না ; এখনও বেলা বয়ে যায় নি।" অনিলা ঠাট্টা করে বলল, বলে বিছানার একপাশে বসল।

শৈলেশ কথার জবাব দিল না।

সামান্য অপেক্ষা করে আবার বলল অনিলা, "কি, কথা বলছ না যে!"

হাতের বই মুড়ে শৈলেশ জবাব দিল, "বাজে কথায় কি লাভ!" ও হাই ওঠানোর মতন মুখ হাঁ করল, হাত উঠিয়ে আলস্য ভাঙল। অর্থাৎ যেন অনিলাকে বোঝাতে চাইল তার ঘুম পেয়েছে, সে ঘুমুবে, এবার তুমি যাও।

অনিলা উঠল না ; হাসল, চাপা হাসি। বলল, "রাগ করেছ?"

"না ; কিসের রাগ!" শৈলেশ সিগারেটের শেষ টুকরোটুকু ঠোঁটে ঠেকিয়ে শান্ত গলায় জবাব দিল।

"তোমার এই রাগের মানে হয় না।...চিঠিটা ডাকে এসেছে, আমি তোমায় দিয়েছি ; তোমার অফিসের বন্ধুরা কে কি ঠাট্টা রসিকতা করেছে আমার কি তা জানার কথা!" অনিলা নরম করে বলল।

"চিঠির জন্যে আমি তোমায় কিছু বলি নি।"

"বেশ বলো নি।...এখন আমি যা বলছি তাই শোনো।...এখনও তোমার বিয়ের বয়স পেরিয়ে যায় নি। সত্যি, একটা বিয়ে করে ফেল।"

শৈলেশ কোনো কথা বলল না, সিগারেটের টুকরো ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। শুতে যাবার আগে সে এলার্ম ঘড়িতে দম দেয়, বরাবরের অভ্যেস। টেবিল থেকে ঘড়িটা তুলে নিয়ে দম দিতে লাগল।

অনিলা কয়েক দণ্ড বিছানার ওপর হাসিমুখেই বসে থাকল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাল্কা গলায় বলল, "যা বললাম, ভেবে দেখো—।"

শীত তেমন কিছু না, নভেম্বরের মাঝামাঝি ; তবু এই শীতের শুরুতে

কেমন করে ঠাণ্ডা লেগেছিল! কাল সারাদিন গায়ে-হাতে ব্যথা এবং মাঝে-মধ্যেই হাঁচি হয়েছে। আজ সামান্য সর্দি ভাব। হয়ত তাই চোখ জ্বালা করছিল, মুখ বিস্বাদ। অন্ধকারে শৈলেশ অন্যমনস্কভাবে নিজের কপাল দেখল, না গরম লাগছে না। পায়ের ওপরকার কম্বলটা কোমর পর্যন্ত টেনে নিল শৈলেশ।

অনিলা বাস্তবিক কি ভাবল, কিছু মনে করছে কি না—শৈলেশ বুঝতে পারল না। কেবল বলল, "তুমি একটা বিয়েই করো না, বেলা বয়ে যায় নি।" কথা শিখেছো খুব, কিছু বলতেই মুখে আটকায় না আজকাল, অক্লেশে বলল—"বয়েস না থাক, সাধ তো হতে পারে!"

শৈলেশ অন্য সময় এতোটা ক্ষুব্ধ হত কি হত না বলা যায় না, কিন্তু আজ হয়েছে। অনিলার উচিত ছিল কিছু বলার আগে কথাটা ভাবা। বিয়ের সাধ হলে—অনেক আগে না হোক—দু'চার বছর আগে সে বিয়ে করতে পারত। তখন বয়স চল্লিশের নীচে; এবং অবস্থাও সামান্য বদলে এসেছে। একটা বিয়ে করা তখন একেবারে অসম্ভব ছিল না। চাই কি, চাকরি-করা কোনো মেয়েকেও বিয়ে করা যেত।

মানুষ মানুষকে কোনোদিনই ভেতরে ভেতরে বুঝতে পারে না। তোমায় আমি ওপর থেকে যতটুকু দেখছি, তোমায় আমায় যতটা কথা হল, সামাজিক কি পারিবারিক আদানপ্রদান—তার ওপরই তোমায় দেখছি, কিংবা আরও একটু বেশী হয়ত।

এই অনিলা আজ আট ন'বছর তার সংসারে। মনে করলে হাসি পায়, দুঃখও হয়। এল যখন তখন আঠারো উনিশ বছরের মেয়ে; রোগা, নির্বোধ, চরম দুঃস্থ। মনোরঞ্জনকে নাকি মুগ্ধ করেছিল। আর মনোরঞ্জন, যার কোনো চাল-চুলো ছিল না, দায়-দায়িত্ব ছিল না, নিতান্ত হাউই বাজি, আগুন লাগতেই সব কাজে হুস করে জ্বলে উঠে ছিট্‌কে পড়ত, এবং অচিরে ছাই হয়ে যেত—সেই মনোরঞ্জন কাঁথি থেকে মেয়েটাকে ঘাড়ে করে নিয়ে হাজির। বলল, "আমার বউ রে, শৈল। বিয়ে করে ফেললাম।"

শৈলেশ বিমূঢ় হয়েছিল। এ কে? রঙটা ফরসা যদিও, তবু গায়ে মাংস নেই যেন, শরীরে বাড় নেই, গড়ন পুরে ওঠে নি; লম্বা পাতলা মুখ, নাকটা টিয়াপাখির মতন, বড় বড় দুই নির্বোধ চোখ। পরনে এক ঘোর লাল শাড়ি, সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর। পায়ে বুঝি মনোরঞ্জনের চটি।

আড়ালে শৈলেশ বলল, "ওকে কে ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে তোর? না নিজেই চেপে বসেছে?"

মনোরঞ্জন মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "না রে, আমিই চার্মড হয়ে গেলাম। মনের জোর যা তুই বুঝবি না, সাপের মুখের সামনে পা বাড়িয়ে দিতে পারে।"

"ওকে নিয়ে থাকবি কোথায়?"

"এখন তোর কাছে তো থাক, পরে একটা হিল্লে করব..."

মনোরঞ্জন ওই রকমই। সম্পর্কে ভাই, মাসতুতো, বয়সও সমান সমান, বন্ধু তো বটেই; কিন্তু এই বিয়ের বোঝা সে যে-ভাবে শৈলেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল, তাতে শৈলেশ খুশী হতে পারল না।

মা বললে, "ঘরের বউ, রাস্তায় গিয়ে থাকবে নাকি ওই বাউণ্ডুলের সঙ্গে।"

অনিলা তখন থেকেই এ বাড়িতে পাকাপাকি ঠাঁই পেয়েছে। মনোরঞ্জন অথবা মা কেউই তলিয়ে বোঝে নি শৈলেশের যৎসামান্য চাকরিতে এই বোঝা বয়ে যাওয়া কত কষ্টকর। হয়ত এতটা কষ্টের হত না, যদি না শৈলেশ আরও ক'টা দায়-দায়িত্ব বইত। দিদির সংসারে কিছু সাহায্য ছিল, দেশে জ্যাঠামশাইকে পঁচিশ ত্রিশটা করে টাকা মাস মাস পাঠিয়ে পিতৃ ঋণ শোধ করতে হত। একবার ঝোঁকের বশে শৈলেশ জ্যাঠামশাইকে লিখেছিল, "বাবার ধার আমি শোধ করব, এ-বিষয়ে আপনি মাকে কিছু লিখবেন না।" জ্যাঠামশাই খুশী হয়ে জবাব দিয়েছিলেন, "যোগ্য পুত্রের মতনই কথা তোমার। আজকাল ক'জন আর পিতৃসত্য পালন করে!"

সংসারে সে সময়কার চেহারাটা ভাবলে শিউরে উঠতে হত। আটাশ টাকার চাকরিতে অন্ন, বস্ত্র, ঋণশোধ, অসুখ-বিসুখ, তার ওপরও কত কি! রোজগারের জন্যে তখন শৈলেশ ছেলেও পড়াত কখনও কখনও ইনসিওরেন্সের দালালি করত।

জীবনে কয়েকটা জিনিস শৈলেশ খুব গোঁড়ামির সঙ্গে পালন করত। তার একটা ছিল সম্ভ্রমবোধ, অন্যটা দায়িত্ব। আত্মসম্মান, শোভনতা, ভদ্রতা ইত্যাদির জন্যে সে কখনও চাকরিতে খোশামোদ করে নি, দূরসম্পর্কের আত্মীয়দের বাড়িতে ধরনা দেয় নি; শোভনতা ও ভদ্রতা বিষয়ে সে এত সচেতন ছিল যে, ছেঁড়া লুঙ্গি পরে বাজার যেত না, বন্ধুদের পয়সায় চা-সিগারেট খেত না। দারিদ্র্যের নোঙরামি সে ঘৃণা করত, দরিদ্রের জীবনে তার আপত্তি ছিল না। এ সব সত্ত্বেও শৈলেশের সবচেয়ে বেশী গোঁড়ামি ছিল দায়িত্ব সম্পর্কে। বলা যায়, দায়িত্ব-বিষয়ে তার এক ধরনের মানসিক উদ্বেগ ছিল।

সংসারে নানান দায়িত্বের সঙ্গে মনোরঞ্জনের দায়িত্বও কিছু ছিল; হুট্ করে বিয়ে করে এনে মনোরঞ্জন সেই দায়িত্ব স্থায়ীভাবে ঘাড়ে তুলে দিল। বিয়ের মাস পাঁচ-ছয় পরে মনোরঞ্জন কলকাতার রাস্তায় মশাল জ্বেলে মিছিল বের করেছিল, সেই মশালের আগুনে একটা বাচ্চা পুড়ল, মনোরঞ্জনও পুড়ল। হাসপাতালে একটানা তিন মাস। বিকৃত, বীভৎস চেহারা নিয়ে পড়ে থাকতে থাকতে মরে গেল। একপক্ষে ভালই হয়েছে, বেঁচে থাকলে অক্ষম ও অবজ্ঞাত হয়ে থাকত, হয়ত অনিলাও সেই দগ্ধ ও কুরূপ স্বামীকে সহ্য করতে পারত না।

মনোরঞ্জন একটু নাটুকে ছিল। হাসপাতালে দেখা করতে গেলে বলত, "শৈল, আমি বরাবরই জানতাম, ঝট্ করে একদিন মরে যাব।··· সেই ছেলেটার জন্যে আমার ঘুম হয় না। কতদিন ধরে ঘুমোতে পারি না। আমি এখনও বেঁচে আছি কেন! ভগবানের এ বড় অন্যায়।"

হাসপাতালে অনিলার যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। মনোরঞ্জনই বারণ করত। দু'চারবার অবশ্য অনিলা গিয়েছে। গিয়েছে কাঠের মতন,

ফিরেছে কাঠ হয়ে। তাকে একদিনও কাঁদতে দেখে নি শৈল, একমাত্র শবদাহের দিন ছাড়া।

অনিলার ব্যাপারে মনোরঞ্জন বলেছিল, "কোনো আশ্রমটাশ্রমে দিয়ে দিস পরে। তুই আর কত টানবি, শৈল। আমি দুঃখ করব না, তুই ওকে মেয়েদের কোথাও একটা ঢুকিয়ে দিস।"

অনিলাকে অবশ্য কোথাও পাঠানো হয় নি; শৈলেশের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। মা-ও কোনোদিনই এতে রাজী হত না।

এর বছর দুই পরে মা পড়ল। রোগটা প্রথম এক বছর ঠিক মতন ধরা পড়ল না, তারপর যখন ধরা পড়ল, তখন থেকেই শৈলেশ বুঝল মা-র যাবার দিন এসে গেছে। যথারীতি মা চলে গেল।

সংসার কেমন ফাঁকা হয়ে এল তারপর, মনোরঞ্জন নেই, মা নেই, দিদিরা কাশীতে চলে গেছে, আর সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। একমাত্র বাবার ঋণ তখনও শুধতে হচ্ছে। এ-সময় শৈলেশের কিছু উন্নতিও হয়েছে। বিয়ে করার বাসনা হলেও তখনই করতে পারত সে। একবার অফিসের চক্রবর্তীদা সে চেষ্টাও করেছিল, তাঁরই এক বন্ধুর মেয়ে, ওই অফিসেই সবে চাকরিতে ঢুকেছে, তার সঙ্গে শৈলেশের বিয়ের কথা উঠিয়েছিলেন, ধরাধরি করেছিলেন খুব, মনোরঞ্জনের বন্ধুরাও বলেছিল, "তোর আপত্তিটা কি। দেখতে-শুনতে মোটামুটি ভালই মেয়েটা, দু'পয়সা বাড়িতেও আনবে। রাজী হয়ে যা..."

শৈলেশ মাথা নেড়েছে, "না রে, এখন আর ঝামেলা বাড়িয়ে কি লাভ, চল্লিশ বছর হতে চলল প্রায়, এখন টোপর পরতে পারব না।"

বলতে কি, তখন অনায়াসে শৈলেশ বিয়ে করতে পারত। বউকে খাওয়ানো-পরানো তার অসাধ্য ছিল না। কিন্তু করেনি।

তারপর আরও তিন-চার বছর কাটল। শৈলেশ এখন চাকরিতে অনেকটা এগিয়েছে, উন্নতি মন্দ হল না। বাবার ঋণ শোধ হয়েছে। দায়-দায়িত্ব বস্তুত আর কিছু নেই, একা অনিলা বাদে। অবশ্য আজকের অনিলা আর সেদিনের অনিলা এক নয়। সেই গ্রাম্য,

নির্বোধ অশিক্ষিত অনিলা আজ সব দিক থেকেই পাল্‌টে গেছে। তার শরীর আর শীর্ণ, রুগ্ন নয়; স্বাস্থ্য স্বাভাবিক। তাকে আর নির্বোধ বলা যাবে না, সংসারে সে অনেক শিখেছে, লেখাপড়াও মোটামুটি শৈলেশ তাকে শিখিয়েছে। মাঝে মাঝে শৈলেশ যে ঠাট্টা করে বলে, "একটা কাঠামো নিয়ে এসেছিলে, প্রতিমা তৈরীর আগে যেমন খড় বেঁধে কাঠামো তৈরী হয়, দেখেছ, সেই রকম। আমার কাঁধে বসে দিব্যি তো হৃষ্টপুষ্ট হলে, মাথায় ঘিলু হল; এবার সরে পড় বাপু—তা কিছু মিথ্যা নয়।"

সবই বদলেছে অনিলার, শুধু সেই অসম্ভব ধারালো নাক আর চোখের মণির রঙ বদলায় নি; আর বদলায়নি মাথার চুল। বরং আরো বেড়েছে। বিশ্বাস করা মুশকিল, আজকালকার দিনের মেয়েদের মাথায় এমন চুল থাকতে থারে। অনিলা মাথার চুল খুললে সেই কালো, ঘন, দীর্ঘ চুলের গোছা তার হাঁটু ছাড়িয়ে নেমে আসে। অথচ অনিলা মানানসই লম্বা, মেয়েরা যতটা মাথায় লম্বা হলে মানায়।

রাস্তায় কিংবা কোথাও কোন মেয়ের মাথার মস্ত খোঁপা, কিংবা দীর্ঘ বিনুনি দেখলে শৈলেশের অনিলার কথা মনে পড়ে। এবং সে প্রায় নিঃসন্দেহ হয়, অনিলার তুলনায় এই কেশগুচ্ছ নিকৃষ্ট। অনিলার মাথায় ওই আশ্চর্য সুন্দর চুলের ওপর কেমন একটা আকর্ষণ ও মোহ আছে যেন শৈলেশের।

এই অনিলাকে এখন এই সংসারেই আধখানা বলে মনে করে শৈলেশ। বস্তুত, মেয়েটি যে কে, এবং তার সঙ্গে প্রকৃতই আত্মীয়তার কি সম্পর্ক, অনিলা তার গলগ্রহ কি না—এ-সব চিন্তা বহুকাল আগেই শৈলেশের মন থেকে মুছে গেছে। সে কখনও আর ভাবে না, অনিলা তার কেউ নয়, বরং যে ধারণার বশে মানুষ মা, বোন, ভাই, স্ত্রী ও সন্তানকে নিজের বলে গ্রহণ করে, শৈলেশ অনিলাকে সেইভাবে গ্রহণ করেছে। বলাবাহুল্য, মা বেঁচে থাকলে যে অধিকার তার থাকত, এমন কি শৈলেশ বিয়ে করলে যে পারিবারিক অধিকার তার স্ত্রী পেত

—অনিলা এই সংসারের সেই অধিকার ভোগ করছে। ভোগ করবে।

আজ এখন বিছানায় শুয়ে এলোমেলো ভাবে পুরোনো কথা ভাবতে গিয়ে শৈলেশ যেন আর উৎসাহ পেল না, এবং যেভাবে সে পুরোনো কোনো বই কদাচিৎ পড়ার জন্যে খুলে বসে, সামান্য কয়েকটা পাতা চোখ বুলিয়ে আলস্যভরে আর পড়তে পারে না, বই মুড়ে রাখে, অনেকটা যেন সেইভাবেই পুরোনো কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। আজকের ঘটনাই তাকে অনেকক্ষণ থেকে বিরক্ত করছে।

অনিলার কাছে তখন মিথ্যা কথা বলা হল। আসলে, সত্যিই শিবদাস কি মজুমদার, কেউই রসিকতা করে পাত্রীপক্ষকে চিঠি লেখে নি। এটা ঠিক, ওই কাগজের 'পাত্র চাই' বিজ্ঞাপনটা ঠাট্টা তামাসা করেই শিবু এবং মজুমদার দেখেছিল, দেখতে দেখতে তারা একটা বিজ্ঞাপন লাল পেনসিলে টিক মেরে শৈলেশকে দিল। বলল, "ওহে শৈলেশ—এই ঠিকানায় একটা চিঠি দিয়ে দাও।"

ত্রিশ বছরের মেয়ের জন্য পাত্র চাইছে, বয়স্ক পাত্র। একমাত্র বউ বেঁচে থাকলেই আপত্তি, নচেৎ ছেলেপুলে থাক, কায়স্থ হোক কি ব্রাহ্মণ হোক, বৈদ্য হোক আপত্তি নেই। পাত্রী প্রবাসী বাঙালী। ...তোমার পক্ষে সুটেবল্।

এ রকম হাসি-ঠাট্টা ওরা করে শৈলেশকে নিয়ে। এবারেও করেছিল, কিন্তু কোন কোন সময় যেমন মাত্রা হারিয়ে কিছু করে ফেলে মানুষ, শিবুরা তাই করেছিল। শৈলেশ যে প্রায় বৃদ্ধ হতে চলেছে, এবং এখন বিয়ে করলে ওই রকম প্রবীণা কাউকে বিয়ে করতে হবে—তাতে তারা দ্বিমত নয় বরং বলা যায়, শৈলেশের বিয়ের দিন চলে গেছে বলেই এখন আর বিয়ে হবে না, সপুত্র সকন্যা কোন বিধবার ভরণপোষণের ভার নেওয়াই হতে পারে।

"এই পাত্রীটি কিন্তু বিধবা নয়," শৈলেশ বলল।

"ও কথা কি বিজ্ঞাপনে লেখে।...নেগোসিয়েসান করো দেখবে ক্রমশঃ রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে।" মজুমদার জবাব দিল।

"প্রবাসে তার আরও কত কি আছে—কি বলো, মজুমদার!" শিবু বলল।

"থাকাই সম্ভব।"

শৈলেশ তখন আর কিছু বলেনি। কিন্তু তারপর বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে যখন ট্রাম ধরতে গিয়ে আর ট্রাম ধরল না, আসন্ন শীতের মৃত বৈকালের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে লাগল হাঁটতে হাঁটতে ভিড়, গাড়ি-ঘোড়া, কোলাহল, রাক্ষুসে বাড়িগুলো পেরিয়ে ফাঁকায় এসে দাঁড়াল, তারপর মাঠে, শেষে আউটরাম ঘাটে—তখন বিকাল মৃত। আকাশও শূন্য ধূসর হয়ে গেছে, গঙ্গার জল কালো, জাহাজগুলো প্রায়ান্ধকারে দাঁড়িয়ে, নদীর জলের অদ্ভুত এক শব্দ হচ্ছে—যেন এই শব্দ সময়প্রবাহকে ভয়ঙ্করভাবে অনুভব করিয়ে দিচ্ছে। শৈলেশ বসল। তার মাথার ওপর অজস্র পাখি গাছ থেকে গাছে উড়ে রাত্রের আশ্রয় করে নিল, ষ্টিমারের ভোঁ বাজল কোনো অন্ধকার সীমানা থেকে, শীতের বাতাস এবং গঙ্গার জলীয় ঠাণ্ডায় শৈলেশ অকস্মাৎ অনুভব করল, সে আশা এবং আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির জগৎ পেরিয়ে চলে এসেছে। নিজেকে বৃদ্ধ ও বঞ্চিত মনে হল, দুঃখ হল। না, দুঃখ নয়, অদ্ভুত এক বেদনা তাকে অধিকার করল। মনে হল, যেন সে এমন একটি সীমানা ছাড়িয়ে এসেছে যে সীমানার পর স্বভাবতই সে আর কিছু কামনা করতে পারে না। জরাগ্রস্ত বৃক্ষের মতন, প্রাণসম্পদহীন লতার মতন এখন তার মরে আসার কথা।

শৈলেশ সম্ভবত নিজেকে ঠিক এখনই পরিত্যক্ত বলে ভেবে নিতে পারল না। এবং বস্তুতই সে জীবনের স্বাভাবিক দাবিদার হবার সামর্থ্য রাখে কি রাখে না, অথবা সে আকাঙ্ক্ষা করলে যৌবনের সামগ্রী পেতে পারে কি পারে না—যেন তারই পরীক্ষায় নামল।

পরের দিন, নিতান্ত কৌতূহলবশত, খানিকটা বা হঠকারিতা করে, কিংবা শিবু এবং মজুমদারের ওপর ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ণ হয়ে এবং সেই মানসিক

হতাশাবশে একটা চিঠি গোপনে বিজ্ঞাপনের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিল।

ঢিল ছোঁড়া হয়ে যাবার পর অবশ্য নিজের ছেলেমানুষিতে নিজে লজ্জিত হয়েছে শৈলেশ। কথাটা গোপনে রেখেছে। দিন দুই-চার অস্বস্তির সঙ্গে কাটিয়ে ও-বিষয়টা প্রায় ভুলেই যাচ্ছিল। সত্যি, তার আর মনেও ছিল না ঠিক। অথচ, অথচ আজ হুট্ করে একটা জবাব এসে গেল।

চিঠিটা খামে এলেও কথা ছিল। পোস্টকার্ডে কি করে ভদ্রলোকে বিয়ে-থার কথা লেখে শৈলেশ ভেবে পেল না। ভদ্রলোকের ওপর রাগ হল। অত্যন্ত কৃপণ, এবং জ্ঞানহীন ভদ্রলোক।…নিজের ওপরেও অসন্তুষ্ট হল শৈলেশ, সে কেন বাড়ির ঠিকানা দিল? কোন্ বুদ্ধিতে?

এ-পাড়ায় নতুন আসার পর, শৈলেশ কেমন প্রত্যেকটি চিঠিতে পুরো ঠিকানা লেখার অভ্যাস করে ফেলেছে। সেই অভ্যাসেরই পরিণাম।

যাই হোক, শৈলেশ ভাবল, যা হবার হয়ে গেছে। অনিলা হয়ত কিছু মনে করলেও করে থাকতে পারে, উপায় নেই। সে এই চিঠির জবাব দেবে না।

ঘুমোবার আগে শৈলেশ অবশ্য এ সান্ত্বনাও পেল যে, এখনও সে বিয়ের বাজারে অচল হয়ে যায় নি।

দিন পনের পরে আবার।

সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরতে অনিলা কিছু বলে নি। পোশাক-আশাক ছেড়ে শোবার ঘরে বসে শৈলেশ 'এডগার ওয়ালেস' পড়ছে, অনিলা চা এনে দিল।

শৈলেশ বলল, "তোমার আজ খুব সুমতি যে! ভেবেছিলাম, এখন আর চা করবে না!"

চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে অনিলা বলল, "তোমার সেই বারিদবরণ-বাবু এসেছিলেন।"

"কে বারিদবরণ?"

"নামটাই ভুলে গেলে!...অত ঢাকা-ঢুকির কি আছে। বিয়ে করবে করো—আমি কি মেয়ে ভাগিয়ে দিচ্ছি!"

নামটা ততক্ষণে মনে পড়ে গিয়েছিল শৈলেশের। অনিলার কথার ধরনটা তার পছন্দ হল না। "ও সেই চিঠির ভদ্রলোক!...তাঁর আসার কারণ কি ছিল?"

"আসবে না!...খোঁজখবর করতে এসেছিল।"

"আমি ত তাকে কোনো চিঠি দিই নি।"

"কি করে জানব!"

শৈলেশ দু মুহূর্ত অনিলার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। অনিলার মুখে কেমন তিক্ততা! বিদ্রূপ নাকি ঘৃণা। সত্যিই শৈলেশ কোন চিঠি দেয় নি। অথচ অনিলার মুখ দেখে মনে হল, অনিলা তাকে বিশ্বাস করে নি। 'বিশ্বাস' কথাটাই মনে ছুরির ফলার মতন গাঁথল শৈলেশের। অনিলা তার কথা বিশ্বাস করল না।

শৈলেশের মুখ কান গরম হয়ে নিশ্বাস দ্রুত হল। চোখ জ্বালা করছিল।

শৈলেশ বলল, "ঠিক আছে, আবার যখন আসবে দেখা হবে।"

"আমি রবিবার সকালে আসতে বলেছি।"

শৈলেশ বিমূঢ় হল, স্তম্ভিত হল। অনিলার স্পর্ধার সীমা যেন অতি বেশী রকম অতিক্রম করে গেছে। "তুমি তাকে কেন আমার বাড়িতে আসতে বললে?" শৈলেশ কর্কশভাবে ধমকে উঠল।

"ভদ্রলোক রোজ রোজ ঘুরে যাবেন, তাই।" অনিলা নির্লজ্জের মতন জবাব দিল।

"কে ঘুরে যাবেন, কে যাবেন না—সেটা আমি বুঝব, তুমি নও। তুমি কে? আমার ব্যাপারে তোমার মাতব্বরি করার কি আছে!"

অনিলা তারিয়ে তারিয়ে বলল, "মাতব্বরি করি নি, তুমি যা চাও তার ব্যবস্থা করেছি।"

শৈলেশ স্বভাবতই ধৈর্য হারাল। "তুমি কি মনে কর, তুমি ব্যবস্থা না করলে আমার কিছু হবে না! আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নিতে পারব।"

"তবে তাই করো।"

"হ্যাঁ, করব।"

অনিলা আচমকা তীক্ষ্ণ গলায় শুধোলো, "এতোকাল করনি কেন?"

শৈলেশ কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেল। এ-প্রশ্নের জবাব সে জানে, অথবা জানে না—বোঝা গেল না। রাগের মাথায় চিৎকার করে বলল, "আমার ইচ্ছে, আমার খুশি, তোমারই বা এত লাগছে কোথায়! এতদিন ধরে যা ইচ্ছে করে গেছ, রাজত্ব করেছ বসে বসে, এখন তোমার ভয় হচ্ছে, সেটা হাতছাড়া হবে!···"

শৈলেশ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, অনিলা বাধা দিয়ে বলল, "করতে না দিলেই পারতে!···যাক্‌গে, আমার কোনো রাজাও নেই, রাজত্বও নেই। তুমি অনায়াসে বিয়ে করে আনতে পার।" অনিলার দুই চোখের দৃষ্টি ধক ধক করছিল, গলার স্বর কাঁপছিল। অনিলা আর কিছু বলল না, চলে গেল।

তারপর সমস্ত সন্ধ্যেটাই আবহাওয়া গুমোট ও স্তব্ধ হয়ে থাকল। শৈলেশ কোনো প্রয়োজনেই আর অনিলাকে ডাকল না; অনিলাও সামনাসামনি এল না। শৈলেশের রাতের খাওয়া অত্যন্ত নিঃশব্দে ও নিঃসঙ্গে সমাধা হল। রাত বাড়ছিল। বাড়ির বাতিগুলি নিবে এল একে একে, অন্ধকার হল সর্বত্র, শীতের কনকনে ভাবটা গায়ে লাগল শৈলেশের।

বিছানায় শুয়ে শৈলেশ চোখ বুজে পড়ে থাকল। অনিলা তার অধিকারের এক ফোঁটাও ছাড়তে রাজী না। এতোদিন সে এ-বাড়ির এবং শৈলেশের সর্বেসর্বা হয়ে থেকেছে, সে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও আধিপত্য ভোগ করেছে, যাতে তার কোথাও কোনো দাবী নেই তা ভোগদখল

করে বসে থাকতে থাকতে এখন যেন সে একটা স্বত্ব লাভ করেছে। লোভীর মতন, শঠের মতন এখন সে সেই স্বত্ব হারাতে চায় না। এই অধিকার তার হাত থেকে চলে যাবে এই চিন্তায় অনিলা নোঙরা, কুৎসিত ও বেপরোয়া হয়ে গেছে, নির্লজ্জ হয়েছে।

অনিলাকে এখন শৈলেশ মনে মনে ঘৃণা করছিল।

পরের দিন সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে শৈলেশ অনিলাকে আর বাড়িতে দেখতে পেল না। তার কোথাও যাওয়ার কথা নয়, যায়ও না, কদাচিৎ ভবানীপুরে নির্মলা আশ্রমে যায়। যেতে হলে বলে যায় শৈলেশকে। এছাড়া পুরোনো পাড়ার সুষমাদির কাছে কখনও-সখনও।

অনিলা কোথায় গেছে শৈলেশ বুঝতে না পারায় বিরক্ত হল, ঝিকে একবার জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে হলেও শেষ পর্যন্ত কিছু জানতে চাইল না। যথারীতি চা খেল, কাগজ দেখল, দাড়ি কামাল। শীতের বেলা দেখতে দেখতে ন'টা বাজল। স্নান সারল শৈলেশ। ঝি রান্না শেষ করছে, অনিলা ফেরে নি। ভাত খেয়ে পোশাক পাল্টাতে পাল্টাতে একবার মনে হল অনিলা ফিরেছে, পরে বুঝল ঝি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পাশের বাড়ির কারও সঙ্গে কথা বলছে।

অফিসে বেরুবার সময় নিজের ঘরটা তালা বন্ধ করে দিল শৈলেশ। ঝিয়ের জিম্মায় বাড়িঘর খোলা থাকল বলে তার দুর্ভাবনা হল না, তার রাগ হল এই ভেবে যে, অনিলা বড় বেশী বাড়াবাড়ি করছে। সে কি এই বাড়ি ত্যাগ করে গিয়ে শৈলেশকে জব্দ করতে চাইছে? করুক না। অনিলাকে আশ্রয় দেবার মতন কত যে লোক আছে কলকাতায় শৈলেশ জানে। দুটো মিষ্টি কথা একবেলা কি দু'বেলা বলবে, তারপর?

শৈলেশ যখন ট্রামে, তখন শুনল: সকালে টালিগঞ্জের ব্রিজের কাছে একটি মেয়ে কাটা পড়েছে, খুব ভোরে। শোনামাত্র তার বুকের মধ্যে কেমন একটা আতঙ্ক লাফিয়ে উঠল। কেউ জানে না কতবড় মেয়ে, কেউ বলল বউ, কেউ বলল বয়স্কা মেয়ে।...অনিলা কিন্তু

গাড়িটাড়ি চড়ায় তেমন অভ্যস্ত নয়, বাড়ি থেকে একা খুবই কম বেরোয়। পথঘাট সে খুব একটা চেনে এমন মনে হয় না।

অফিসে পৌঁছে শৈলেশের কিছুতেই মন বসছিল না। এতক্ষণ সে রীতিমত এক উদ্বেগের অসহায়তা বোধ করতে লাগল। কোথায় গেল অনিলা? কার কাছে গেল? রাগ করে পথে নামা কঠিন নয়, কিন্তু এই শহরে পথ হাঁটা মুশকিল; এমন কি অনিলার আটাশ-উনত্রিশ বছরের যুবতীর পক্ষে জীবনের পথ হাঁটাও মুশকিল।

শিবু বা মজুমদারকে কথাটা বলে পরামর্শ চাইলে হত। কিন্তু সেটা আরও কেলেঙ্কারির হবে। মানুষের চোখ বড় সন্দেহপরায়ণ।

অনিলা কি রাগ করে বাড়ি ছেড়ে এসে আত্মহত্যা করল। আত্মহত্যায় শৈলেশের বড় ভয়। জিনিসটা নাটকীয় বটে, তবে কেলেঙ্কারির একশেষ। অনিলা আত্মহত্যা করবে না। করলে—শৈলেশ ভাবল, তার কপালে থানা পুলিস, লোকনিন্দা, অপবাদ, সন্দেহ আরও কত কি। ভাবতে গা শিউরে ওঠে, বুকের মধ্যে মস্ত একটা বোঝা যেন চেপে বসে।

রাগ আর হচ্ছে না, এখন অনিলাকে ত ঘৃণা হচ্ছে, মনে হচ্ছে—এই মেয়েটি তার জীবনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। অনিলা ইতর, অনিলা নৃশংস।

দুপুর গড়াবার আগেই শৈলেশ অফিস থেকে বেড়িয়ে পড়ল। দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগে সে অধীর হয়ে উঠেছে। কি হবে? কোথায় গেল অনিলা? কেন সে এ রকম ছেলেমানুষি করল?

প্রথমে পুরোনো পাড়ায়, সুষমাদির পাড়ায়। না, সেখানে যায় নি অনিলা।

শৈলেশ ফিরল। উদ্বেগের ভার এখন তার সমস্ত মনে। আতঙ্ক এবং অসহায়তা ক্রমশই তাকে দুর্বল ও নির্জীব করছিল। কোথায় পাওয়া যাবে অনিলাকে? তাকে কি পাওয়া সম্ভব আর? থানা পুলিস করবে শৈলেশ? হাসপাতালে খবর নেবে?

ট্যাক্সি করে সেই নির্মলা আশ্রমে! না, অনিলা আসে নি।

শীতের দুপুর গড়িয়ে বিকেল তখন। প্রায়-বিকেল। শৈলেশ পথহারানো বাচ্চা ছেলের মতন চারপাশে তাকিয়ে হঠাৎ যেন কেঁদে ফেলার উপক্রম করল। না, কাঁদল না—অথচ সে অনুভব করল, তার চারপাশ শূন্য হয়ে গেছে। সে বস্তুত হারিয়ে গেছে, কিংবা হারিয়ে ফেলেছে কিছু।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিল শৈলেশ, কোথায় যাবে আর? গঙ্গার দিকে যাবে? কি হবে গঙ্গার পাড়ে গিয়ে? কলকাতা শহরে গঙ্গা কি মাপাজোপা!

রিকশা পেয়ে শৈলেশ চেপে বসল। বলল, টালিগঞ্জ চলো।

যেতে যেতে শৈলেশ একসময় অনুভব করল, সে যেন অনিলার মৃত্যু-সংবাদ কোথাও পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরছে, এবার বাড়ি ফিরে অনিলার সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে। আশ্চর্য! সমস্ত মন কেমন ফাঁকা, সব শূন্য বলে মনে হয়; শীতের ধুলো, নিরুত্তেজ রৌদ্র, একটি ট্রাম গেল কি এল, বাসের হর্ন—সমস্তই যেন তাকে অনিলার মৃত্যুসংবাদ দিচ্ছে, কানে কানে। কেন এ রকম মনে হয়! অনিলা তার কে? আত্মীয় নয়, অনাত্মীয়। সে মনোরঞ্জনের স্ত্রী, তার স্ত্রী নয়।

অথচ শৈলেশ সহসা অনুভব করল, অনিলার সঙ্গে তার সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠতা, বসবাস এবং জীবনযাপনের মধ্যে এক ধরনের অদ্ভুত নৈকট্য ছিল, স্ত্রী নয় অনিলা—কিন্তু মানুষের একটা সম্পর্ক বাদ দিলে অন্য যে হৃদয়সম্পর্ক এবং অবলম্বনের সম্পর্ক পরস্পরের মধ্যে থাকে, অনিলার সঙ্গে তার সেই রকম কোন সম্পর্ক ছিল। শৈলেশ শোভনতা, সভ্যতা ও দায়িত্বকে অতিশয় মূল্য দিয়েছে, যদি না দিত তবে—

তবে কি?...না, কিছু না। মনোরঞ্জন যে বিশ্বাসে অনিলাকে তার সংসারে এনে দিয়ে বলেছিল, "এখন তোর কাছে থাক—" সেই বিশ্বাসও একটা দায়িত্ব বইকি! শৈলেশ যথাসাধ্য তা পালন করেছে। হয়ত আজীবন করত।

অদ্ভুত এক হাহাকার এবং পরিপূর্ণ বেদনা নিয়ে শৈলেশ বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নামল।

সদর খোলা। বাড়ির কোথাও রোদ নেই, ছায়া নেমে সিঁড়ি ঠাণ্ডা হয়ে আছে। কলে জল পড়ছে। দুটি চড়ুই উড়ে গেল। সাড়াশব্দ নেই কোথাও। ফাঁকা যেন খাঁ খাঁ করছে। ঝি বুঝি ঘর মুছছে। শৈলেশ সিঁড়িতে পা দিল। মা মারা যাবার পর, ঠিক এই রকম বিকেলে সে বাড়ি ঢুকেছিল।

অবর্ণনীয় এক স্তব্ধতা ও শোক অনুভব করল শৈলেশ। হয়ত অনিলাও চলে গেল। তার কোথায় লেগেছিল. শৈলেশ এখন বুঝি অনুভব করতে পারছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে আসতে শৈলেশ কেঁদে উঠেছিল প্রায়, হঠাৎ মুখ ফেরাতে অনিলার ঘর তার চোখে পড়ল। দাঁড়াল শৈলেশ, অপলকে সেই ঘর দেখল দরজা খোলা, পরদা দুলছে।

অবশ ও কম্পিত পায়ে শৈলেশ শেষ সিঁড়ি উঠল। কোন শব্দ নেই, কাউকে দেখা যায় না। পায়ে পায়ে অনিলার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল; কান পাতল। কিছু বোঝা যায় না। নিশ্বাস বন্ধ করে শৈলেশ দাঁড়িয়ে থাকল, পরদা সরিয়ে ঘরে উঁকি দিতে তার সাহস হচ্ছিল না।

অনেকক্ষণ পরে ঘরের মধ্যে সামান্য শব্দ পাওয়া গেল।

শৈলেশ পরদা সরাল না, কিন্তু সে সমস্ত দিনের ভয়ংকর উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা, অসহায়তা ও বেদনা থেকে যেন মুক্তি পেল।

এই স্বস্তিটুকু অনুভব করে শৈলেশ শান্তি পেল, এবং দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল।

চা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

লিণ্টন স্ট্রীটের মোড়ের দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল শুভেন্দু, একেবারে চোখাচোখি হয়ে গেল। নীলিমা বাস থেকে নেমে গলির মধ্যে ঢুকবার জন্য পা বাড়িয়েছে, শুভেন্দুকে দেখে থেমে দাঁড়াল, বলল, 'তুমি!'

শুভেন্দু ওই একটি শব্দেরই প্রতিধ্বনি করল, 'তুমি'!

তারপর বলল,'কতকাল পরে দেখা।'

নীলিমা বলল, 'হ্যাঁ, বেঁচে থাকলে কোন না কোনদিন দেখা হওয়ার সম্ভাবনাটাও থাকে।'

শুভেন্দু লক্ষ্য করল নীলিমার পরনে কমদামী শাদা খোলের একখানা মিলের শাড়ি, মণিবন্ধে দুগাছা সরু চুড়ি ছাড়া সারা দেহে আর কোন আভরণ নেই। বাঁ-হাতে স্কুলপাঠ্য একখানা ইতিহাসের বই, আর তার তলায় এক রাশ খাতা। শরীর ভারি রোগা হয়ে গেছে, সেই আগের মত চেহারা আর নেই। কিন্তু সিঁথিটি আগের মতই শাদা রয়েছে। নীলিমা লক্ষ্য করল, শুভেন্দুর পরনে দামী স্যুট। আঙুলে পাথর বসানো দুটি আংটি, একটির রঙ নীল আর একটি গাঢ় রক্তবর্ণ, আগের চেয়ে বেশ একটু মোটা হয়েছে দেখতে।

শুভেন্দু বলল, 'এদিকে কোথায় যাচ্ছ?'

নীলিমা বলল, 'স্কুলে। নোনাপুকুর বিদ্যাপীঠে মাস্টারি করি। তুমি যাচ্ছ কোথায়, কোন অফিসে? না চাকরি-বাকরি আর করতে হয় না।'

শুভেন্দু বলল, 'বাঃ, চাকরি করতে হয় বৈকি, চাকরি না করলে খাব কি। একটা ইনসিওরেন্স অফিসে কাজ করি।'

নীলিমা বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে বড় চাকুরে।' শুভেন্দু বলল, 'কিন্তু আসলে বড় চাকর।'

নীলিমা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'বিয়ে করেছ তো?'

শুভেন্দু একটু ঢোক গিলে বলল, 'রাম বল। বিয়ে করবার আর সময় পেলাম কই।'

নীলিমা বলল, 'কিন্তু আমি যেন শুনেছিলাম…।'

শুভেন্দু একটু হাসল, 'সে তো আমিও শুনেছিলাম তোমার বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু দেখছি তো অন্যরকম। দেখার সঙ্গে কি সব সময় শোনার মিল হয়?'

নীলিমা বলল, 'তা ঠিক। আচ্ছা চলি।'

শুভেন্দু বিস্মিত হয়ে বলল, 'সেকি, এতদিন পরে দেখা। কথাবার্তা কিছুই হোল না এরই মধ্যে বিদায় নিচ্ছ।'

নীলিমা বলল, 'কিন্তু স্কুলের বেলা হয়ে গেল যে। এমনিতেই আজ একটু লেট্ হয়েছি, ক'টা বাজল, এগারটা বেজে গেছে বোধ হয়।'

শুভেন্দু হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হাঁ, সোয়া এগার। শোন, আজ আর তোমার স্কুলে গিয়ে কাজ নেই, আমিও অফিস কামাই করব, এস গাড়িতে।'

নীলিমা বলল, 'তারপর।'

শুভেন্দু বলল, 'তারপর আর কি। সারাদিন ছুটে বেড়াব আর মাঝে মাঝে চা খাব। মনে আছে সেই চা খাওয়ার কথা?'

নীলিমা মৃদু হেসে বলল, 'আছে। কিন্তু স্কুল আমার আজ কামাই করবার যো নেই জরুরী দরকার।' আজ মাইনের তারিখ, সে কথাটা আর নীলিমা খুলে বলল না। বলল, 'বরং আমাদের বাড়িতে এসো।' শুভেন্দু বলল, 'বেশ, কবে যাব বল।'

নীলিমা বলল, 'কালই এসো সন্ধ্যার পর। বেদিয়া ডাঙা সেকেণ্ড লেন। তেত্রিশ নম্বর বাসে উঠে বণ্ডেল গেটের কাছে নামবে, তারপর রেল লাইন ক্রশ করে,—ওমা, তোমার তো গাড়িই আছে।' বেশ একটু অপ্রস্তুত হলো নীলিমা।

শুভেন্দু বলল, 'যা ভেবেছ তা নয়, অফিসের গাড়ি। অফিসের

কাজেই এদিকে এসেছিলাম। সব পরের ধনে পোদ্দারি।'

নীলিমা বলল 'আচ্ছা কাল তা হলে সত্যিই আসছ তো?'

শুভেন্দু বলল, 'নিশ্চয়ই।' তারপর পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল নীলিমা। যতক্ষণ দেখা যায় শুভেন্দু একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। বেশ-বাস চেহারা দেখে বোঝা যায় অভাবে পড়েছে। সেই আগের দিন আর নেই। কিন্তু দেহের সেই সুন্দর গড়ন এখনো যেন প্রায় তেমনি আছে শ্যামবর্ণের ওপর ছিপছিপে দোহারা চেহারা। বড় বড় কালো দুটি চোখে রহস্য যেন আরো গভীর হয়েছে।

গাড়িতে স্টার্ট দিল শুভেন্দু। ম্যাঙ্গো লেনে অফিসে গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু কাজ-কর্মে মন লাগল না। আট-নয় বছর আগের একটি মফঃস্বল শহর আর কয়েকটি টুকরো টুকরো ছবি ওর চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল, আর সব ছবির সঙ্গে জড়িয়ে রইল একটি মেয়ে। ষোল সতের বছর তার বয়স. যেমন চঞ্চল তেমনি প্রগলভ।

কাছারি বাড়ির ঝাউগাছের সারির পিছনে লাল সুড়কির পথ। আর সেই পথের প্রান্তে দোতলা হলদে রঙের বাড়ি! এই বাড়িটির সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন শুভেন্দুরই এক দূর সম্পর্কের দাদা শিবতোষ। শহরের ফার্স্ট মুন্সেফ ভবেশ দত্ত শিবুদার মাস্‌শ্বশুর। দূর থেকে একদিন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন শিবুদা, তারপর একদিন কলেজ ছুটির পরে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন, বললেন, 'আয়, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পরিচয় কর। আজকালকার দিনে এত কুনো মুখচোরা হয়ে থাকলে চলে নাকি দুনিয়ায়?'

তখন ভারি মুখচোরা স্বভাবই ছিল শুভেন্দুর। দু-বছর এই শহর থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছে বটে কিন্তু দু-একজন প্রফেসর আর ক্লাসের দু-চারটি ছাত্র ছাড়া কারও সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠ আলাপ-পরিচয় হয়নি। কলেজ হোস্টেলে তিন-সিটওয়ালা একটি ঘরে কোণের দিকের একখানা তক্তপোশে সে থাকে, কারো সঙ্গে বড় একটা মেশে না, ইচ্ছা সত্ত্বেও মিশতে পারে না। এই নিয়ে সহপাঠী-সহকর্মীরা নানা

রকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। কেউ বলে দেমাকী, কেউ মুখ বাঁকিয়ে বলে গেঁয়ো ভূত। শুভেন্দু বইয়ের আড়ালে চোখ ঢাকে। তাদের মুখভঙ্গীর দিকে তাকায় না, বক্রোক্তির সময় বধির সাজে।

এমনি করেই চলছিল। শিবুদা কলকাতা থেকে গাঁয়ের বাড়িতে যাওয়ার পথে খুলনায় দুদিন রয়ে গেলেন। আর সেবারেই পরিচয় করিয়ে দিলেন ভবেশ বাবুদের সঙ্গে। বেশ শিক্ষিত সম্পন্ন পরিবার। বড় ছেলে কলকাতায় থেকে ল' পড়ে। দুটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, সেজোটি ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে ভর্তি হয়েছে, তারপরেই সব ফ্রক আর হাফ প্যাণ্টের দল।

এই বাড়িতে প্রথম দিন এসেই বড় অপ্রস্তুত হয়েছিল শুভেন্দু। শিবুদা শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'ছেলেটি পড়াশুনায় বেশ ভালো, কিন্তু বড্ড লাজুক।' শিবুদার মামাশাশুড়ী বললেন, 'লাজুকই ভালো বাবা, যে ফাজিল-ফক্কড় ছেলেমেয়ে হয়েছে আজকাল। এদের মধ্যে শান্ত-সৌম্য কাউকে দেখলে আমার তো চোখ জুড়ায়, তোমরা যে যাই বল।'

বারান্দায় বেতের টেবিল-চেয়ার পেতে সান্ধ্য চায়ের আয়োজন হচ্ছিল। সেখানে ডাক পড়ল শিবতোষ আর শুভেন্দুর। প্লেটে করে ডিমের তৈরী দু-তিন রকমের খাবার এগিয়ে দিয়ে বড় একটা কেট্‌লি থেকে প্রত্যেকের কাপে চা ঢেলে দিচ্ছিল নীলিমা। খানিক আগে শিবুদা তাঁর এই তরুণ শ্যালিকাটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। নমস্কার বিনিময় ছাড়া বাক-বিনিময় তখনো হয়নি, কিন্তু তার কাপে চা ঢালবার সঙ্গে সঙ্গে শুভেন্দু বলে উঠল, 'আমি তো চা খাইনে।'

নীলিমা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে বলল, 'খান না! ঢেলেছি যখন একটু খান।' কথাবার্তায় ভারি সপ্রতিভ নীলিমা। যেন শুভেন্দুর সঙ্গে তার কতদিনের পরিচয়। শিবুদা হেসে বললেন, 'তবেই হয়েছে, শুভেন্দু আমাদের এ যুগের ঋষ্যশৃঙ্গ, এত বড় হলে কি হবে পান সিগারেট চা কোনদিন মুখে তোলে নি। এসব ব্যাপারে রাঙা-কাকার

ভারি কড়া শাসন।'

নীলিমা বলল, 'তা থাকুক গিয়ে, পান-সিগারেটের সঙ্গে চায়ের তুলনা দেবেন না জামাইবাবু, চা-টা পান সিগারেটের মত অশান্তি নয়। অনেক ভালো, অনেক সুন্দর।'

নীলিমার মা হেসে বললেন, 'তাতো হবেই, যা একটি চায়ের পোকা তুমি, দুধের চেয়েও তোমার কাছে চা ভালো।' তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যা দেখছি তোমার এই মেয়ের জন্যে কোন চা-বাগানের ম্যানেজার-ট্যানেজার খুঁজতে হবে।'

ভবেশবাবু ভারি মিতভাষী। স্মিত মুখে বললেন, 'হুঁ'। শ্বেতপদ্মের মত চমৎকার কাপটি। তার মধ্যে কানায় কানায় ভরা তাম্রাভ পানীয় দেখে ভারি লোভ হলো শুভেন্দুর। একবার তাকাল নীলিমার দিকে, তারপর নিচু হয়ে আচমকা কাপে চুমুক দিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখটা সরিয়ে নিলো শুভেন্দু, তরল পানীয়ের উত্তাপে ঠোঁট দুটি যেন পুড়ে গেছে।

নীলিমা তার দিকে তাকিয়েছিল, চোখাচোখি হওয়ায় মুখে আঁচল চাপা দিল, তবুও কি সুস্থ থাকবার জো আছে। ভেতর থেকে প্রবল এক হাসির বেগ ওর সমস্ত শরীরকে আন্দোলিত করছে। শেষ পর্যন্ত পরিবেশন বন্ধ রেখে ছুটে চলে গেল ঘরে। জানালা দিয়ে শুভেন্দুর চোখে পড়ল তক্তপোশের ওপর শুয়ে পড়ে তখনো নীলিমা হাসির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে। সে একা নয়, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে সেই প্যাণ্টফ্রকের দল। নীলিমার মা-ও অতি কষ্টে হাসি চেপে বললেন, 'মুখপুড়ীর কাণ্ড দেখ।'

ভবেশবাবু মেয়ের উদ্দেশে তিরস্কারের সুরে বললেন, 'না না এসব কি, বয়স তো কম হয়নি, এখনো যদি ম্যানার্স না শেখে'—

নীলিমার মা বললেন, 'চা যখন তোমার খাওয়া অভ্যাস নেই তখন আর খেয়ে কাজ নেই বাবা। আমি তোমার জন্য সরবৎ করে আনছি।' শুভেন্দু লজ্জিত হয়ে বলল, 'না না আমার আর কিছু দরকার নেই।'

এত অপ্রস্তুত আর নাকাল শুভেন্দু জীবনে হয়নি। বাইরে এসে শিবুদাও বললেন, 'তুই একটি আস্ত উজবুক, একটা সিনক্রিয়েট করে ছাড়লি তো ?'

দিন দুই পরে কলেজে ঢুকতে যাচ্ছে পিছন থেকে ডাক শুনল, 'শুনুন।'

শুভেন্দু তাকিয়ে দেখল আরো দু-তিনটি মেয়ের সঙ্গে নীলিমাও বেরোচ্ছে। তখন কলেজে সকালে মেয়েদের ক্লাস হোত দুপুরে ছেলেদের।

শুভেন্দু ওর দিকে তাকাতে নীলিমা বলল, 'জামাইবাবু কি চলে গেছেন ?'

শুভেন্দু জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

ইশারায় সঙ্গিনীদের এগুতে বলে নীলিমা শুভেন্দুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেদিনের ব্যবহারের জন্য বড়ই লজ্জিত হচ্ছি। মা যেতে বসেছেন আপনাকে। তাঁর কাছে খুব বকুনি খেয়েছি। আপনি না গেলে আরো বকবেন।'

শুভেন্দু বলল, 'আমার তো সময় হবে না।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সময় হোল। তারপর ঘন ঘনই যাতায়াত শুরু করল শুভেন্দু।

লজিকটা মাথায় ঢোকে না নীলিমার। এদিকে শুভেন্দু লেটার পেয়েছে ন্যায়শাস্ত্রে। নীলিমা বলল, 'মা, শুভেন্দুদা যদি মাঝে মাঝে আমাকে লজিকটা দেখিয়ে দেন খুব সুবিধে হয়।'

নীলিমার মা বললেন, 'বেশ তো, ওর যদি পড়াশুনোর কোন ক্ষতি না হয়—'

শুভেন্দুর আপত্তি দেখা গেল না। সে নীলিমাকে লজিক শেখাতে লাগল, আর নীলিমা তাকে চা খাওয়ায় রপ্ত করে তুলল। প্রথম প্রথম অবশ্য চা দিত না নীলিমা। বলত, 'কি দরকার পরের ছেলেকে হনুমান বানিয়ে। ঠাণ্ডা ছেলের পক্ষে সরবতই ভালো।' কিন্তু দিন কয়েক পরেই সরবতের গ্লাসের বদলে চায়ের কাপ জায়গা দখল করল। আর

শুভেন্দুর সমস্ত হৃদয় দখল করল এই শ্যামলা চা দাত্রীটি। ন্যায়শাস্ত্রের বিধি রক্ষিত হোল কি না বলা যায় না ; কিন্তু যা লজিক্যাল তাই ঘটল।

নাটক পঞ্চমাঙ্কে গিয়ে পৌঁছবার আগেই ভবেশবাবু চাঁটগাঁয়ে বদলী হয়ে গেলেন। নীলিমা আর শুভেন্দু অনেক মতলব আঁটল। একবার ভাবল কাউকে না বলে দুজনে মিলে পালায়, আর একবার ভাবল সোজাসুজি বাবা মাকে বলে। কিন্তু কাজে কিছুই হলো না। চরম কোন পথ নেওয়া কারোরই সাহসে কুলিয়ে উঠল না। তা ছাড়া বি-এ পরীক্ষার চাপ তখন শুভেন্দুর ঘাড়ে। বেশি হৈ চৈ করবার মত অবস্থা তখন নয়। বিদায়ের সময় সজল চোখে নীলিমা বলল, 'চিঠি দিয়ো।'

আর্দ্রগলায় শুভেন্দু প্রতিধ্বনি করল, 'চিঠি দিয়ো।'

চিঠির আদান-প্রদান অনেক দিন পর্যন্ত চলেছিল :

তারপর একসময় স্বাভাবিক নিয়মেই তা বন্ধ হয়ে গেল। সাড়া এল না নীলিমার কাছ থেকে। শুভেন্দু শুনতে পেল ওর বিয়ে হয়ে গেছে। প্রথমে খুবই আঘাত লেগেছিল। মনে হয়েছিল এই দাগ, এই ক্ষত চিহ্ন বুঝি কোনদিন মিলাবে না, এই শূন্যতা কোনদিন ভরে উঠবে না। কিন্তু জীবনের নিয়ম অন্যরকম। সেই নিয়মে শুভেন্দু পড়াশুনোর পাট শেষ করে চাকরি সংগ্রহ করল। বাবার অনুরোধে বিয়েও করল। নীলিমার স্মৃতি প্রায় মুছে গেল মন থেকে, কিন্তু চায়ের অভ্যাসটি গেল না। বরং চা-রসিক হিসাবে বন্ধু মহলে শুভেন্দুর বেশ খ্যাতি বেড়ে উঠল। চা শুধু খায়ই না শুভেন্দু, বন্ধু-বান্ধবকে ডেকে খাওয়ায়ও। সবাই বলে, চায়ের এমন স্বাদ এমন সৌরভ আর কারো বাড়িতে মেলে না। অবশ্য এ কৃতিত্ব শুধু শুভেন্দুর একার নয়, তার স্ত্রী মানসীও এর অর্ধাংশ ভাগিনী।

লাঞ্চের সময় অফিসের বেয়ারা অন্য খাবারের সঙ্গে চা-ও নিয়ে এল। সেই তরল পানীয়ের মধ্যে পুরনো দিনের অনেক প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল শুভেন্দু। কতদিন যে কত জায়গায় নীলিমার সঙ্গে সে চা খেয়েছে তার ঠিক নেই। কখনো বাগানে, কখনো ছাদের কোণে,

কখনো দুপুর রোদে, কখনো বৃষ্টির সময় জানলাটির ধারে বসে দুজনে চায়ের কাপ সামনে নিয়ে গল্প করেছে। সেই অতীত দিনের মধুর দিনগুলির কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ইচ্ছে হোল আজ নীলিমার ওখানে গিয়ে চা খেলে কেমন হয়! নিমন্ত্রণ অবশ্য কাল, কিন্তু একদিন আগে গিয়ে ওকে অবাক করে দেবে।

অফিস ছুটির পর সোজা বাড়ি চলে গেল শুভেন্দু। সিমলা স্ট্রীটের একটি ফ্ল্যাট নিয়ে ওরা থাকে। ফেরা মাত্র তিন বছরের ছেলে এসে জড়িয়ে ধরল, 'বাবা আমার জন্যে কি এনেছ?' কিন্তু শুভেন্দু আজ বড় অন্যমনস্ক। মানসীও এগিয়ে এসে বলল, 'আজ যে বড় সকাল-সকাল ফিরছ?'

শুভেন্দু বলল, 'হ্যাঁ, এক্ষুণি আবার বেরোতে হবে।' অফিসের পোশাক ছেড়ে সাধারণ ধুতি-পাঞ্জাবি পরল শুভেন্দু। মনে মনে আগেই ঠিক করেছিল জমকালো বেশে নীলিমার ওখানে যাবে না, আটপৌরে সাধারণ বেশে গিয়েই উপস্থিত হবে, যেন নীলিমার অবস্থার সঙ্গে ওকে মানায়।

মানসী জিজ্ঞেস করল, 'এত কি তাড়া চা খেয়ে যাবে না?'

শুভেন্দু বলল, 'না সময় হবে না। জরুরী দরকার আছে।' আজ নীলিমার ওখানে গিয়ে প্রথম সান্ধ্য চা খাবে ঠিক করেছে শুভেন্দু।

গাড়ি নিল না, হেঁটে গিয়ে ট্রাম ধরল। সার্কুলার রোডে পড়ে তেত্রিশ নম্বরের বাস ধরল শুভেন্দু। নীলিমা যে বাসে রোজ যাতায়াত করে সেই বাসে। গাড়িতে অত্যন্ত ভিড়, সারাটা রাস্তা প্রায় দাঁড়িয়ে যেতে হোল তবু মনে মনে এক অদ্ভুত বৈচিত্র্যও অনুভব করল শুভেন্দু। যেন দুর্গম পথে অভিসারে বেরিয়েছে।

বাস থেকে নেমে নীলিমার দেওয়া ঠিকানা ধরে ওদের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল শুভেন্দু। শহরের একেবারে বাইরে জনমানবহীন অন্ধকার জীর্ণ একটা পোড়ো-বাড়ির সামনে এসে থামতে হলো ওকে। কড়া নাড়তে একটা হ্যারিকেন হাতে নীলিমা এসে সামনে দাঁড়াল।

বিস্মিত হয়ে বলল 'তুমি! তোমার না কাল আসার কথা ছিল!'

শুভেন্দু বলল, 'কালকে সন্ধ্যার চেয়ে আজকের সন্ধ্যা অনেক কাছে।'

নীলিমা বলল, 'এসো, আমিও এই একটু আগে ফিরলাম।' এত দেরি করে কেন ফিরল সে কথাটা অবশ্য আর নীলিমা জানাল না। স্কুলের মাইনে আজ হয় নি, প্রতিবেশীর কাছে গোটা পাঁচেক টাকা ধারের চেষ্টায় বেরিয়েছিল পায় নি। নীলিনা বলল, 'এসো যা বাড়ি ঘরের অবস্থা, তোমার ভারি কষ্ট হবে।'

শুভেন্দু বলল, 'কষ্ট তো তোমারও হচ্ছে। কিন্তু এভাবে অজ্ঞাতবাস করে লাভ কি।'

নীলিমা বলল, 'তোমার কি ধারণা, ইচ্ছা করে অজ্ঞাতবাস করছি। করতে বাধ্য হচ্ছি, এসো।'

ভিতরের একখানা ঘরে গিয়ে নীলিমা শুভেন্দুকে বসতে দিল। আসবাবের মধ্যে একখানা ছোট তক্তপোশ, তাতে ছেঁড়া একটা সতরঞ্চি পাতা। নীলিমা বলল, 'দাঁড়াও, বিছানার চাদরটা পেতে দিই।'

শুভেন্দু সেই ছেঁড়া সতরঞ্চির ওপর বসে পড়ে বলল, 'থাক থাক আর চাদরের দরকার নেই। তারপর খবর-টবর বল। বাড়ির আর সব কোথায়।'

নীলিমা সংক্ষেপে তাদের পারিবারিক দুর্ভাগ্যের বিবরণ দিল। বহু টাকা দেনা রেখে বাবা মারা গেছেন, মা-ও আজ বছর তিনেক হল নেই। দাদা টিবি হাসপাতালে। অসুখের আগে বিয়ে করেছিলেন দুটি ছেলে-মেয়েও হয়েছে। তাদের ভরণ ভার নীলিমার ওপর। আগের দিন চেতলা থেকে বৌদির কাকা এসে সবাইকে নিয়ে গেছেন তার খুড়তুতো বোনের বিয়ে।

এসব কথা সেরে নীলিমা একটু ম্লান হেসে বলল, 'কিন্তু এমন দিনেই এলে তোমাকে যে কিছু আনিয়ে দেব তারও যো নেই, কোন দোকানপাট নেই ধারে-কাছে, এমনি পাড়া।'

শুভেন্দু বলল, 'হয়েছে। তোমার আর ভদ্রতা করতে হবে না। দিতেই যদি হয় এক কাপ চা দাও।'

নীলিমা বলল, 'চা।'

শুভেন্দু বলল, 'হ্যাঁ, চা খেতেই তো এলাম।'

হ্যারিকেনের ম্লান আলোতেও শুভেন্দু লক্ষ্য করল নীলিমার মুখের রঙ বদলেছে। চায়ের প্রসঙ্গে, চায়ের অনুষঙ্গে রঙ লেগেছে দুনিয়ায়।

নীলিমা বলল, 'বোসো, আসছি।'

নিস্তব্ধ পাড়া, নির্জন ঘর। বাইরে রাত্রির অন্ধকার। শুভেন্দু মনে মনে ভাবল বহুদিন পরে চা খাওয়ার এক নতুন পরিবেশ জুটেছে। মুখোমুখি বসে চায়ের পেয়ালা হাতে নীলিমাকে যদি আজ জিজ্ঞেস করে শুভেন্দু, 'নীলি, সেই দিনগুলি কি একেবারেই গেছে, তাদের কি আর একটিবারের জন্যও ফিরিয়ে আনা যায় না? তা হলে কি খুব অন্যায় হবে?'

একটু বাদে এক কাপ চা এনে নীলিমা শুভেন্দুর হাতে তুলে দিল। আঙুলে আঙুলে ছোঁয়া লাগল দুজনের।

শুভেন্দু বলল, 'তোমার চা।'

'আনছি।'

বলে নিজের চায়ের কাপটিও নিয়ে এসে সামনে বসল নীলিমা। সেই আগেকার দিন যেন ফিরে এসেছে। বলল 'শুধু চা-ই কিন্তু দিচ্ছি।'

শুভেন্দু বলল, 'চা-ই দাও নি, তা তুমি নিজেও জানো।' বলে আস্তে আস্তে চায়ের কাপে চুমুক দিল শুভেন্দু। আর সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সেই প্রথম দিনের মতই মুখ বিকৃত করে কাপটি তক্তপোশের উপর নামিয়ে রাখল। অতি বিশ্রী একটা গন্ধে পেটের নাড়ী যেন উল্টে আসছে। এত বাজে চা জীবনে শুভেন্দু মুখে দেয় নি।

নীলিমা বিস্মিত হয়ে বলল, 'কি হলো।'

'না কিছু হয় নি।' বলে কাপটি আর একবার হাত বাড়িয়ে নিতে গেল শুভেন্দু। কিন্তু মনের যতখানি উৎসাহ আছে অবাধ্য হাতের যেন ততখানি আগ্রহ নেই। নীলিমা ততক্ষণে সব টের পেয়েছে। বাধা দিয়ে বলল, 'থাক, এ চা তুমি খেতে পারবে না, আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।'

এই দ্বিতীয় বার অপ্রস্তুত হোল শুভেন্দু। ওর মুখে আজও কোন কথা ফুটল না। শুভেন্দুর ইচ্ছা করতে লাগল সেদিনের মত নীলিমা আজও ওর সমস্ত অপটুতা হেসে উড়িয়ে দেয়, সেদিনের মত উচ্ছল হাসির ঢেউয়ে সমস্ত ব্যবধান, অভ্যাস আর অনভ্যাসের সমস্ত বৈষম্য ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তা হলো না। নীলিমার মুখে আজ আর হাসির লেশমাত্র নেই। ক্ষমাহীন কঠিন চোয়ালে সে মুখ যেন আর নীলিমার নয় অন্য কোন অপরিচিতার।

বাইরে ঘন জমাট অন্ধকার। আর সেই দীর্ঘ বিশ্রী পথ, দুদিকে কাঁচা চামড়া আর নর্দমার গন্ধ। শুভেন্দুর হঠাৎ মনে হোল, এসব পার হয়ে কতক্ষণে একটি স্বাদু সুরভিত চায়ের কাপ সে মুখে তুলতে পারবে। অনেকক্ষণ সে চা খায় নি।

●

দিনান্ত

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

১

প্রিন্সিপ্যাল বলেছিলেন, 'রবিবার দিন একবার যাবেন আমার ওখানে। এই ধরুন বিকেল চারটে সাড়ে চারটের মধ্যে।'

'আচ্ছা স্যার, যাব।'

কথাটা আলতোভাবে বলেছিলেন, মনের দিক থেকে কোনো তাগিদ ছিল না। থাকবার কথাও নয়। আসল গরজটা ছিল হিমাংশুর নিজেরই।

প্রিন্সিপ্যাল নতুন এসেছেন। বয়েস অল্প, চল্লিশ-বেয়াল্লিশের এধারে নয়, কিন্তু দস্তুর মতো ভারিক্কী গম্ভীর চেহারা। চোখ মুখ দেখলে বেশ শান্ত আর বিবেচক বলে মনে হয়। কেন কে জানে, প্রথম দৃষ্টিতেই হিমাংশুর ধারণা জন্মেছিল যে লোকটি তার কথাগুলো মন দিয়ে শুনবেন, প্রতিকারও করবেন দরকার মতো।

কিন্তু গরজ হিমাংশুর বলেই প্রিন্সিপ্যাল ভুলে গেছেন। হাজারো কাজের ভেতরে বুধবারের এক টুকরো কথা রবিবার পর্যন্ত মনে থাকবে এমন আশা করাই অন্যায় হয়েছিল হিমাংশুর। তারই উদ্‌যোগ করে কথাটা মনে করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। এমন কি, কালও যখন কলেজে চিঠিপত্র সই করিয়ে নিয়েছে, তখনও বলতে পারত—'স্যার, রবিবারে বিকেলে কিন্তু আপনার ওখানে আমার যাওয়ার কথা আছে।'

সেই কথাটাই বলা হয়নি। এবং আজ দুপুরে প্রিন্সিপ্যাল তাঁর বন্ধু ধরণী রায়ের সঙ্গে কোন্ এক ফরেস্ট বাংলোয় বেড়াতে গেছেন। ফিরবেন কাল সকালে।

চাকরের কাছ থেকে তথ্যটি সংগ্রহ করে হিমাংশু ফিরে আসছিল। এমন সময় বসবার ঘরের বড়ো একটা জানলা খুলে গেল। জানলার

পর্দা সরিয়ে ফ্রেমের ভেতরে ছবির মতো ফুটে উঠল একটি মেয়ে। কাঁধের ওপর এলো চুলের গুচ্ছ নেমে এসেছে, কপালে গাঢ় এক বিন্দু রক্তের মতো জ্বলন্ত সিঁদুরের টিপ, তাকে ঘিরের লাল শাড়ীর পটভূমি।

আর জানলার ওপরে, ছাতের ওপরে যে আকাশ ছিল, হিমাংশু দেখল শরতের হলুদ রোদে তার রঙ কাঁটালিচাঁপার পাপড়ির মতো। এক টুকরো ভবঘুরে মেঘ সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে ছিল, যেন একটা শাদা প্রজাপতি। অনেক দূরে দুটো শকুনের ডানা ভাসছিল কি ভাসছিল না। জানলা, মেয়েটি, আকাশ, মেঘ—সব এক সঙ্গে মিলে যেমন ফ্রেমে বাঁধা অথচ ফ্রেম ছাপিয়ে পড়া একখানা ছবি হয়ে রইল, তেমনি কে যেন হিমাংশুর পা দু'টোকেও পুঁতে দিলে মাটির ভিতরে—লনের ফুলধরা কাঞ্চন গাছটার পাশে সে-ও নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সময়ের হিসেবটা মাথার ভেতর দিয়ে বয়ে গেল বিদ্যুতের চমকে। এগার বছর। না—আরো দু-এক মাস বেশি হয়েছে হয়তো। আকাশে সেদিন শরতের রঙ ছিল না—একটা তপ্ত দিনের রুদ্র আভাস ফুটে উঠেছিল ধীরে ধীরে। একটা সুটকেস হাতে করে মাথা নামিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছিল হিমাংশু। ফসলহীন মাঠ আর রুক্ষ আলের ওপর দিয়ে দেড় মাইল স্টেশনের রাস্তা পাড়ি দিতে দিতে অমিতার জন্যে শেষ যন্ত্রণায় জ্বলেছিল সে।

যদি বিকেলের আলো চারিদিকে এত ধারালো হয়ে না থাকত, যদি জানলার ফ্রেমের ভেতরে প্রায় কোমর পর্যন্ত ফুটে না উঠত অমিতার, যদি তার দিকে চোখ পড়তেই অমিতা ছবির চাইতেও নিথর না হয়ে যেত, তা হলে এমন একটা সম্ভাবনার কথা হিমাংশু ভাবতেও পারত না। কোনো পড়ন্ত বেলার ছায়ায়, কোনো রাত্রির আলো অন্ধকারে দূর থেকে হঠাৎ দেখে হয়ত খুব চেনা কারো একটা আদল মনে আসত, তারপরেই ভাবত—এমন তো কত হয়। ওই মেয়েটিই যে একান্তভাবে অমিতা—

এগারো বছর কয়েক মাসের ওপার থেকে কোন্ একটা দুর্বোধ বৃত্তকে সম্পূর্ণ করে আবার হিমাংশুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, এ-কথা ভাববারও তার দরকার পড়ত না। কিন্তু আশ্চর্য, তাই ঘটল।

মেয়েটি অমিতা। নিজের অস্তিত্বে যদি হিমাংশুর সন্দেহ না থাকে তা'হলে এতেও সন্দেহ নেই।

খোলা জানলাটা আবার শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল, আচমকা যেন একটা রিভলভারের আওয়াজ শুনল হিমাংশু। ঘাড় না ফিরিয়েও সে বুঝতে পারল জানলার ফ্রেমে ছবির চাইতেও নিশ্চল ছবিটা আর নেই। কোনো এক অন্ধকার ঘরে আরো গভীর অন্ধকার সৃষ্টি করে সেখানেই লুকোতে চাইছে সে। কিন্তু পালানোর জায়গা কি অমিতারই দরকার! হিমাংশু মুখ লুকোবে কোন্খানে? গেটের বাইরে সে সাইকেলটা রেখে এসেছে, ওই সাইকেলে চড়ে এই ঝকমকে দিনের আলোয় এখন শহরের আর এক প্রান্তে যেতে হবে তাকে। না—হিমাংশুর পালাবার জায়গা কোথাও নেই।

কিন্তু আচমকা জানলা বন্ধ হওয়ায় ওই রিভলভারের মতো শব্দটা হিমাংশুর নিশ্চল অসাড় শরীরটাকে সজীব আর সজাগ করে তুলল। যেন তাড়া খেয়েছে, এমনিভাবে বড়ো বড়ো পা ফেলে সে বেরিয়ে এল গেটের বাইরে, তারপর উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল তার সাইকেল।

শুধু এই শহরের শেষ প্রান্তেই নয়; হাজার হাজার মাইল দূরে পালাতে পারলে তবেই যেন নিষ্কৃতি পেতো হিমাংশু। কিন্তু দ্বিতীয়বার পালাবার সাহস আছে তার? মা মৃত্যুশয্যায়, ছোট বোনটার বিয়ে হয়নি —চারদিকের এই অসংখ্য দায়-দায়িত্ব ফেলে সে কোথায় পালাবে?

অথচ অমিতার জন্যে তাকে পালাতে হবে। কিংবা নিজের জন্যেই। হিমাংশুর সাইকেল থেকে কেমন একটা বেয়াড়া আওয়াজ উঠতে লাগল, যেন যন্ত্রণার গোঙানি ফুটে বেরুচ্ছে কারো।

কাঁটালি-চাঁপার পাপড়িরঙা আকাশে তেমনি করে নিথর হয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল দু'টো কালো কালো বিন্দু শকুন।

২

শহরের বাইরে বহুকালের পুরোনো একটা দরগা। বছরের দু'টি একটি দিন ভক্তেরা এখানে চেরাগ জ্বেলে দিয়ে যায়, কবে যেন একবার শিরনিও পড়ে। তা'ছাড়া একেবারে নির্জন। বৃষ্টিতে ফকিরের সমাধির ওপর শ্যাওলা পড়ে, রোদে সে শ্যাওলা কালো হয়ে যায়। দুপুরবেলা ঘুঘু ডাকে, রাতে ঝিঁঝির ডাক ঝম্‌ঝম্ করে বাজতে থাকে চারদিকে. অনেকদিন আগে নাকি একটা চিতাবাঘ এসে একবার এই দরগাতেই আস্তানা নিয়েছিল।

চিতাবাঘের দোষ নেই। সামনে একটা পুরোনো আমবাগান, ঝাঁকড়া, ঝুপসী—বয়েসে আর অযত্নে কেমন কদাকার আর জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে। আম প্রায় হয়ই না, যে দু-চারটে হয় তা এমন অখাদ্য টক যে খুব সম্ভব বাদুড়ে পর্যন্ত খায় না। সকালের রোদেও বাগানের ভেতর খানিকটা বিষণ্ণ ছায়া মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে, কেউ তার ভেতর দিয়ে চলতে গেলে মুখে চটচট করে উড়ে পড়ে পোকার ঝাঁক।

দরগার আর একদিকে ওই রকম পুরোনো একটা পুকুর। শ্যাওলা আর কল্‌মীতে তার বারো আনাই অদৃশ্য, কেবল ঘাটের কাছে একটু-কাল্‌চে জল চোখে পড়ে। কখনো-কখনো ভক্তেরা এখানে হাত-পা ধোয়, রাত্রে শেয়ালে জল খায়। চিতাবাঘের আশ্রয় নেবার মতো জায়গাই বটে।

কিন্তু আজ চিতাবাঘ নয়, হিমাংশু তার সাইকেলটা ঠেলে পুকুর ধারে নিয়ে এল। আজ এখানে তারই লুকোনো দরকার। বড়ো বড়ো ঘাস-গজানো ঘাটের পৈঠাগুলোর দিকে চেয়ে দেখল একবার, হয়তো ভাবল ফাটলগুলোর মধ্যে সাপ থাকতে পারে। কিন্তু তারপরেই কতকগুলো বিবর্ণ ঘাসের ওপর সাইকেলটা আছড়ে ফেলে দিয়ে সে ঘাটের ওপর বসে পড়ল। আকাশের দিকে হলুদের ওপর তখন লালের ছায়া পড়তে শুরু হয়েছে।

একটি লাল শাড়ীর ছায়া।

সে প্রায় বারো বছর হতে চলল। বি-এ পরীক্ষা দেবার পর বন্ধু কেশবের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিল সে।

দিনগুলো বেশ কাটছিল। বেশ কাটছিল—সেই রাতটা না আসা পর্যন্ত।

রাত বোধহয় একটার কাছাকাছি, গভীর ঘুমে তলিয়ে ছিল হিমাংশু। হঠাৎ মশারি তুলে তাকে একটা ধাক্কা দিলে কেশব।

'এই ওঠ—উঠে পড় চটপট।'

হিমাংশু লাফিয়ে উঠে বসেছিল।

'কী হয়েছে, ডাকাত পড়েছে নাকি বাড়ীতে?'

'তার চাইতেও রোমাঞ্চকর।'

'মানে?'

পিঠ চাপড়ে দিয়ে কেশব হেসে উঠেছিল: 'আরে ঘাবড়াবার কিছু নেই। একটা মজার নাটক জমে উঠেছে, দেখতে চাস তো চল।'

'কী পাগলামি হচ্ছে কেশব এই রাতের বেলায়? ঘুমুতে দে আমাকে।'

ঘুমুতে কেশব দিল না। তার বদলে ঘর থেকে টেনেই বের করে আনল এক রকম।

নাটকটা জমেছিল ছ'খানা বাড়ীর পরেই।

প্রচুর গণ্ডগোল সেখানে। সামনে বিরাট জটলা। অনেকগুলো লণ্ঠন, টর্চের আলো। সব গোলমালকে ছাপিয়ে একজনের গলা: 'সব ওই বুড়োর জন্মেই। এই বয়েসে বিয়েটা না করলেই চলছিল না? অমন জোয়ান ছেলে ঘরে, মেয়েটা বড়ো হয়েছে—'

'বুড়োকে পুলিশে দিন মশাই, এ তো সুইসাইডের ব্যাপার নয়—রেগুলার খুনের চেষ্টা!'

কেশব বলেছিল মজার নাটক, হয়তো তার হিসেবে জিনিসটা নিদারুণ মজার। হিমাংশুকে আলতোভাবে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল,

'আসল ব্যাপারটা দেখতে হলে চলে আয় এদিকে।'

এদিকে মানে, বাড়ীটার খোলা সদর দরজার সামনে।

সেখানেও একদল লোক অপরিসীম কৌতূহলে বকের মত গলা বাড়াচ্ছিল ভেতরে। কে যেন মোটা গলায় ধমক দিয়ে বলছিল, 'এখানে আপনারা ভিড় করছেন কেন? চলে যান—যান—'

দু-একজন সরে এল বটে, কিন্তু অধিকাংশেরই নড়বার লক্ষণ দেখা গেল না। এক ধরণের অশ্লীল আনন্দে তাদের চোখ মুখ উদ্ভাসিত। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যখন উঠেই এসেছে, তখন নাটকটার আরো কিছু অংশ না দেখে চলে যাওয়ার পাত্র নয় তারা। যাত্রাটা কেবল জমে উঠেছে, এখন বৃষকেতুর পুনর্জীবনটা না দেখে তারা যায় কী করে?

মোটা গলায় যে লোকটি ধমক দিচ্ছিলেন, বোঝা গেল তিনি ডাক্তার। মাথায় ছাইরঙের পাতলা চুল, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, গলায় স্টেথিস্‌কোপ। ছুটে আসতে হয়েছে বলে আর গ্রামের ডিস্‌-পেনসারীর ডাক্তার বলে জামাটা পর্যন্ত গায়ে পরেন নি, গেঞ্জিটা গুঁজে দিয়েছেন ধুতির ভেতরে। তিনি আবার চীৎকার করে উঠলেন: 'মজা দেখছেন নাকি আপনারা? এদিকে একটা মানুষের প্রাণ নিয়ে টানা-টানি আর আপনারা হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছেন এখানে!'

কে একজন রুক্ষ স্বরে বলল, 'বেশী মেজাজ দেখাবেন না, ডাক্তার বাবু। আমরা প্রতিবেশী, আপদে-বিপদে এসে দাঁড়ানো আমাদের কর্তব্য।'

হাত জোড় করলেন ডাক্তার।

'আমার ঘাট হয়েছে, মাপ করবেন। কিন্তু এখন তো আমি রয়েছি, আমাকে সাহায্য করবার লোকও কেউ কেউ আছে। এখন আর আপনাদের কিছু করবার নেই। যদি দরকার হয়, নিশ্চয় ডাকব আপনাদের। দয়া করে আপাততঃ আপনারা যান—আমার কাজের ভারি অসুবিধা হচ্ছে।'

'ওঃ, ভারি ডাক্তার এসেছেন। ও-রকম কত দেখলাম।' গজর

গজর করতে করতে ভিড় খানিকটা পাতলা হয়ে গেল। হিমাংশু বলল, 'কেশব ফিরে চল।'

পাড়াগাঁয়ের আড়িপাতা বেহায়া মেয়ের মতো কেশব তবু চোখ পেতে দাঁড়িয়ে রইল। নড়তেই চায় না।

'তুই-থাক তবে, আমি চললুম।'

হন হন করে পা বাড়াতে কেশব এসে সঙ্গ ধরল।

'আরে, অত ছটফট করছিস কেন? একটু দেখে গেলে ক্ষতিটা কী!'

'কী আর দেখবি? তা'ছাড়া ডাক্তার—'

'ডাক্তারের কথা ছেড়ে দে। ডাক্তার আমার আপন বড়ো মামা—তা জানিস? ডিষ্ট্রিক বোর্ডের ডিস্‌পেনসারীতে বসে বসে পাড়াগেঁয়ে চাষাভূষোর পেট টিপে আর তাদের ওপর দাঁত খিঁচিয়ে বড়ো মামার মেজাজটাই খিটখিটে হয়ে গেছে। ওতে মাইণ্ড্ করতে নেই।'

'মাইণ্ড্ না করলেও আমার ভালো লাগছে না। চললুম।'

অগত্যা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেশবও সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। হিমাংশু তার কলেজের বন্ধু, ছুটিতে তাদের বাড়ীতে অতিথি। অতিথির সঙ্গে অভদ্রতা চলে না।

দু'জনে বাড়ী ফিরে এল। সেখানেও তখন জটলা। জানা গেল, কেশবের মা তখনো ও বাড়ীতে আছেন, গোকুল মল্লীকের স্ত্রী তাঁর হাত ধরে কেঁদে বলছে—'দিদি, ভয়ে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে জল হয়ে যাচ্ছে, আমাকে ফেলে আপনি যাবেন না।'

হিমাংশুর ঘরে ঢুকে কেশব তার মশারিটা তুলে ফেললে, বসে পড়ল তার পাশে। অর্থাৎ এখন আর হিমাংশুকে সহজে সে শুতে দেবে না। কেশবের মুখের দিকে চেয়ে হিমাংশু বুঝতে পারছিল, এই মুহূর্তে অজস্র কথা সোডার ফেনার মতো গজগজিয়ে উঠছে তার পেটের ভেতর, সেগুলোকে উগলে না ফেলা পর্যন্ত কেশবের শান্তি নেই।

মুখের ওপর একটা অদ্ভুত কুশ্রী হাসি টেনে কেশব বললে, 'দেখলি কিছু?'

'দেখেছি। দু-তিনজন লোক একটি মেয়েকে ছেলেপুলের মতো হাঁটাচ্ছে ভেতরের বারান্দা দিয়ে। মেয়েটা জড়িয়ে জড়িয়ে কী সব বলে চলেছে মাতালের মতো।'

কেশব বলল, 'হুঁ, আফিং খেয়েছিল।'

'আফিং ?' দারুণ রকমের চমক খেল হিমাংশু : 'হঠাৎ কেন খেতে গেল ?'

'আরে সে হল সেই পুরোনো আদ্যিকালের গল্প। গোকুল মল্লিকের ছেলে রেলে চাকরী করে, মেয়েও বেশ বড়ো হয়েছে—নিজের চোখেই তো দেখলি। মজাটা কী জানিস, এরই মধ্যে ছেলের জন্যে একটা পাত্রী খুঁজতে গিয়ে মল্লিক হঠাৎ কি রকম ক্ষেপে গেল। দশ-বছর বৌ ছিল না, মল্লিকের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধিও ছিল না, কিন্তু আজ সাতান্ন-আটান্ন বছরে পৌঁছে দুম করে একটা বিয়ে করে ফেলল। রেগে আগুন হয়ে ছেলে আগ্রা থেকে চিঠি দিয়েছে—তুমি তোমার নতুন স্ত্রীকে নিয়ে নতুন করে সুখে ঘর-সংসার করো, আমার সঙ্গে তোমার আর কোনো সম্পর্ক নেই।'

'আর সেই জন্যে মেয়েও হঠাৎ আফিং খেয়ে বসল ?'

'না—সেজন্যে নয়। নতুন বৌ—কি বলে, আমাদের পাড়াগেঁয়ে ভাষায় হা-ঘরের মেয়ে।'—বেশ মেয়েলি ঢঙে চোখ গোল গোল করে কেশব বলে চলল—'বাড়ীতে খেতে পেত না, এখানে এসে জমিজমা, গোরু-বাছুর পুকুর-বাগানের গিন্নী হয়ে বসল। মল্লিক তো বলতে গেলে একেবারে শ্রীচরণের ছুঁচো হয়ে রইল আর ওর গিন্নী দু'বেলা দাঁতে কাটতে লাগল অমিকে।

'অমি ? মেয়েটির নাম ?'

'হ্যাঁ, ওর ভালো নাম অমিতা। জানিস, মেয়েটা বোকা নয়। আমাদের এদিকে তো কাছাকাছি মেয়েদের হাই স্কুল নেই, যা পড়েছিল ওই ক্লাস সিক্স পর্যন্ত। তারপর নিজের চেষ্টায় ধীরে ধীরে ম্যাট্রিকের জন্যে তৈরী হচ্ছে। বড়ো মামাকে তো দেখলি—

ডাক্তারীতে যাওয়ার আগে মামা আই, এস-সি পাশ করেছিল—কখনো কখনো ওকে পড়ায়। ছেলেদের স্কুলের হেড্‌মাস্টারও বইটই দেন। মানে—বুঝলি—সব দিক থেকে খুবই ভালো মেয়ে। আর চেহারাও তো দেখলি।'

'তা দেখেছি। দেখতে ভালোই।'

'শুধু ভালোই? রীতিমত সুন্দরী।'

—হিমাংশু উত্তেজিত হল: 'আমাদের গ্রামে ওর মতো সুন্দরী মেয়ে একটিও নেই। আর এই মেয়েটাকে মল্লিকের দ্বিতীয় পক্ষ যে কী কষ্ট দেয় ভাই, সে আর তোকে কী বলব। মেয়েছেলেকে তো আর কিছু বলা যায় না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে আমার হাত দস্তুরমতো নিশপিশ করে ওঠে। ইচ্ছে হয় মল্লিককে ধরে ঘা-কতক বসিয়ে দিই।'

একটু চুপ করে রইল হিমাংশু। চারদিকে কথার আওয়াজ, বাড়ীর সামনে দিয়ে মানুষের চলার শব্দ, এই রাতে গ্রামটা মল্লিকের বাড়ীকে কেন্দ্র করে জেগে আছে—আলোচনা করছে—উত্তেজিত হচ্ছে। দূরে বারকয়েক শেয়ালের ডাক উঠল—জুড়িদারেরা সাড়া দিলে ইতস্তত:, তারপর মানুষকে অতি মাত্রায় সজাগ দেখে তারা থমকে গেল।

কেশব একটা বিড়ি ধরালো। পাড়াগাঁয়ের ছেলে—অল্পবয়সে থেকেই বিড়িতে অভ্যস্ত।

'বিড়ি দেব একটা?'

'না—থাক। শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করি। মেয়েটা আফিং জোগাড় করল কোত্থেকে?'

'আরে, মল্লিক খায় যে! শহরে যায়, একবারে পনেরো দিনের আফিং নিয়ে আসে। তাই দুধে গুলে সবটা খেয়ে নিয়েছিল মেয়েটা। কেউ টের পায়নি। হঠাৎ ওর গলা থেকে কি রকম আওয়াজ বেরুচ্ছে শুনে বুড়োর সন্দেহ হয়, দুধের বাটিতে পায় আফিঙের গন্ধ—দৌড়ে খবর দেয় বড়ো মামাকে। বড়ো মামা ছুটে এসে স্টমাক-পাম্প দিয়ে সবটা প্রায় বের করে ফেলেছেন। আর একটু দেরী হলেই—'

হাঁ, আর একটু দেরী হলেই মুক্তি পেতো মেয়েটা।

হিমাংশু আবার বসে রইল চুপ করে। দরজার ভেতর দিয়ে যা দেখেছিল, তা এখনো চোখের সামনে একটা ফ্রেমে আঁটা ছবির মতো অদ্ভুত হয়ে আছে। বাড়ীর লম্বা বারান্দায় সারি সারি লণ্ঠন, যেন দীপালি জ্বেলে দেওয়া হয়েছে, চারদিক আলোয় আলোময়। আর সেই বারান্দা দিয়ে একটি মাঝবয়েসী বিধবা আর জন দুই পুরুষ মেয়েটির হাত ধরে একবার বারান্দার এ-প্রান্তে, আবার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে। মেয়েটির চোখের দৃষ্টি বোজা, সে চলতে চাইছে না, প্রত্যেক মুহূর্তে তারা সারা শরীরটা যেন ভেঙে লুটিয়ে পড়তে চাইছে। সোনার পাতের মতো পা দুটি পড়ছে অসংলগ্নভাবে, গুচ্ছ গুচ্ছ নীল চুল বুকের ওপর এসে পড়ে আঁচল খসে-যাওয়ায় লজ্জা ঢাকতে চাইছে, ঘুমের ঘোরে যেমন করে পাখিরা ডেকে ওঠে, তেমনি করে একটা অস্পষ্ট কাকুলি শোনা যাচ্ছে তার মুখে। হিমাংশু একবার যেন শুনতেও পেয়েছিল—'ঘুমুতে দাও—আমাকে ঘুমুতে দাও না তোমরা—'

বারান্দার নীচে, উঠোনে বসে ছিল আর একজন। বসে ছিল নিজের ভেতরে মাথা মুখ গুঁজে কুণ্ডলী পাকানো একটা কুকুরের মতো। ওপরের সারি সারি লণ্ঠনের আলো হিংস্রভাবে তার ছাঁটা ছাঁটা চুলগুলোর ডগায় ডগায় জ্বলছিল—যেন একটা জানোয়ারের গায়ের রোঁয়ার মতোই দেখাচ্ছিল সেগুলোকে। গায়ের ফতুয়াটার ওপর গলার কাছে চিকচিক করছিল একটা সরু সোনার হার—গোকুল মল্লিক।

কেন ও-ভাবে বসেছিল সে? অনুতাপ করেছিল? শুধু ছবিতে একজন ছিল না—সে মল্লিকের স্ত্রী। খুব সম্ভব কেশবের মা-র হাত ধরে কোনো অন্ধকার কোণায় ভয়ে কাঠ হয়ে বসেছিল সে।

নাটকই বটে। কিন্তু মজার নাটক নয়। একটা দুঃস্বপ্নের মতো মনটাকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে হিমাংশু বলল, 'মেয়েটা বাঁচবে?'

'বাঁচবে বই কি। বড়ো মামা ঠিক টাইমলি এসে গিয়েছিলেন যে।

পাম্প দিয়ে সব বের করে ফেলেছেন।'

'তবে ও-ভাবে হাঁটাচ্ছে কেন? শুতে দিচ্ছে না কেন মেয়েটাকে?'

'ঘুমিয়ে পড়লে ফল খারাপ হতে পারে। সেই জন্যেই জাগিয়ে রাখতে হয়, হাঁটাতে হয়।'

'ও!'

'হয়তো আজ সমস্ত রাত ওইভাবে হাঁটতে হবে মেয়েটাকে।'

'সমস্ত রাত?'

আবার সেই ছবিটা ফুটে উঠল ফ্রেমের মধ্যে। লম্বা টানা বারান্দাটার ওপর দিয়ে সোনার গড়া পা দুখানা আর চলতে পারছে না, যেন এখুনি ভেঙে পড়বে। বন্ধ চোখের কোণায় বুঝি জলের বিন্দু। নীল রুক্ষ চুলের রাশ বুকের ওপর। ঠোঁটের একপাশে রক্তের দাগ, পাম্প দেবার সময় বোধ হয় চিরে গেছে মুখটা। অতল ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে চাইছে সে—'ঘুমুতে দাও, ঘুমুতে দাও আমাকে।'

কী বেদনায় ভরা ছবিটা। কী অসম্ভব করুণ!

কেশব বলল, 'নে, শুয়ে পড় তা' হলে। কী হল জানা যাবে কালকে সকালে। ঘুমো।'

চলে গেল।

কিন্তু ঘুম সেদিন আসেনি। সারা রাত শুধু একটি বিনিদ্র কাকলী দু'কান ভরে বেজেছিল তার, জাগিয়ে রেখেছিল তাকে—'আমাকে ঘুমুতে দাও—আমাকে ঘুমুতে দাও।'

হিমাংশুর চমক ভাঙল খানিকটা সর্‌সর্‌, খর্‌খর্‌ আওয়াজে। চেয়ে দেখল, মধ্যরাতের সেই দূর গ্রাম নয়, সেই ফ্রেমে আঁটা ছবিটিও নয়; এগারো বছর আগেকার সেই উপন্যাসের মতো রাতটাকে মুছে দিয়েছে শরতের লাল রোদ। সে বসে আছে পীরের দরগার ফাটলধরা ঘাটলার ওপরে, একটু দূরে বড়ো বড়ো ঘাস ভেঙে অষ্টাবক্র ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে একটা কদাকার গো-সাপ, জিভটা তার হিল হিল করছে। থেকে থেকে গো-সাপটা আড়চোখে লক্ষ্য করছে তাকে—যেন তার

মতলবটাকে বুঝে নিতে চায়।

হিমাংশু চোখ সরিয়ে নিল। ওই গো-সাপটা যেন তাকে ব্যঙ্গ করছে। ওর কুৎসিত চেহারা, কদর্য চলনের সঙ্গে তারও যেন মিল আছে কোথাও। ও যেন তারই প্রতিচ্ছায়া একটা।

হিমাংশুভূষণ বসু নামে যে পাড়াগাঁয়ের ছেলেটি একটু বেশি বয়েসে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল, তারপর বি, এ, পরীক্ষায় একবার ফেল করে কেশবের সঙ্গ ধরেছিল, এতদিন তার জীবনে স্বপ্ন-কল্পনার দৌড় বেশিদূর পর্যন্ত ছিল না। সে বড়ো জোর কোনো কোনো সিনেমার নায়িকার মুখওলা ক্যালেণ্ডার এনে ঘরে টাঙাত, উপন্যাস পড়ে নায়কের সঙ্গে সহমর্মিতা অনুভব করত, মিলন না হলে কিংবা নায়িকা হঠাৎ মারা গেলে কোনো কোনো দুর্বল মুহূর্তে এক-আধটু কেঁদেও ফেলত। অর্থাৎ, হিমাংশুর জীবন খুব সহজ হতে পারত। আজ এগারো বছর ধরে যে যন্ত্রণা তাকে চেতনে অচেতনে বিঁধেছে, এই সাদা-সিদে জীবনের ছোট-খাটো দুঃখ-সুখের ভেতরেও তাকে কখনো সম্পূর্ণ করে হাসতে দেয়নি, অকারণে এক-একটা বিনিদ্র রাতকে তার চোখের পাতায় ঘনিয়ে এনেছে, সেগুলো কিছুই ঘটত না—যদি সেই রাতটা না আসত।

সেই এক-একটা রাত—যা চক্ষের পলকে মানুষকে অন্য জগতে নিয়ে যায়, তাকে নতুন করে গড়ে দেয়। যে দুঃখ তার জীবনে কখনো আসত না, একটা বটের অলক্ষ্য সূক্ষ্ম বীজের মতো সঞ্চার করে তাকে; নিজের যে পরিচয় সে কখনো পেতো না, একটা জাদুর আয়না মুখের সামনে ধরে তারই ভেতরে তাকে অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তোলে; যেখানে পাথরের একটা নিরনুভব দেওয়াল ছিল, সেটা ভেঙে বেদনার নদী বইয়ে দেয়।

সেই রাত!

বুকভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল হিমাংশুর। চেয়ে দেখল সামনের পুকুরের জলে শরতের শালুক ফুটে উঠেছে দু-চারটে। পুরোনো দরগার এই নিঃসঙ্গ জীর্ণতার ভেতর, চারদিকের এই শূন্যতার মাঝখানেও

কয়েকটা রাঙা শালুক আর একটা জীবনের ইঙ্গিত। সেই রাতে হিমাংশুর বুকের মাঝখানেও এমনি করে একটা ফুলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

ঝপাং করে শব্দ হল একটা, গো-সাপটা মাছের আকর্ষণে ঝাঁপ দিয়েছে পুকুরে। একবারের জন্যে চমকে উঠল হিমাংশু, চেয়ে দেখল শ্যাওলা-পানার ভেতর দিয়ে কুমীরের মতো সাঁতার কাটতে কাটতে এগিয়ে চলেছে গো-সাপটা। ঠক্-কঁর—ঠক্কঁর্-র্—শব্দে একটা তক্ষক রব তুলতে লাগল দরগার ভেতর। তখন মনে হল, বেলা পড়ে আসছে, রোদের রঙ লাল হল, এইবার এখানে আর একটা জীবনাতীত জগতের কাহিনী শুরু হবে।

তা হোক। কিন্তু হিমাংশু এখনি উঠবে কোন্ লজ্জায়? কী করে যাবে এখান থেকে—যখন চারদিকে আলো, যখন চারদিকেই মানুষের মুখ।

সেই রাত। আর একটি মানুষ ঘুমুতে পারছে না, তার অনিচ্ছুক শরীরটাকে—যা ভেঙে পড়তে চাইছে, যা গলে যেতে চাইছে, যা মিলিয়ে যেতে চাইছে ঘুমের অতল সমুদ্রে, তার সেই সমস্ত রাতব্যাপী যন্ত্রণার কথা ভেবে হিমাংশুও সমস্ত রাত ঘুমুতে পারল না। ঝিমুনি এল ভোর-বেলায়, কেশব তাকে টেনে তুলল বেলা সাড়ে আটটায়।

'কিরে, জেগে কাটিয়েছিস নাকি রাতভোর? বৌদি দুবার তোর চা নিয়ে এসে ফিরে গেছে।'

'না—ঠিক জেগে নয়, মানে অসময়ে ঘুম ভেঙে মাথাটাই কেমন যেন গরম হয়ে গেল।'—একটু অপ্রতিভ বোধ করল হিমাংশু: 'ভালো কথা, সে মেয়েটি কেমন আছে রে?'

'ভালো। আউট অব ডেঞ্জার।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী?'—কেশব একটু হাসল: 'পুলিশ কেস হবে এর পরে। অ্যাটেম্প্ টেড্ সুইসাইডের জন্যে হয়তো মাস ছয়েক জেল

হয়ে যাবে।'

'জেল!'—প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছিল হিমাংশু।

মিটমিট করে হেসেছিল কেশব: 'সুন্দরী মেয়েটাকে দেখে সিম্প্যাথি বুঝি উথলে উঠছে তোর? এ সব তো ভাল লক্ষণ নয় হিমাংশু!'

'ফাজলেমী করতে হবে না। সত্যি বল তো, মেয়েটার জেল হবে নাকি?'

'আইনতঃ তাই তো হওয়া উচিত। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই। সেই হাত যে দিয়ে বসে আছে, তাকে কে বাঁচাতে পারে, বল?'

বেদনায় ম্লান হয়ে গিয়েছিল হিমাংশু। মেয়েটির যে যন্ত্রণার চেহারা নিজের চোখে সে দেখে এসেছে, তার পরেও জেল খাটতে হবে? এর চাইতে নির্মমতা কল্পনাও করা যায় কখনো? হিমাংশুর মনে হল একটা ফুটন্ত পদ্মকে যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে পায়ের তলায় সযত্নে পিষে ফেলেছে কেউ। এই নিষ্ঠুরতার কথা জানলে কশাইয়ের ছুরিও শিউরে উঠত!

একটু চুপ করে থেকে হিমাংশু বললে, 'শাস্তি হবে এই মেয়েটারই? আর যারা যন্ত্রণা দিয়ে তাকে আত্মহত্যার পথে পাঠিয়ে দিয়েছিল, তাদের কোনো বিচারই নেই?'

কেশব বললে, 'আমার মেজদা কাল বাড়িতে এসেছে—দেখেছিস তো? মেজদা হল মোক্তার। তুই শুয়ে পড়লি তারপর আরো অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেদের ভেতরে এ নিয়ে আলাপ করছিলুম। মেজদা বলছিল, মেয়েটি দরকার হলে তার বাপ-মার নামে নিষ্ঠুরতার জন্যে আদালতে নালিশ করতে পারত, কিন্তু কোনো কারণেই সে সুইসাইড্ করবার চেষ্টা করতে পারে না। কেস হবে, জেলও অনিবার্য।'

হিমাংশু পাথর হয়ে বসে রইল, একটা কথাও বলতে পারল না।

কেশব বললে, 'যাক গে, তুই আর ও নিয়ে মন খারাপ করে কী করবি! তুই এ গ্রামের লোক নোস, ওদের সঙ্গে তোর কোনো সম্পর্ক নেই, এমন কি এক জাত পর্যন্ত নয়। মেয়েটা মরুক আর ফাঁসিই যাক,

তোর কী আসে যায়—বল্ ? তুই তো এখান থেকে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব কথা ভুলে যাবি।'

হিমাংশু ক্ষুণ্ণ হল।

'কী ভাবিস তুই আমাকে ? হার্টলেস ব্রুট ?'

'ব্রুট ভাবব কেন ?'—আবার মিটমিটে হাসি দেখা দিল কেশবের মুখে : 'যা স্বাভাবিক, তারই কথা বলছি আমি। সে যাকগে—মিথ্যে এসব নিয়ে আর মন খারাপ করবার দরকার নেই। মা অনেকক্ষণ ধরে তোর জন্যে জলখাবার তৈরী করে বসে আছে, সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। খাবি চল।'

কিন্তু খাবারে সেদিন আর হিমাংশুর রুচি ছিল না। সব বিস্বাদ ঠেকেছিল মুখে।

আসলে 'মেয়েটির জেল হয়ে যাবে'—এই কথাগুলো নিতান্তই ঠাট্টা করে বলেছিল কেশব। সাত মাইল দূরের থানায় রিপোর্ট করবার আসল মালিক হলেন কেশবের বড়ো মামা—ডাক্তার বাবু। কিন্তু তিনি গ্রামের লোক, এই মেয়েটির যন্ত্রণার সমস্ত ইতিহাস তিনি জানতেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি ভালোবাসতেন মেয়েটিকে ; তাই তার এত দুঃখ-যন্ত্রণাকে আর অপমান দিয়ে তিনি কালো করতে চাননি। ব্যাপারটা ধামা-চাপা দিয়ে লুকিয়ে ফেলেছিলেন ! খুব সম্ভব আইননিষ্ঠ ডাক্তার জীবনে এই প্রথম আর এ-ই শেষবার আইন ভঙ্গ করেছিলেন স্বেচ্ছায়।

অনেক গল্প হয়েছিল তাঁর ডিসপেনসারিতে বসে।

'গোকুল মল্লিকটাই ক্রিমিন্যাল। ওরই জেল হওয়া উচিত।'—তিক্তস্বরে ডাক্তার বলেছিলেন, 'এখন মধ্যে মধ্যে আমার কাছে কাঁদুনি গাইতে আসে। বলে, ভারি ভুল করেছি। কেন, বিয়ে করবার সময় মনে ছিল না ? অল্পবয়েসী একটা মেয়েকে দেখেই মাথাটা একেবারে ঘুরে গেল ?'

'সংসারে যখন অশান্তি, তখন গোকুলবাবু নিজের মেয়ের বিয়েটা দিয়ে দিলেই তো পারেন।'

'মেয়ের বিয়ে দিতে হলে খরচ করতে হবে না ?'—ডাক্তারের গলায় বিষ মিশল : 'মল্লিক হাড়-কেপ্পন, ভুল করে হাত দিয়ে একটা পয়সা গলে গেলেও তার বুক ফেটে যায়। আমি তো বলেছিলুম, মেয়েটার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, লেখাপড়া করতে চায়, দিন না টাউনে পাঠিয়ে। হোস্টেলে থাকবে, পড়াশুনা করবে। সে কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল মল্লিক। "হোস্টেলে রেখে মেয়েকে পড়াব! দেউলে হয়ে যাব যে!" রাস্কেল্! ও দেবে মেয়ের বিয়ে ?'

'কী অন্যায় !'—এ ক্ষোভও বেরিয়ে এসেছিল হিমাংশুর মুখ থেকেই।

ডাক্তার বলেছিলেন, 'টু বী ফ্র্যাঙ্ক, সুইসাইড করবার চেষ্টা না করে মেয়েটা যদি কারুর সঙ্গে পালিয়েও যেত, তাহলেও আমি খুশি হতুম। সতেরো-আঠারো বছর তো বয়েস হল, সাবালিকা যদি না হয়ে থাকে, তাহলেও তার কাছাকাছি। এটুকু বুদ্ধিও কি মাথায় আসে না ? কিন্তু ওসব কিছু করবে না, একেবারে শান্তশিষ্ট লক্ষ্মী মেয়ে, কারুর দিকে চোখ তুলে চাইতে পর্যন্ত জানে না। সংসারে এরাই বাঁধা গোরুর মতো মার খেয়ে মরে। হত দজ্জাল, ওই শয়তান সৎমা আর সেনিলিটি ধরা বাপকে সায়েস্তা করে দিতে পারত।'

সেই সোনার পাতের মতো পা দুখানি মাটিতে পড়তে পারছে না—যেন তরল হয়ে এখনই গলে যাবে। দুটি চোখ মৃত্যুর স্বপ্নে বোজা। নীল রুক্ষ চুলগুলো তার বুকের ওপর, ঠোঁটের কোণায় রক্তের রেখা, নেশায় জড়ানো পাখির কাকলির মত তার গলা। সেই ছবিটা হিমাংশুর হৃৎপিণ্ডের মধ্যে বিঁধে রইল ছোরার মতো।

আর সেই ছোরা নিয়েই নিজের বাড়ীতে ফিরে এল হিমাংশু।

...আমবাগানের ওপর সূর্যটা নেমে এল, বেলা শেষের সূর্য। মজা পুকুরের জলের ভেতর থেকে কখন উঠে গেছে গো-সাপটা। কলমী বনের ভেতর দিয়ে শালুক পাতায় পা ফেলে ফেলে শিকার খুঁজছিল জলপিপি। একটা ফড়িঙের স্বচ্ছ সোনালি পাখা কাঁপছিল হিমাংশুর কানের কাছে। আকাশের রঙ আরো নিবিড় নীল হয়ে এল—এর পর

সোনা মেখে কালো হয়ে যাবে। হিমাংশুর মনে হল, এবার তার বাড়ী ফেরা উচিত। কিন্তু এখনো অন্ধকার নামেনি—এখনো আত্মগোপনের উপায় নেই, এখনো লোকে তার মুখ দেখতে পাবে।

সে চিঠি লিখেছিল কেশবকে।

'যদি মল্লিক মশাইয়ের আপত্তি না থাকে, আমি অমিতাকে বিয়ে করতে চাই।'

জবাবে কেশব লিখল: 'আশ্চর্য হইনি, তোর মুখচোখ দেখে মনে হয়েছিল সিনপ্যাথি যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে চাইছে। প্রস্তাব ভালো. পাত্র হিসেবে তুই চমৎকার, কিন্তু মল্লিক মশাই সুবর্ণবণিক—সেটা খেয়াল আছে? জাতের বালাই কাটতে পারবি? আমি বড়োমামাকে তোর চিঠিটা দেখিয়েছিলুম। মামা বললেন, বুড়ো মল্লিক আপত্তি হয়তো করবে না, আর আপত্তি করলেও মামা তাকে ম্যানেজ করে নেবেন। কিন্তু সত্যিই তোর সাহস আছে? তাহলে আর একবার চলে আয় এখানে। মেয়েটির সঙ্গেও একটু আলাপ পরিচয় হোক। তারপর—'

'তারপর।'

'সন্দেহ নেই, বড়োমামা সাহায্য করেছিলেন অনেক। তাঁর বাড়ীতে মেয়েটিকে যখন পড়তে আসত, তখন নানা কাজের ছুতোয় উঠে যেতে হত তাঁকে, পড়াবার ভার হিমাংশুই নিত। কেশবও আবহাওয়া তৈরী করত সাধ্যমতো, ফাঁক পেলেই গুণকীর্তন শোনাতো হিমাংশুর—বলত, এমন ভালো—এমন ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র আর হয় না।' হিমাংশু যে এক বছর বি-এ পরীক্ষায় ফেল করেছিল এবং এবার সে কোনোমতে পাশ করলেও করে যেতে পারে, এ-সব তথ্য বেমালুম গোপন করে গেল কেশব।

আর হিমাংশু দেখল, ছবির ফ্রেমে যতটুকু ধরা পড়েছিল মেয়েটি তার চাইতেও অনেক বেশি সুন্দর। তার যে চোখ দুটি মৃত্যুর স্বপ্নে সেদিন মগ্ন হয়েছিল, আজ তারা অনেক সন্ধ্যা, অনেক সকালের আলোয় তার কাছে জীবনের ভেতর ফুটে উঠল। হিমাংশু দেখল, সেখানে কত ভয়,

কত শূন্যতা। বার বার মনে হল, এই শূন্যতার ভেতরে নিজেকে সে প্রতিষ্ঠা করবে কেমন করে?

শুধু একটা জায়গায় তার জিৎ ছিল। গানের সুর ছিল তখনো তার গলায়।

'তুমি গান শেখো না কেন অমিতা?'

'কে শেখাবে?'

'আমি শেখাতে পারি।'

'আপনাকে কোথায় পাব? দুদিন পরেই তো চলে যাবেন।'

তারপরেই বলা চলে, যদি যাই, একলা যাব না—তোমাকে নিয়ে যাব। কিন্তু মেয়েটির চোখদুটির দিকে চেয়ে সে কথা বলতেও যেন ভয় করে। মনে হয়—নিজের অগোচরে কখন তাকে আঘাত দিয়ে বসবে, যে যন্ত্রণার ভেতর সে তলিয়ে আছে প্রতিদিন, নতুন করে রক্ত ঝরাবে তা থেকে।

কাজেই মুখের কথা রূপ পেলো গানে।

'একদা তুমি প্রিয়ে
আমারি এ তরুমূলে
বসেছ ফুল সাজে
সে-কথা কি গেছ ভুলে?'

আলোয় চোখ দুটো বেঁচে উঠতে চাইল। হিমাংশু অনুভব করল: বলা যায়—এখনই বলা যায়। তবু সাহসে কুলিয়ে উঠল না। শেষ পর্যন্ত বলবার ভার কেশবকেই দিতে হল। দেরী করবার আর উপায়ও ছিল না, কারণ বন্ধুর বাড়ীতে এসে পড়ে থাকারও একটা ভদ্ররকম সীমা আছে—সে বন্ধু যতই প্রিয়তম হোক।

কেশব এসে বললে, 'ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলেছে মেয়েটা।'

রক্তে অনিশ্চয়তার ঝড়। অবরুদ্ধ গলায় হিমাংশু জিজ্ঞেস করল: 'রাজী না অরাজী?'

'অরাজী মানে? হাতে স্বর্গ পেয়েছে!'

'ওর বাবা ? গোকুল মল্লিক ?'

'পণ দিতে হবে না, মিনিমাম খরচ, সে বুড়ো তো লাফিয়ে উঠবে। তা ছাড়া নিজের জাত না হলেও কুজাত তো নয়, আপত্তিই বা করবে কেন ? ওর দ্বিতীয় পক্ষের প্যাঁচাটির হাড়ে বাতাস লাগবে নিশ্চয়। তবু যদি গাঁইগুঁই করে—মামা আছেন। বুড়োর—' একটু গলা নামিয়ে কেশব বললে, 'কয়েক বছর আগেও এটা-ওটা দোষ ছিল, কোত্থেকে খারাপ রোগও বাধিয়ে এসেছিল। মামাই গোপনে চিকিৎসা করে সারিয়ে তুলেছিলেন। সে-সব অস্ত্র মামার হাতেই আছে—তাই ওঁকে যমের মতো ভয় করে বুড়ো।'

'বুড়োর তো অনেক গুণ তাহলে!'

'অনেক।'—কেশব মাথা নাড়ল: 'কিন্তু ছেলেমেয়ে দুটো আশ্চর্য ভালো, মনে হয় যেন আলাদা একটা জগৎ থেকে এসেছে ওরা। আসলে ওর আগের স্ত্রী ছিলেন লক্ষ্মীর প্রতিমা—এরা তাঁরই পুণ্যের ফল। খুব জিতে গেলি ভাই হিমাংশু, জীবনে তুই সুখী হবি। জাতের সংস্কারটাও যে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিস, দেখিস ভগবান তোকে আশীর্বাদ করবেন।'

কেশবের ভারী বিশ্বাস ছিল ভগবানের ওপর।

তারপরের অংশটা যেমন দ্রুত, তেমনি সংক্ষিপ্ত।

দশদিন পরে বিয়ের দিন ঠিক করে—গোকুল মল্লিকের সম্মতি আদায় করিয়ে—হাওয়ায় উড়তে উড়তে বাড়ী ফিরেছিল হিমাংশু। সেদিন তেইশ বছর বয়েসে তার মনে হয়েছিল, পৃথিবীটা খুব সহজ জায়গা, এখানে সবকিছু একটি নিশ্চিত সরলরেখা ধরে এগিয়ে চলে। অসবর্ণ বিয়ে করে, একটি অসহায় মেয়েকে উদ্ধার করে—যে অতুল কীর্তি সে রাখতে যাচ্ছে, তার জন্য বাবা তাকে দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করবেন।

'করেন নি।'

চা খাচ্ছিলেন, প্রস্তাবটা শোনামাত্র তাঁর হাত থেকে চায়ের পেয়ালা

মেঝেয় পড়ে চুরমার হয়ে গেল। তারপর বললেন, 'মেয়েটি সুবর্ণবণিক?'

'হুঁ।'

'তুমি কী, জানো?'

'জানি।'

'না—জানো না। অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশে তোমার জন্ম।'

'বাবা, বৈষ্ণবেরা জাতিভেদ মানতেন না।'

'থামো। বৈষ্ণব ধর্মের তুমি কিছু জানো না, একটা কথাও বলবে না তা নিয়ে।'

'বলব না।' কিন্তু এই মেয়েকে আমি বিয়ে করবই। কথা দিয়েছি।'

'কথা দিয়েছ? কিন্তু আমিও কথা দিচ্ছি, আমি বেঁচে থাকতে কখনো এ অনাচার আমাদের বংশে ঘটতে দেব না। আজকাল কলকাতা নরককুণ্ড হয়ে গেছে, সেখানে বামুনের মেয়ে মুদ্দো-ফরাসের সঙ্গে হাসি মুখে মালা-বদল করে। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে ও-সব শ্রীক্ষেত্তর এখনো তৈরী হয়নি, এ-বিয়ে আমি হতে দেব না।'

হঠাৎ যেন হিমাংশু অনুভব করছিল তার বাবা তার চাইতে অনেক বেশি শক্তিমান, তাঁর যুক্তির জোর যাই থাক—একটা কঠিন ভয়ঙ্কর শক্তি দিয়ে তিনি হিমাংশুকে অভিভূত করে ফেলছেন। তবু সাধ্যমত সে মাথাটাকে ঘাড়ের ওপর সোজা করে রাখতে চাইল, বলল, 'আমি বিয়ে করবই।'

'করবে?'

বাবা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন, দেওয়ালের কোণায় ফিট করা বন্দুকটা দাঁড় করানো ছিল, দ্রুত হাতে দুটো টোটা পুরলেন তাতে। তারপর নিজের গলায় নল ঠেকিয়ে, ট্রিগারে আঙুল লাগিয়ে বললেন, 'করো বিয়ে, কিন্তু তার আগে আমার রক্ত দেখে যাও। বিয়ে করার জন্যে যদি নিজের বাপকেই খুন করতে না পারলে, তা'হলে আর উপযুক্ত পুত্র হবে কী করে!'

মা হাহাকার করে ছুটে এলেন, বাবার হাত ধরে টানাটানি করতে

লাগলেন। বন্দুকে ফায়ার হয়ে গেল একটা—বজ্রের ধ্বনিতে কেঁপে উঠল ঘর, মা-র চীৎকারে বিদীর্ণ হয়ে গেল চারিদিক। কিন্তু মা-র টানাটানিতে বন্দুকের নল সরে গিয়েছিল; তাই গুলিটা বাবার গায়ে লাগেনি—টিনের চাল ফুটো করে বেরিয়ে গিয়েছিল।

বাবা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'একবার ফসকেছে, কিন্তু বার বার ফসকাবে না।'

মা হিমাংশুর দিকে তাকিয়ে, চোখ থেকে জলের বদলে যেন রক্ত ঝরিয়ে বিকৃত গলায় চীৎকার করতে লাগলেন: 'ওরে খুনে—আমাকেও শেষ করে দে তোর বাপেব সঙ্গে। আর দেরী করছিস কেন?'

যেন পাতালে তলিয়ে যাচ্ছে, এইভাবে ঘরের মেঝেতে মিলিয়ে গেল হিমাংশু।

কেশব চিঠি লিখল বারো দিন পরে। 'ভেবেছিলুম তুই দেবতা, দেখলুম জানোয়ারেরও অধম, গোকুল মল্লিকেরও পায়ের ধুলোর যোগ্য নোস। চিঠি তোকে দিতুম না—প্রবৃত্তি হচ্ছিল না, কিন্তু একটা খবর না জানালেই নয়। এত দিনে সত্যিই তোদের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছে অমিতা। কাল শেষ রাতে সে যে কোথায় কোনদিকে চলে গেছে, কেউ জানে না।'

তারও পরের দিন লজ্জায়, গ্লানিতে, ভোরের আলোয়ে একটা তপ্ত বৈশাখের পূর্ব-সংকেত দেখা দেবার আগেই, ফসলহীন মাঠের রুক্ষ কাঁটাভরা আলের ওপর দিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা দিয়েছিল হিমাংশু।

তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে তখন অমিতার জন্য শেষ যন্ত্রণার বহ্ন্যুৎসব।

সেই জ্বালা কতদিন জ্বলেছিল?

কে বলতে পারে—নিশ্চিত করে কে তার হিসেব রাখে! যন্ত্রণার খাতাটা লুপ্ত করে দিতে পারলেই খুশি হয় স্মৃতি। এগারো বছরের ওপর।

বাবা নেই, হিমাংশু দ্বিতীয়বার বি-এ ফেল করে শহরের কলেজের ক্লার্ক। মা-কে এনেছে নিজের কাছে, মা মৃত্যু-শয্যায়। ছোট বোন

হু'টো সঙ্গে আছে—তারা বড়ো হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে তাদের। যে হিমাংশুর বুকের ভেতর এক রাতে একটা অপূর্ব নির্ঝর জেগেছিল, একটা অচেনা দরজা খুলে গিয়েছিল, তার সেই মুক্তির উৎসগুলো ঢেকে দিয়ে আবার দেখা দিয়েছে সেই নিরনুভব পাথরের দেয়াল। হিমাংশু আর গান গায় না, চর্চা ছেড়ে দিয়েছে বহুকাল; আজ, যদি পথে চলতে চলতে হঠাৎ শুনতে পায়, রেডিয়োতে বাজছে—'আজি কি সবই ফাঁকি, সে-কথা কি গেছ ভুলে'—তা হলেও হিমাংশু একবারের জন্যেও থমকে দাঁড়াবে না।

আট বছর ধরে এই কলেজের সে কেরানী-কাম-টাইপিস্ট্। দু' দফা মিলিয়ে মাইনে দু'শোর কাছাকাছি। তাতে সংসারে পনেরো দিন চলে। তারপর টুকটাক টিউস্যন, দু-একটা ছোটখাটো ইন্স্যুরেন্স, সেই সঙ্গে অন্য কোনো ধরনের দালালী জোটানো যায় কিনা, তার ভাবনা। এর মধ্যে অমিতা কোথাও ছিল না—কোথাও থাকবার উপায়ও ছিল না।

শুধু একটি জায়গায় হিমাংশু নিজের মনকে সহজ করতে পারেনি। বিয়ে করেনি সে। মা-র বার বার অনুরোধের জবাবে বলেছে, 'আমি বিয়ে করে কী করব, স্ত্রীকে তো খাওয়াতে পারব না।' তার উত্তর মা সহজেই দিতে পারতেন। বলতে পারতেন, 'একদিন যেচে পাত্রী ঠিক করেছিলি, সেদিন তো খাওয়ানোর ভাবনা মনে আসেনি।' কিন্তু মা সে কথা বলেন না। দুঃখ দিতে চান না বলেই বলেন না।

তবু অমিতা সুদূর ছিল। তার স্মৃতির চাইতেও হিমাংশুর কাছে অনেক বেশি সজাগ ছিল আত্মগ্লানি। সেই কারণেই এতদিন সে বিয়ে করেনি। কিন্তু অমিতা যে আবার এগারো বছর ওপার থেকে ফিরে আসবে, ফিরে আসবে নতুন প্রিন্সিপ্যালের বাড়ীর জানলায়, ফ্রেমে আঁটা ছবির মতো শরতের আলোয় ঝলমল করে উঠবে—কে ভাবতে পেরেছিল এই সম্ভাবনার কথা!

দু'টো ছবির মধ্যে কী তফাৎ!

সেই এগারো বছর আগের রাত্রে অন্ধ চোখে সে মৃত্যুর ভেতরে পরিক্রমা করছিল ; তার সোনার পুতুলের মতো শরীর যন্ত্রণার উত্তাপে গলে ভেসে যেতে চাইছিল, তার নীল চুলের গোছা যেন অনন্ত রাত্রিকে তরঙ্গিত করে আনছিল তার ওপর। আজ শরতের রোদেও আবার তাকেই দেখতে পেলো সে। আজও কালো চুলের গুচ্ছ তার কাঁধের ওপর ভেঙে পড়েছে, কিন্তু তার মুখ আজ অন্ধকারের আড়াল থেকে এক নিঃশঙ্ক সূর্যোদয় আজ লাল শাড়ীর পটভূমি তাকে ঘিরে ঘিরে শাদা মেঘের ওপর অরুণ রাগ—রাত্রির সহচর হিমাংশু সেখানে কোথায় দাঁড়াবে! হিমাংশুর সম্বিৎ ফিরে এল। দরগার মলিন শ্যাওলাধরা প্রাচীরগুলো এখন কালো হয়ে গেছে। সূর্য নেমে গেছে পশ্চিমে, জংলা আমবাগানের মাথায় তার শেষ রঙ। পুকুরের ধার থেকে দু'টো বক আকাশে ডানা ছড়িয়ে দিল। দীর্ঘ ছায়া পড়ল আশপাশে, তীব্র ঝিঁঝির ডাক উঠল।

ঘাটলা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে। বুকের মধ্যে একটা ব্যাকুল কান্না ফেটে পড়ছিল—'ফিরে যেতে হবে—তাকে ফিরে যেতে হবে। কাল প্রিন্সিপ্যাল তাকে আবার তাঁর বাসায় যেতে বলবেন, আর—'

সন্দেহ নেই, মেয়েটি অমিতাই। যদি জানলার ফ্রেমের ভেতর তার কোমর পর্যন্ত ধরা না পড়ত, যদি তাকে দেখে মেয়েটি অমন করে স্তব্ধ হয়ে না যেত, তা হলে—

কিন্তু এ কী সম্ভব হল ? কোন্ পথে—কী উপায়ে দূর গ্রামের সেই মেয়েটি—আত্মহত্যার চাইতেও নিষ্ঠুর ভাগ্যের মধ্যে যে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল, কী করে প্রিন্সিপ্যাল অজয় পালচৌধুরীর স্ত্রী হল সে ? কোন্ ঘটনাচক্রে—কী যোগাযোগে !

হিমাংশু তা' কোনদিন জানবে না—জানবার পথ নেই।

৩

সাতদিন পরে, আবার ভাঙা ঝরঝরে সাইকেলটা চালিয়ে হিমাংশু এল সেই নির্জন দরগার কাছে। আজ সে নিশ্চিত হয়েই এসেছে।

সঙ্গে এনেছে শক্ত একগাছা দড়ি, পকেটে আছে একখানা চিঠি—'কেহই দায়ী নয়।'

না—কেহই দায়ী নয়।

এই এক সপ্তাহে হিমাংশু তিনবার গেছে প্রিন্সিপ্যালের স্ত্রীর কাছে। প্রিন্সিপ্যাল পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, 'আমার স্ত্রী নমিতা।'

নমিতা—অমিতা নয়। তবু নমিতা হতে অমিতার কতক্ষণ সময় লাগে? জীবনের ছাঁচে এমন করে দু'জন এক হয় না, বোধ হয় যমজও নয়। অমিতার কোন যমজ বোনও ছিল না।

অমিতা তাকে চেনেনি। কোনোদিন আর চিনবে না। শুধু শরতের রোদে খোলা জানলার ভেতরে একখানা ছবির মতো সে যে জমাট বেঁধে গিয়েছিল—সে মুহূর্তটা মিথ্যে কথা বলেনি।

এখন দূরে সরে গিয়েও হিমাংশুর আর মুক্তি নেই—অমিতা তাকে চিনবে না—এই যন্ত্রণা তাকে পাগল করে দেবে; আর সে এখানে থাকতে অমিতারও শান্তি নেই—রাহুর ছোঁয়া যে অমিতারও লেগেছিল, বিয়ের দিন ঠিক করে চলে আসার আগে, একটি নিভৃত অবসরে, ভাবী বধূর সসংকোচ সরলতায় সে যে মুখখানি হিমাংশুর মুখের দিকে তুলে ধরেছিল—সে গ্লানিই বা সে কেমন করে ভুলবে!

সাইকেলটা ঘাসের ওপর নামিয়ে রাখল হিমাংশু। চেয়ে দেখল বেলা-শেষের আকাশের শেষ আলোর একটা রক্তিম দীর্ঘ রেখা—যেন অমিতার রক্তাক্ত ঠোঁটের মতো। পরক্ষণেই মাথা নামিয়ে নিলে হিমাংশু, মোটা দড়িটাকে মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে এগিয়ে চলল আমবাগানটার উদ্দেশ্যে—যেখানে ছায়ারা এখন মৃত্যুময় অন্ধকারের পর্দা খুলছে একে একে।

●

স্বপ্নোত্থিতা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

বিশু চক্রবর্তী আর নমিতা হালদারের উপাখ্যান শেষ হয়ে এলো।

ব্যর্থতার সবটুকুই ব্যর্থ নয়, পৌরুষের মর্যাদা আছেই। ভক্ত একলব্য গুরুপায়ে দক্ষিণ অণামিকা বিসর্জন দিয়েও রিক্ত কী? ভক্ত বিশু চক্রবর্তী দেবীর পদমূলে তার কলম সহ গোটা দক্ষিণ হাতটা বিসর্জন দিয়েই বা নিঃস্ব হবে কেন? রোমান্টিক পাঠকবর্গ দাম দেবে তার।

তিন-পেয়ে টেবিলের উপর লেখা কাগজগুলো ছড়িয়ে আছে। হাতল-ভাঙ্গা চেয়ারে বসে লেখক চিন্তামগ্ন। নমিতার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতে বিশু চক্রবর্তীর পরাজিত পৌরুষ কতটা খাড়া রাখা চলে ভাবছে। শিকারীর সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে মনের সর্বত্র বিচরণ করেও বিস্ময়কর মাল-মশলা কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। মেজাজ চড়ছে ক্রমশ।

ভাবছ কি ছাই অত, সত্যি কথাটা সহজ কথাতেই লিখে ফেল না বাপু!

চোখ বড় বড় করে লেখক তাকালো।

কলম কথা বলছে।

লেখক সশ্লেষে জবাব দিল, লেখা জিনিসটা এত সহজ হলে রামা-শামা সবাই লিখত, যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বোলো না।

থামো, থামো—! কলম ঝাঁঝিয়ে উঠল, রামা-শামা লিখলে তো বাঁচতুম। মিথ্যে কথার জাহাজ নয় তারা এমন, সাত কথা বলতে আমাকে সতের পাক ঘোড়দৌড় করিয়ে আনত না তোমার মত। তোমার নমিতা হালদারের দেখা মেলে পথে-ঘাটে ট্রামে-বাসে—অথচ করছ এমন যেন কোন নন্দনকাননের দুর্লভ উর্বশীটি।

লেখক হাসতে লাগল মৃদু মৃদু। বলল, নিতান্ত তোমার পরিশ্রমের কথাটা তুললে বলে রাগ করলাম না। কিন্তু নমিতা হালদারের সম্বন্ধে

আর একটু সমঝে কথা বোলো। ট্রামে-বাসে সে চড়ে না।

চড়ত। নিজের পয়সার চড়ত তোমাদের মত হা-ঘরে গৌরী সেনের দল থাকতে এখন আর চড়বে কেন? তোমরাই মেয়েটাকে বিগড়ে দিলে।

দেখো, মেয়েটা মেয়েটা কোরো না বলছি, সম্ভ্রান্ত মহিলা তিনি।

কলম হেসে উঠল হা-হা করে। সম্ভ্রান্ত নয়, ভ্রান্ত মহিলা। উদভ্রান্তও বলতে পারো। সেদিন তোমাদের ক্লাবে রণু বোস নমিতা হালদারের কর্মোন্নতির রহস্যটা যখন ফাঁস করে দিলে সকলের কাছে, মুখখানা তার দেখবার মতোই হয়েছিল।

মুখে তোমার কালি, ভালো দেখতে জানবে কি করে। কি রকম দেখতে হয়েছিল শুনি?

চটো কেন। হাই-হিল্‌পরা তরুণী মেয়েকে শুক্‌নো ফুটপাতে পা পিছলে আছাড় খেতে দেখেছো কখনো?

না।

চল্‌তি ট্রামে উঠতে গিয়ে আধুনিক মেয়েকে অচেনা পুরুষের বক্ষলগ্না হয়ে ঝুলতে দেখেছ নেক্সট স্টপ পর্যন্ত?

না।

তোমাকে তাহলে বোঝাতে পারলুম না কেমন দেখতে হয়েছিল।

লেখক গুম্ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। সে জানে কি রকম দেখতে হয়েছিল নমিতা হালদারের মুখখানি সেদিন। হালকা গুঞ্জনে পরিবেশটা দিব্বি জমে উঠেছিল....সভ্যরা সবাই ছেঁকে ধরেছে নমিতা হালদারকে—খাওয়াতে হবে। এতবড় একটা প্রমোশান হল, জুনিয়র অফিসার এখন, চালাকি না কি! নমিতা স্মিতহাস্যে ভ্রূকুটি করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে, বাইরে ছিল তিন দিন, সে জানত নাকি কিছু! ট্রেন থেকে নেমেই তো একেবারেই সরাসরি এখানে। সুখবরের সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি রেডি করে রাখা উচিত ছিল উল্টে তারই জন্যে। ছেলেরা হাসছিল ভুঁইফোড় হাসি। মেয়েরা হাসছিল বেদনা-করুণ হাসি। কোণের দিকে একমাত্র বিশু চক্রবর্তী অবশ্য বসেছিল চুপ-চাপ। এমন সময় কোথা

থেকে মূর্তিমান রাহুর মত এসে উদয় হল রণু বোস। মাথা ঝাঁকিয়ে তড়বড় করে বললে, কংগ্রাচ্যুলেশানস্ নমিতা দেবী, কংগ্রাচ্যুলেশানস্।

জবাবে নমিতা হালদার অনাবিল হাস্যে মাথা নোয়ালে একটু। কিন্তু তার পরেই বজ্রপাত। রণু বোস বলে বসল, কিন্তু আপনি একটু সাবধান থাকুন নমিতা দেবী। বড় সাহেবের বউ মিসেস্ পাণ্ডে আপনাকে পাকড়াও করতে পারেন। মাথায় ছিট্ আছে মহিলার—জানেন তো?

সকলেই অবাক। নমিতা আরো বেশি।—আমাকে! আমি তো তাঁকে চিনিনে!

তিনি আপনাকে চেনেন। ইদানীং মিঃ পাণ্ডের সঙ্গে আপনার এক্সকারসানগুলোর খবর পাচ্ছেন কেমন করে যেন। তিনজনকে টপ্‌কে আপনাকে প্রমোশান দেবার খবরও রাখেন দেখলাম। বুড়োকে ঘরে লক্ আপ করে শাসিয়েছেন, ডাইভোর্স করবেন। কিন্তু তারও আগে আপনাকে একবার তিনি দেখে নেবেন বলেছেন। আমিও মনে মনে বলতে ছাড়িনি তোমার মত বুড়িকে থোড়াই কেয়ার করেন আমাদের নমিতা দেবী।

ব্যস্! একেবারে বাসনমাজা জল পড়ল একপ্রস্থ। রণু বোস যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। এক ফুঁয়ে যেন ঘরের আলোটাকে সুদ্ধ নিবিয়ে দিয়ে গেল। এরপর আসর জমানোর প্রয়াস বৃথা। দুই-একজন চেষ্টা করল তবু। কিন্তু নমিতা হালদারের ভ্রূকুটি দেখে সভয়ে থেমে গেল। অতএব একে একে বিদায়ের পালা। সেন কাছে এসে চুপি-চুপি স্মরণ করিয়ে দিল, আজ আমার গাড়িতে আপনার বাড়ি ফেরবার কথা ছিল⋯।

নমিতা মাথা নাড়ল, না—।

সেন চলে গেল। রায় বলল, মেট্রোর দু'খানা ভালো টিকিট কেটেছিলাম, আসবেন?

নমিতা বলল, না—

রায় চলে গেল। মিত্র বলল, মিউজিক হল্-এ আজ ড্যান্স প্রোগ্রাম,

মন্দ ভাল হত, চলুন না···।

নমিতা জবাব দেয়, না!

মিত্র চলে গেল। শেষ চেষ্টা দেখলে গুপ্ত, ডিলাইট কাফেতে আজও বোহেমিয়ান ডিনার মেনু শুনেছিলাম—

নমিতা ঝাঁঝিয়ে উঠল, না!

খাওয়ার প্রস্তাব করে প্রায় চড় খেয়ে প্রস্থান করল গুপ্তও। নমিতা হালদার এদিক-ওদিক তাকাতে চোখ পড়ল কোণে বিশু চক্রবর্তীর ওপর। এক ঝলক আগুন ছড়িয়ে ইশারায় তাকে অনুসরণ করতে বলে ক্লাব-ঘর থেকে বেরিয়ে গেল গট্‌মট্‌ করে।

পথে এসে বিশু চক্রবর্তী মন্তব্য করল, রণু বোস স্কাউণ্ড্রেল।

কী?

নমিতার কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল বিশু চক্রবর্তী। আমতা আমতা করে বলল, এই বলছিলাম ড্যাম ব্লাডি সোয়ায়িন্—

—গরু, ছাগল, গাধা, মোষ, পাঁঠা, উল্লুক ভাল্লুক—রাগে নমিতা আরো জন্তুর নাম হাতড়ে বেড়াতে লাগল।

সাহস পেয়ে সোৎসাহে বিশু চক্রবর্তী যোগ করে দিল, হাঁ—ক্যাঙ্গারু, সজারু, ইঁদুর, ছুঁচো—এক কথায় লোকটা আস্ত জানোয়ার!

লোকটা নয় তুমি।

ঘাবড়ে গিয়ে বিশু চক্রবর্তীর কথা আটকে গেল।—আমি! স-স-সবগুলো?

সবগুলো, আরো অনেকগুলো! নমিতা আগুন, এতক্ষণে বুক ফুলিয়ে বলছ, রণু বোস স্কাউণ্ড্রেল—তখন—বলতে পার নি?

ত-তখন বলব···লোকটা যে বক্সিং জানে!

কাপুরুষ! লোকটা তিন বছর ধরে আমার পিছনে ঘুরে ঘুরেও সুবিধে করতে না পেরে আজ ঝাল ছেড়ে গেল, জানো না?

জানে। বছরের পর বছর ধরে তো নিজেরাও ঘুরছে। তাদের রক্ত রণু বোসের মত এমন অভদ্রোচিত গরম নয় বলেই রক্ষা। আগের

সাহেবও প্রমোশন দিয়ে গেছে, পাণ্ডে তো একেবারে অফিসার বানিয়ে ছেড়ে দিল। তারপর সেনের গাড়ি চড়ানো, রায়ের সিনেমা দেখানো, মিত্রর নাচের প্রোগ্রাম, গুপ্তর ডিনার খাওয়ানো···। বিশু চক্রবর্তীর বুকের ভেতরটা মোচড়াতে লাগল কেমন।

নমিতা হালদার আলটিমেটাম্ দিলে, রণু বোসকে শিক্ষা দেবে কি না জানতে চাই।

বিশু চক্রবর্তী অকূল-পাথারে পড়ল। রণু বোসের মূর্তিটা চোখে ভাসছে। ফুটবল-খেলা পা, বক্সিং-শেখা হাত, শো-দেখানো বুক, আর হুইস্কি-খাওয়া মাথা। বিশু চক্রবর্তীর জলতেষ্টা পাচ্ছে। সহসা যেন একটু আলোক-রশ্মি দেখতে পেল। ক্রমশঃ সেটা বড় হয়ে দেখা দিল চোখে। গম্ভীরমুখে জবাব দিল, দেব শিক্ষা। এমন শিক্ষা দেব যে সে আর জীবনে ভুলবে না।

নমিতা হালদার ঠিক বিশ্বাস করল না। কিন্তু বিস্মিত হল।—কি করবে শুনি?

আমি করব না, লেখক করবে। তার কলমের একটি ব্লো পয়েণ্টমত পড়লেই রণু বোসকে আর উঠতে হবে না, একেবারে ক্লীন নক্ আউট।

ননসেন্স।

পারবে না বলছ?

নমিতা চিড়বিড়িয়ে উঠল, লেখকের ওই বেয়াড়া কলমকে তুমি চেন না? তার কোন্ কথা শোনে ওটা? উল্টে আমাকেই দেবে'খন খতম করে।

বিশু চক্রবর্তী রুখে উঠল প্রায়। জোর দিয়ে বলল, হতভাগা কলমের চৌদ্দ পুরুষ শুনবে এবার কথা। লেখক তার মুখ ভোঁতা করে দিয়ে শোনাবে। তুমি দেখে নিও।

কোন রকমে রাগ সামলে নমিতা বলল, তা হলেও সত্যিকারের রণু বোস তো আর নক্ আউট হচ্ছে না। সশরীরে সে যখন লেখকের কাছে এসে হাজির হবে কৈফিয়ত নিতে, তখন?

বিশু চক্রবর্তীর মুখ শুকিয়ে গেল আবার। কথাটা ভাববার কথা বটে। খানিক চিন্তা করে বলল, তা হলে এক কাজ করা যাক, কলমের ব্লো'টা প্রেস থেকে ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসার আগেই লেখক না-হয় চেঞ্জের নাম করে মাসকতক অন্য কোথাও গিয়ে থাকবে। ততদিন রণু বোস নিশ্চয়ই অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কি বলো?

কিন্তু জবাবে নমিতা যা বলে গেল শুনে বিশু চক্রবর্তী স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে রইল। এক পশলা আগুন ছড়িয়ে নমিতা হালদার চলে গেল। স্ট্যাচুর গায়ে রক্ত চলাচল সুরু হল একটু একটু করে। সমস্ত পুরুষকার গুমরে গুমরে চাড়িয়ে উঠতে লাগল যেন। ভেন্‌জেন্‌স! মার্ডার! রণু বোস, হার্ক দাই ডেথ নেল্! মনে মনে চীৎকার করে লেখককে ডাকতে ডাকতে বিশু চক্রবর্তী বাড়ি ফিরল। দিন কতক জল্পনা-কল্পনা করে লেখক বসল কলম নিয়ে।

রণু বোসের নাক থ্যাবড়া করে দিয়েছে. তিল তিল করে গড়েছে নমিতা-তিলোত্তমা! বিশু চক্রবর্তীর বিদায়-বিষন্ন মুহূর্তটি ভুলতে পারলেই সব শেষ হয়। কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া কলম এই শেষ বেলায় যত ফষ্টি-নষ্টি সুরু করেছে।

চোখ পাকিয়ে লেখক কলমের দিকে তাকালো। কলম নিরীহ মুখে প্রশ্ন করল, ভাবছ কী?

ভাবছ কী! সমস্ত মুডটা নষ্ট করে দিলে এখন লিখি কি করে বলো তো? তোমার বেয়াড়াপনা অসহ্য—নমিতাকে বলা হয়েছে দরকার হলে তোমার মুখ ভোঁতা করে দেওয়া হবে সে কথা জানো?

জানি। কিন্তু তোমাকে আর চেষ্টা করতে হবে না, তোমার মত হাঁদারামের পাল্লায় পড়েছি যখন দু'দিন বাদে মুখ আপনি ভোঁতা হয়ে যাবে আমার। ঘরে বসে যত বীরত্ব, সেদিন রাস্তায় যখন আচ্ছা করে ধোলাই দিয়ে ছেড়ে দিলে নমিতা হালদার তখন তো দিব্বি ঠাণ্ডা পাথরখানার মত সহ্য করলে?

আমি! আমি কে? বিশু চক্রবর্তী সহ্য করেছে, আমি লেখক।

তুমি বিশু চক্রবর্তী। আমার দৌলতে কিছুকাল লেখকগিরি করেছ। এ মুখ ভোঁতা হলে দেখবে পা থেকে মাথা পর্যন্ত তুমি আস্ত একখানা বিশু চক্রবর্তী। সে কথা যাক, শেষ বিদায়ের পালাটা কি রকম লিখতে চাও শুনি?

লেখক আপসের সুরে বলল, এই তো ভালো কথা, কোথায় এ বিপদে, দু'টো পরামর্শ দেবে, না শুধু চিমটি কাটা। আচ্ছা শোনো, যদি বলি, নমিতা তোমার চিরশত্রু রণু বোসকে খতম করেছি, ফলে আমাকেও সে আর আস্ত রাখবে না হয়ত—কিন্তু সেজন্যে আর এতটুকু ভয় করিনে। বিশু চক্রবর্তী বিদায় নিল। তার স্মৃতির সমাধির ওপর ফুটে উঠুক তোমার সফল জীবনের ভরা আনন্দগুচ্ছ।—কেমন হয়?

তোমার মাথা হয়। ওর ভরা আনন্দগুচ্ছের গন্ধ পেলে সমাধির মধ্যে থেকেও তোমার দীর্ঘনিশ্বাস ফুঁড়ে বেরুবে। কলম মুখিয়ে উঠল, বিদায়ের প্রশ্ন উঠে কেন, নমিতা হালদার সেদিন আর কী বলেছে শুনি?

লেখকের মুখ ভার, সেটা কি ভাল কথা যে শুনবে?

তবু, শুনিই না?

বলেছে ইডিয়েট।

তারপর?

তারপর রাস্কেল।

তারপর?

তারপর অনেক কিছু বলেছে, অত আমার মনে নেই।

শেষে?

শেষে বলেছে, জীবনে আর মুখ আমার দেখবে না, আর সব শেষে বলেছে, আমি স্বচ্ছন্দে এবার জাহান্নামে যেতে পারি।

কলম বলল, ঠিকই বলেছে।

লেখক গরম হয়ে উঠল, ঠিক কেন?

নয় কেন। তুমি তার সর্বনাশটি করে এখন দু'লাইন কাব্য করে সরে পড়তে চাইছ, বলবে না?

লেখক অবাক, আমি তার কি সর্বনাশ করলাম ?

তুমিই তো করলে। কি ছিল, আর কেন আজ এমন হয়েছে, বেশ করে ভেবে দেখ দেখি।

লেখক ভাবতে লাগল···দশ বছর আগের সেই কিশোরী মেয়েটি চোখে লজ্জা, ঠোঁটে হাসি, মনে ভয়, চলনে সঙ্কোচ, বলনে দ্বিধা। দারিদ্র্যের অন্তঃপুর থেকে তাকে টেনে এনে ছেড়ে দেওয়া হল জাঁকজমকের রাজপথে। আগে একজনের জন্য গোপনে সাজত, এখন দশ জনের জন্য প্রকাশ্যে সেজে বেড়াচ্ছে। আগে একজনকে দেখলে বুক দুলে উঠত, দশজনের বুকে এখন ক্রমাগত দোলা লাগিয়েও তার আশ মেটে না! ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল লেখক। বলল, সবই তো তার ভালোর জন্যে করেছিলাম—কিন্তু সবার আগে এখন আমাকেই সে ভুলে বসল কেন ?

—তার কারণ আজকের নমিতা হালদারের কাছে তুমি অচল। তোমার গাড়ি নেই, মেট্রোর টিকিট কাটতে পার না, মিউজিক হল্ চেন না, বোহেমিয়ান ডিনার খাওয়াবারও টাকা নেই তোমার—তুমি তার কোন্ কাজে লাগবে ? তোমার আশা দেখিনে, কিন্তু তোমার নমিতা হালদারের কপালেও দুঃখ অনেক আছে।

লেখক বললে, তুমি দেখছি মাস্টার মশাই হয়ে উঠলে। তার কপালে দুঃখ থাকবে কেন, কত লোক তো তাকে লুফে নেবার জন্যে হাঁ করে আছে।

কলম বললে, যেমন তোমার বুদ্ধি। লুফে নেবার জন্যে হাঁ করে নেই কেউ—তাকে নিয়ে লোফালুফি খেলবার জন্যে অনেকে হাঁ করে আছে বটে। তার সতের থেকে সাতাশ বছরের পরিবর্তনটা তো দেখলে, সাঁইত্রিশের কথা ভাবতে পারো ? শুধু কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাতে হবে তখন।

লেখক সচকিত হয়ে উঠল, সে কী ?

আজ্ঞে হ্যাঁ! চুলে পাক ধরবে, রক্ত ঠাণ্ডা হবে। দেখবে, ঘরে-

বাইরে এত লোক কিন্তু সে কারো ঘরণী নয়, পথে-ঘাটে এত ছেলে কিন্তু সে কারো মা নয়। একখানি আস্ত একার করব। কাঁদবে না। সারারাত কাঁদবে। তারপর সকালে উঠে ওই কান্নার ওপর স্নো-পাউডার ঘষে আর রং চড়িয়ে বেরুবে সঙ্গী খুঁজতে। কিন্তু পারতপক্ষে কেউ আর তখন কাছেও ঘেঁষবে না।

কেউ না?

না। সেন না, রায় না, মিত্র না।

কিন্তু আমি! আমি তো থাকব।

তোমারও তখন আর ভালো লাগবে না তাকে।

সর্বনাশ! নমিতা তা হলে বাঁচবে কেমন করে?

তিলে তিলে আত্মহত্যা করে।

লেখক আঁতকে উঠল প্রথম, পরে কলমটাকে মাথার ওপর তুলে আছড়ে ভাঙতে উদ্যত হল।

থামো, থামো, এখনো রাস্তা আছে।

লেখক কলম নামাল, বলো শীগগির, নইলে তোমাকে আস্ত রাখব না আজ। নমিতাকে যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে।

তাহলে নিজে আগে বাঁচো।

নিজে বাঁচব! কেন আমি কি বেঁচে নেই?

না। লেখা ছেড়ে আপাতত আমাকে বিশ্রাম দাও, রোদে পোড়ো জলে ভেজো, শক্ত দুটো হাত দিয়ে টাকা রোজগার করো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। তারপর যাও নমিতার রোগ ছাড়াতে।

রোগ ছাড়াতে!

হ্যাঁ। গত দশ বছরের একটা কাচের খোলের মধ্যে আটকে গেছে মেয়েটা, মাথা খুঁড়েও নিজে আর বেরুতে পারবে না ওটার মধ্য থেকে ওই খোলস তোমাকে ভাঙতে হবে।

একটু নোনতা লেগেছিল। তবে—তবে সেটা আমার হাতের স্বাদও হতে পারে। রোমকূপে ঘাম থাকে তো!

কিন্তু সত্যিই যখন বৃষ্টি নামল তখন ওরা আর এক মুহূর্তও বসল না, সব চীনেবাদাম উড়তে দিয়ে, সব ফড়িংদের ভুলে গিয়ে মাথা বাঁচাতে ছুটল।

একটা চালাঘর কাছেই ছিল। গোলপাতার ছাউনি, একটু এলোমেলো, তিন দিক গিয়ে এক শুধু দর্মার বেড়া আছে, তাতে ছাঁট ঠেকে না। একটা বেঞ্চি পাতা ছিল কে পেতে রেখেছে কে জানে, তার নিচে একটা কুকুর কাতর-কুণ্ডলী হয়ে আশ্রম নিয়েছিল। ওদের বসতে দেখে সে সসম্ভ্রমে সরে গেল।

আঁচলের কোণ দিয়ে মেয়েটি জলের বিন্দুগুলি চেপে চেপে মুছছিল, আর ব্লাউজের হাতায়, কাঁধে যা জমেছিল, ছেলেটি ক্যারাম খেলার মত টোকা দিয়ে সেই ফটিক ফোঁটাগুলো ঝেড়ে ফেলল।

ছুটো হাত দিয়ে টেনে টেনে মেয়েটি তখন চুলগুলো গোছালো করল। এতক্ষণে ফুরসুত পেল পায়ের দিকে তাকাতে।

'ইস্ ভিজে ভারী হয়ে উঠেছে।' পাড়ের ওপরে অন্তত ইঞ্চি চারেক শপশপে, ছেঁড়া ঘাসের টুকরোয় মাখামাখি ঃ নুয়ে পড়ে নিংড়ানো চলে কিনা, মেয়েটি হয়ত ক্ষণেক তাই ভাবল। তলপেটে চাপ না পড়লে, হয়ত নুয়ে পড়ত ও। কাজ নেই, সে ভাবল, তার চেয়ে পা ছুটোকে টানটান করে পায়ের পাতার দিকে তাকাই।

সে তাকাল বলে, তার দৃষ্টির পিছু-পিছু ছেলেটির নজরও পৌছল। সেখানে।

স্লিপার খসে পড়েছে জেনেও কী কারণে কী জানি তখন হঠাৎ অকুণ্ঠিত মেয়েটি প্রদর্শনীর পর্দা তুলেই রাখল। বরং সরে এসে বলল, 'কি দেখছ!'

'কী ধবধবে ফর্সা!'

'ও তো ঢাকা থাকে বলে।' মেয়েটি তাড়াতাড়ি পা গুটিয়ে নিল। 'কী ভাবছিলে তাই বল।'

'শুনলে তুমি হাসবে। ছাখ, আলতা তো তুমি পরো না, কিন্তু

এখন এই সময়ে, বৃষ্টির জল আর ভিজে ঘাস পা দুটিকে যখন ধুয়ে দিয়ে গেছে, তখন পরা থাকলে বেশ মানাত।'

এই কথা শুনে যে-রঙ ওর পায়ে নেই, সেই রঙ মেয়েটির মুখে লাগল। চোখ নামাল। 'ছাখ, অন্য সময়ে শুনলে হয়ত হাসতাম। তুমি জানো, রঙ আমার শিশিতে নেই, মনে নেই, কোথাও নেই। তবু তোমার মুখে এখন শুনতে কিন্তু ভাল লাগল। কারণ—কারণ ও-কথাটা ঠিক তখনই আমারও মনে এসেছিল।'

দুজনের মনে যুগপৎ মৌন রঙের প্রার্থনার কথা জেনে ফেলে দু'জনেই খুব হাল্কা-চাপা হাসতে থাকল।

গোলপাতার চালা ফুঁড়ে টপ টপ জল তখনও সমানে ঝরছিল। ঝুঁটি ধরে নেড়ে অশথগাছের ডালপালাগুলোকে পাগল করে দিয়েই দমকা হাওয়া চালাঘরের আড়ালে এক-লহমা গা-ঢাকা থেকেই ফের ছুটে বেরিয়ে পড়ছিল। একটা জলজ সুবাস কোথা থেকে উঠে এসে সব ঢেকে দিল, ওরা জানে না। আলো কমে আসছে, বৃষ্টি কমছে না। মেয়েটির হাঁটুতে মাথা ডুবিয়ে ছেলেটি আরও একটি গন্ধের আভাস পাচ্ছিল। হয়ত ওর ভিজে পায়ের পাতার। কিন্তু শুধু তা হলে তো এ-গন্ধ আরও মৃদু হত। পায়ের পাতার সঙ্গে তবে কি স্লিপারের কাঁচা চামড়ার গন্ধ মিশেছে? কবে লুকিয়ে খেয়েছিল সেই মদের গন্ধের কথা ওর মনে পড়ল। অন্ততম স্বাদ নয়, তদানীন্তন গন্ধ—গন্ধেরও স্মৃতিমাত্র —সময়ে সময়ে অবশ-বিবশ করে।

'তোমার জামাটা ভিজে!'

'বোতাম খুলে দিয়েছি। গায়ের গরমে আর হাওয়ার টানে শুকিয়ে যাবে।'

'ঠাণ্ডা লাগবে না? জ্বর যদি হয়?' মিষ্টি-দুষ্টু করে ছেলেটি হাসল।

আরও একটু এগিয়ে এল অন্যজন। ছেলেটির কাঁধে থুতনি রেখে বলল, 'তার চেয়ে তুমি আমার একটা কথা শোন। তোমাদের তো অসুবিধে নেই—তুমি, তুমি বরং তোমার জামাটা ছেড়ে ফেল। শুকিয়ে

যাবে।'

'সুবিধা-অসুবিধা এখানে কিন্তু সবারই সমান। অন্ধকারকে তো জানতাম নির্বিকার ও নিরপেক্ষ।'

এবার যা ঘটে ঘটুক, আমি সর্বত্রগামী লেখক, সেখান থেকে সুরুচির মুখ চেয়ে সরে যেতে পারি। (অন্তর্যামী, তাই কখন জোয়ার আসে জানতে পাই) একটু দূরে গিয়ে মর্ত্য দেহ ধরে নদীর ধারে বসে পর পর ছ'টা সাতটা সিগারেট শেষ করে ফিরলেও ক্ষতি নেই।

হলদে ছোপলাগা অন্তর্বাসের চেহারাওয়ালা চাঁদটাকে গাছের ডালপালায় ঝুলিয়ে শুকোতে দেওয়া হয়েছে দেখে আমি ফিরে এলাম।

তখন ছেলেটি চালাঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বাইরে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলছে, 'আর বৃষ্টি নেই।'

মেয়েটি অন্ধকার ঠেলে ওর পাশে এসে দাঁড়াল। পা বাড়াতে গিয়েও একবার তাকাল পিছন ফিরে।

'এ ঘরটা কে বানিয়েছিল, কেন বানিয়েছিল, জানো?'

'না।'

'কেউ জানে?'

'কেউ না।'

'আশ্চর্য।' মেয়েটি বাইরে পা দিল। ভাঙা বেড়া, ফুটো চাল, তবু সে বলল 'আশ্চর্য'। আরও আশ্চর্য, ছেলেটি ওই কথাটিরই প্রতিধ্বনি করল।

'আমি জানি, কেন।' সেই মুহূর্তে প্রবল কোন ইচ্ছা দু'জনেরই ভিতর থেকে নির্গত হয়ে মিলিত হয়েছিল। যোগফল একটি ঘর। হোক ভাঙা, হোক ফুটো, এমন একটি ঘর।

একেবারে খোলা আকাশের তলায় দুজনের নিশ্বাস যুক্ত হয়ে একটি প্রার্থনায় সফল হল।

'যাবে না?'

'চল।'

'হাইওয়ে এখান থেকে দু' ফার্লং দূর। শহরে ফেরার শেষ বাস সওয়া আটটায়।'

দুই

'কতক্ষণ এসেছ?'

'কতক্ষণ আর—এই মিনিট দশেক। তুমি ঘুমোচ্ছিলে, তোমাকে তাই আর ডাকি নি।'

'ও।' ক্লান্ত একটা হাসির ভাব ফোটাতে চেয়ে মেয়েটি চোখ বুজল। ছোট্ট একটি হাই তুলে বলল, 'আমি আর একটু ঘুমোই?'

'ঘুমোও। আমি বরং এই ম্যাগাজিনটার পাতা ওল্টাই। আর কোন ভয় নেই তো?'

'নার্স তো বলে গেল, নেই।'

সন্ধ্যার পর ওদের হাইওয়েতে শেষ বাসে তুলে দিয়ে আসি, সে প্রায় মাস তিনেক হবে। তারপর আরও নানা নায়ক-নায়িকা নিয়ে নাড়াচাড়া করে, বিরহমিলন প্রভৃতি ঘটিয়ে ওদের ভুলে ছিলাম। অবশেষে আমি সর্বশক্তিমান, সীমিত ক্ষেত্রে বিধাতাসমান, লেখক ওদের টেনে এনেছি এখানে, খাস শহরের খিড়কি সড়কের এই হোমে।

মধ্যবর্তী পর্বে একটুখানি ফাঁক রেখে দিয়েছি। পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার্থে লেখকের নোট বইয়ের বর্জিতাংশ থেকে কয়েকটি আলাপের টুকরো জুড়ে দেওয়া গেল।

... ...

'বলো কী! ঠিক বলছ, তোমার ভুল হয় নি ত?'

'হলে তো বাঁচতাম।'

'উপায়?'

'উপায় তো তোমার হাতে। তুমি পুরুষ না?'

(যেন এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবার দরকার ছিল, ছেলেটি এমন ধরণে মাথা নেড়েছিল।)

...   .

'তুমি তো এই সাতদিনেও উপায় ঠিক করতে পারলে না। উপায়টা আমিই তবে বলে দিই। ছাখ, এখনও সময় আছে···রেজেস্ট্রি অফিসে নোটিশ দিলে হয় না?'

উত্তরে ছেলেটি যা বলে নি :

কিন্তু, মণি তুমি তো জানো, আমার চালচুলো কোনটারই ঠিক নেই। পাশ করেছি বটে, কিন্তু পাশ করারা সকলে তো শয়ে শয়ে ঘুরছে। নতুন একজোড়া জুতো জোটাতে পারলে আমিও আর একবার লেগে পড়ি। পুরনো জোড়ায় আর তালি দেবারও জায়গা নেই।···হঠাৎ অবিমৃষ্য কিছু করলে দাদারা ঘাড় ধরে রাস্তায় ছুঁড়ে দেবে। তা ছাড়া তুমি এখনও হস্টেলের ছাত্রী, রেজিস্ট্রির সময়ে তোমার বয়স নিয়ে না ফ্যাসাদ বাধে······

যা বলেছে :

'নোটিস? কিন্তু মণি, সেটা কি খুব ঝুঁকি নেওয়া হবে না?'

তিক্ত হাসি ছড়িয়ে গিয়েছিল মেয়েটির সারা মুখে। 'ঝুঁকি তাহলে একা আমিই নিয়ে যাই, কী বলো?'

...   .

'আমাকে তুমি আর দু'দিন সময় দাও।'

'তুমি রাজী হয়ে যাও।'

'ভাল করে সব খবর নিয়েছ?'

'নিই নি? খুব বিশ্বাসযোগ্য জায়গা। খালি একটা মুশকিল—খরচ। প্রায় দেড়শো টাকার ধাক্কা। গোটা পঞ্চাশেক পর্যন্ত আমি বড় জোর জোগাড় করতে পারি—পুরনো বই, মেডেল-টেডেল বেচে দিয়ে, কিন্তু—'

'কিছু আমিও হয়ত পারব। ঘড়িটা তো আছে। হাতেও তিরিশটা টাকা—'

কৃতজ্ঞ বিস্ফারিত ছেলেটি যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

...   .

'এই সিঁদুরটুকু পরে নাও।'

'দুর ঠাট্টার মত দেখাবে।'

'তবু। ওটা দরকার। যেখানে ঠিক করেছি, সেটা রেসপেক্‌টেব্‌ল। অন্য কথা বলতে হয়েছে।'

'তার মানে, যে-সম্পর্ক হয় নি, তাই বলেছ?'

'হয় নি কিন্তু, হবে তো?'

'হবে বুঝি!' মেয়েটি হঠাৎ হেসে ফেলতে গিয়েও সামলে নিয়েছিল—'কী জানি।' সিঁদুর পরে সে বলেছিল, 'এই নাও টাকা। দেড়শোর অল্পই শর্ট আছে।' হাতের আংটিটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে বলল, 'এটা বেহাত হতে দিলে বোধহয় পুরোই পাওয়া যেত। তা আর হতে দিলাম না। তুমিই পুরিয়ে দিও। এই আংটি থাকাই ভাল, কী বলো। বিয়ের আর একটা উপরি প্রমাণ—সিঁদুরের ওপর আংটি।'

'তোমার হস্টেলে কী বলে...'

'সেজন্যে ভেবো না। মাসীর বাড়ি মাঝে মাঝে যাই। দিন কয়েকের ছুটি মঞ্জুর কোনরকমে করিয়ে নেব।'

এগিয়ে এসে ছেলেটি ওর হাত ছুঁয়ে বলল 'কিছু ভেব না। খুব ডিপেন্‌ডেব্‌ল জায়গা।'

'আর রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল, না?'

'খুব। ভয় নেই।'

এক ধরনের ভাষাহীন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে মেয়েটি বলল, 'ভয়? ভয় আমার আর কোন কিছুতেই নেই।'

'ক'দিন এখানে থাকতে হবে ডাক্তার বলল?'

'ডাক্তার কিছুই বলে নি। নার্স—ওই যে মেয়েটি, একবার ঢুকে ফিরে গেল, সে বলছিল তিন দিন।'

'কোন গোলমাল হবে না?'

'এর চেয়ে আর কি গোলমাল হবে?'

এত অবসন্ন, তবু মেয়েটির ফ্যাকাশে হাসিতে কি বিদ্রূপ ফুটলো।

'এই। তুমি কি ওকে দেখেছ?'

'কাকে?'

'মানে যেটা হতে যাচ্ছিল…'

'যে হতেই পায় নি, তাকে?' অল্প হেসে মেয়েটি চোখ খুলল।—'না। ওরা দেখতে দেয় নি। তাছাড়া আমি তো অজ্ঞান হয়েছিলাম। নার্স বলছিল, ওদিককার একটা ঘরে প্যানে রেখে দিয়েছে।'

'ও। এখনও ফেলে দেয় নি, কী বলো। আচ্ছা, ওরা এগুলো নিয়ে কী করে জানো?'

'জানি না।' শরীরে বল পেলে মেয়েটি তখন ও-পাশ ফিরে শুত, মুখ ঘোরাত।

হয়ত শেয়ালকুকুরে টেনে নিয়ে যায়, কিংবা শকুনে ছোঁ মারে, অথবা ফুলবাগানের সার হয়, ছেলেটি ভাবল, (অবশ্য বেশি সহনীয় বলে দ্বিতীয়টা বিশ্বাস করতেই তার সাধ যাচ্ছে।)

'তুমি জানো না?'

'না। শখ হয়ে থাকে, তুমি নিজে গিয়ে দেখে এসো না।'

'না—না—না, আমি পারব না। হয়ত রক্ত-তুলোয় চোবানো, হয়ত এখনও ডেলাটার কাটা-ছেঁড়া টুকরো এখানে-ওখানে নড়ছে—আমার গা ঘিন ঘিন করবে।'

গা ঘিন ঘিন, জ্যান্ত, আস্ত মানুষের সান্নিধ্যেও করতে পারে। সেই চালাঘরটা এখান থেকে কতদূর, কতদিন বৃষ্টি হয় নি, এই হাসপাতালটার ওষুধ-ওষুধ বিকট গন্ধ সেখানে কিন্তু ছিল না ও এখানে আর কতক্ষণ বসবে, একটি কুমোরের চাক মেয়েটির মগজে বন বন করছিল।

'তোমার সময় ছিল না?'

'আর একটু বসি।' ছেলেটি ঘড়ি দেখল, 'এটা তো ঠিক হাসপাতাল নয়—তেমন কড়াকড়ি বোধহয় নেই।' যদিও বলেই টের পেল, আর বসে থাকারও কোন মানে নেই, মেয়েটির সাদা মুখে শুকনো খড়ির দাগ

ফুটছে। ও খুব ক্লান্ত, হতাশ, ক্লান্ত, ক্লান্ত, ও এখন ঘুমোবে, ঘুমোতে চায়।

'তুমি এখানে সিগারেট ধরাতে পারছ না।' মেয়েটি এবার বলল স্পষ্টতর স্বরে।

'না পারলাম, তবু বসি। তোমার কষ্ট হচ্ছে কি কোন। কপালে হাত বুলিয়ে দিই?'

'না—না—না', বিব্রত, কিছু-বা বিরক্তভাবে মেয়েটি বলে উঠল, 'তুমি যেন কী। বলছি না তোমাকে, আমার আর কোনকিছু চাই না, আমি এবার শুধু ঘুমোতে চাই।'

আর বুঝতে কিছু বাকী ছিল না। ছেলেটির বোধ প্রখর টের পেল, শারীরিক অথবা যে-কোন অবসাদজনিত কারণেই হোক, ও এখন চলে যাক, মেয়েটি তাই চায়। এর পরে ইঙ্গিত আরও স্পষ্টতর হবে কিনা, সে তাই ভাবছিল। 'জানো, ডাক্তার বলে গেছে, বেশি বকবক করলে আমার ক্ষতি হতে পারে, বেশি কথা শোনাও বারণ,' এই পরবর্তী সংলাপের জন্য ছেলেটি কান খাড়া করেই রাখল, কিন্তু মেয়েটি করুণায় অসীমা, অতদূর গেল না।

সেই সুযোগে ছেলেটি সাহস সঞ্চয় করল। যতটুকু পারে, কণ্ঠে ততটুকু আবেগ ধারণ করে বলল, 'তোমাকে কথা দিচ্ছি, আর এ রকম হবে না। ট্যুশন আর একটা আমি জুটিয়ে নেবই, তুমি দেখো।'

—'আর এমন হবে না?'

—'না।'

একটু সাহসের সঙ্গে একটু জোর বরাত যুক্ত হলে কী হয়; কী কী হতে পারে; ছেলেটি মনে মনে তাই খতিয়ে দেখছিল। কী নোংরা এবারের এই অভিজ্ঞতা, কী বিশ্রী। ট্যুশনি ছাড়িয়ে তার চিন্তা আর আশা তখন চাকরী, বিয়ে, বাসা ইত্যাদি-ইত্যাদির নভোপটে, অবাধে পক্ষবিস্তার করেছিল। তাই গালে দুধ-ভাত ভরা থাকলে যেমন অদ্ভুত; ভরাট শোনাত, তেমন গলায় ছেলেটি বলল, 'তোমার কষ্ট বুঝি। সে

কষ্ট আমারও। আমি অপদার্থ স্বীকার করি। তাই আমাদের প্রথম সন্তান—'

'প্রথম? প্রথম না। দ্বিতীয়।' ফ্যাকাশে যে মেয়েটি এতক্ষণ শূন্য চোখে অন্যমনে চেয়ে ছিল, তাকে দীর্ণ করে এই শব্দ ক'টি যেন তীব্র চিৎকারের তীর হয়ে বেরিয়ে এল। তার পরেই সে, যার কপালে তখনও মিথ্যে সিঁদুরের আভা লেপা, শিয়রে ম্রিয়মান ফুল, সে হাত বাড়িয়ে ফুল পেড়ে পাপড়ির পর পাপড়ি চটকাতে থাকল। উদ্বেলিত হতে হতে স্থির-কঠিন অবশেষে শ্রান্ত শিথিল হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল কি পড়ল না, ঠিক বোঝা গেল না, কারণ তার চোখের পাতা খোলাই ছিল।

সেই দৃষ্টির সঙ্গে বেশিক্ষণ দৃষ্টি মিলিয়ে রাখা অসম্ভব, এমন ভয়ঙ্কর কিছু সেখানে লেখা ছিল। ছেলেটি মাথা নিচু করল। সবাই তখন বোবা হয়ে গিয়েছিল।

নার্স প্যানে করে যে রক্তমাংসের অপুষ্ট অপরিণত ডেলাটাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে, সেই চাক্ষুষ বিনষ্ট শিশুটি তো দ্বিতীয়। তারও আগে দু'জনের দু'জনকে চাওয়া এক হয়ে মিলে আর একটিকে তিলে তিলে তৈরী করেছিল যে! তার নাম ভালবাসা, তাদের প্রথম, এখন রক্তাক্ত থেঁতলানো হয়ে হয়ে তাদের মধ্যেই মরে আছে।

আমি লেখক, অন্তর্যামী, আমি জানি, এর চেয়েও অপ্রাকৃত ভয়ঙ্কর এক দৃশ্য ছেলেটি দেখতে পেয়েছিল।...মেয়েটি উঠে বসেছে, ক্ষমাহীন অসম্বৃত নিষ্ঠুর প্রতিমা, বুকের বাস অনায়াসে খসিয়ে বোঁটা টিপে টিপে আরও একটি শিশুকে সে দুধ দিচ্ছে, তাদের তৃতীয়—কোলজোড়া সেই শিশুর ডাকনাম ঘৃণা।

●

আতসী উজ্জ্বল

রমাপদ চৌধুরী

শহর দক্ষিণের এ অংশটা যুদ্ধের সময় ছিলো মার্কিনদের মিলিটারি হাসপাতাল। তারপর সেই সাজসরঞ্জাম, বাড়িবাগান জুড়ে দেশী রুগীদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা হলো। গড়ে উঠলো একটা নতুন ডাক্তারী কলেজ, আর হাসপাতাল।

দোতলা বিরাট প্রাসাদের মত বাড়িখানা এলো সরমাদের জিম্মায়। এক একখানা ঘরে দু-দুজন নার্স। সারা ম্যানসনটায় কম করে পঞ্চাশজন সেবিকার আবাস।

মানসী বয়সে ওর চেয়ে বেশি বড় না হলেও বেতনে এবং বিদ্যায় নিশ্চয়। গা-ছোঁয়া হাসপাতালটার মেট্রন ও। তাই আর-আর সিস্টারদের মনের কোণে ওর প্রতি যেটুকু ভালবাসা আছে তা ভেজালে মেশানো। সরমা কিন্তু সত্যি বেশ আপন হয়ে উঠেছে মানসীর। অন্তরঙ্গ। তাই দখিন-খোলা মাঝের সেরা ঘরখানাই হয়েছে মানসী আর সরমার কুমারীকুঠি।

ছোট্ট ঘর। দু-দিকের দেয়াল ঘেঁষে দুখানা একক পালঙ্ক। একটা কমদামী ড্রেসিং টেবিল। চিঠি লেখবার একখানা ক্ষুদে মেজ, সবুজ রং করা। আর খান দুই তেপায়া। সারা ঘরটায় ঐশ্বর্যের ছাপ নেই কোথাও। দারিদ্র্যের আছে হয়তো। তবু কত পরিচ্ছন্ন! পরিপাটি। বাফ্ রঙের ডিসটেম্পারকরা দেওয়ালের গায়ে কোন এক নাম-করা ওষুধ কোম্পানীর ক্যালেণ্ডার।

সহজ কথায় সরমা আজ সুখী।

খাওয়া-পরার খরচ চালিয়েও বেশ কিছু টাকা থাকে ওর। কিন্তু সব টাকাই মা-কে পাঠাতে পারে না। ইচ্ছে হয় বৈকি। ছোট্ট বোন আর ছোট ভাই দুটি। তিনজনেই ইস্কুলে পড়ছে। মা-র অসুখ আর

পুজো-পার্বণও যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। যে ক'টা টাকা পাঠায় ও, চারজনের পক্ষে তা কতটুকু? ইস্কুলের মাইনে, বই কেনার টাকা। ওষুধের দাম, মা কালীর মানত। আরো কিছু যদি পাঠাতে পারতো!

ব্যয়ের অঙ্ক ও অনেকখানি সংক্ষেপ করেছে, রুচির হানি ঘটিয়েও। এ বোর্ডিঙের আর পাঁচজনের মত দু-জোড়া জুতো অবধি রাখে নি। রঙিন শাড়ীর সঙ্গেও ঐ সাদা জুতোটাই চালিয়ে দেয়। প্রসাধনের পায়ে প্রণামী দেয় না, সিনেমা দেখে ক্বচিৎ কখনো।

ফুরসত পায় ছুটির দিনে। ফূর্তির ফোয়ারায় গা ডুবিয়ে দেয় সেদিনটা। সারা সকালটা হৈ-চৈ করে। এর ওর ঘরে ঢোকে, কারো বাক্সপ্যাঁটরা খোলে, কারো বা চিঠিতে চোখ আঁটে। এ দরজায় টোকা দেয়, ও দরজার ফাঁকে ছুঁয়ে দেয় দু-এক কলি ভাঙা গানের সুর, কাউকে টিটকারি দেয়, কাউকে সহানুভূতি।

সারা দুপুরে এদিকে দল বেঁধে রাস্তায় টোঁ-টোঁ। নিউ মার্কেটের ফলের দোকান, হোয়াইট্যাওয়ের শো-কেস। সিনেমার স্থির ছবির উইনডো, ওদিকে হকার্স-কর্নার, দশ-বারোজন মিলে এখানে-ওখানে জবরদস্তি দেখাবার চেষ্টা করে। বাস-ট্রামের সামনে হাত তুলে দাঁড়ায়, চাপা দাও নয়তো থামো। ব্লাউজের ছিটের দর কষাকষি করে হিন্দিতে ধমক দেয়। তারপর ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে।

আর-আর দিনগুলো একঘেয়ে হলেও বিরক্তির নয়। সারাদিনের খাটুনিতে যা কিছু শ্রমাতুর ভাব সান্ধ্যরোমাঞ্চের বাতাস ওর কপাল থেকে মুছে নেয়।

বিকেলের মেঘের রক্ত যখন জমে কালো হয়ে যায়, হলুদ-রঙা বাতাসের তাপ কমে, তখন স্নানান্তের স্নিগ্ধ সৌরভ মেখে সামনের বারান্দায় এসে বসে সরমা। এদিকে আকাশের প্রথম তারারা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। সাড়া না দিয়ে পারে না ও।

সারিবাঁধা কৃষ্ণচূড়ার পাতা নড়ে ওঠে। সন্ধ্যার সুগন্ধি বাসিবাতাসকে

টেনে নিয়ে যায়। আর নরম ঘাসের বীথিপথের ওপর হাল্কা পায়ে পায়চারি করে সরমা। এক-একবার আচমকা মাথা তোলে, চোখের দৃষ্টি ছুঁড়ে দেয় অনেক অনেক অন্ধকারের দূরত্বে। আবছা আলোর ফিকে রোশনাই আর আরো দূরের জমাট অন্ধকার। এভেন্যুর দু-পাশে ল্যাম্প-পোস্টের সারি। প্রহরী-আলোর আমেজটুকুও দূরে গিয়ে দিক হারিয়েছে। ফিকে হয়ে গেছে জনতার ভিড়। তবু এগিয়ে যায় সরমা। তারপরই হঠাৎ হয়তো চোখে পড়ে একটি ছায়াপুরুষ। প্রতীক্ষাসফল আনন্দের হাসি উছলে ওঠে ওর চোখের নীলায়।

অমানিশার অন্ধকারই থাক শুক্লাজ্যোৎস্নার জোয়ারই জাগুক আকাশে, নিরালা পৃথিবীর মাঝে, বন-কৃষ্ণচূড়ার আঁধারের চাঁদোয়ায় ঢাকা নিরালোক পৃথিবীর মাঝে এসে নামে ওরা। পাশাপাশি। একটি নির্দিষ্ট বেঞ্চিতে এসে বসে ওরা দুজনে।

রাত গভীর হয়ে আসে। আর মন। তারপর, একসময় যতি পড়ে ওদের মুগ্ধমনের কথালাপে। একক শূন্যতার মাঝে ফিরে আসে সরমা। কুমারী-পালঙ্কের নরম শয্যায় শরীর ছড়িয়ে রেখে চোখের পাতায় ঘুম নামাবার মন্ত্র পড়ে।

ওদিকের রোগা খাটে মানসী।

তন্দ্রাবেশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সরমা। তবু ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে বলতে হয়। ওর দৈনন্দিন রোমাঞ্চের ইতিহাস শোনাতে হয় মানসীকে। নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ হয়ে আসে সারা দুনিয়া। শব্দহীন। শুধু ওদের দুজনের টুকরো টুকরো হাল্কা কথা। কাঁচের গেলাসে গুঁড়ো বরফের কুচির মত ঠাণ্ডা, ভাঙা ভাঙা।

মানসীর কাছে কিছু লুকোতে চায় না সরমা। লুকোতে পারে না। বুক উজাড় করে অদ্ভুত একটা আনন্দ পায় ও। ভরসাও।

কিন্তু—হ্যাঁ, মানসীর কাছ থেকেও একটা দিনের কাহিনী গোপন রেখেছে সরমা। শুধু একটা দিন।

বিকেল পাঁচটার ঘণ্টা পড়লো। আর অন্যান্য দিনের মতই সেদিনও কি এক অবোধ্য অস্বস্তি এসে ঢুকলো সরমার বুকে।

রোজই এমন হয়।

লম্বা ওয়ার্ড। দু-পাশে সারিবাঁধা রোগশয্যা। মাঝখানে সরু একটা প্যাসেজ। সমস্ত ঘরখানায় একটা পরিচ্ছন্নতার প্রলেপ। শান্ত আর নিঃশব্দ। প্রতিটি লোহার খাটে শ্বেতশুভ্রতার বিছানা বিছানো। আর রুগীদের শিয়রের কাছে টাঙানো এক-একটি গ্রাফ-আঁকা চার্ট। হাসপাতালে সুদীর্ঘ ওয়ার্ড—এ দরজা থেকে ওদিকের ফটক অবধি যেতে পাঁচ মিনিট লাগবে। অথচ সারাটা দিন সরমা অক্লান্ত।

কপালে ওর ঘাম ফোটে, মুখে হয়তো বা শ্রমোজ্জ্বল রক্তিমাভা; কিন্তু চোখে শ্রান্তির আবেশ দেখা দেয় না। রুগীরা কেউ সহজ, কেউ বা আড়চোখে লক্ষ্য করেছে। লক্ষ্য করে। হাসপাতাল ছেড়ে যাবার বহুদিন পরেও হয়তো ওদের মনের পটে ভেসে ওঠে এখানকার দৃশ্যটুকু।

সরমা। নাতিশীর্ণ দেহ জড়িয়ে যায় একখানি সাদা ফুটফুটে শাড়ী. পায়ে সাদা জুতো, মাথায় কালোকেশের কোমল প্রাচুর্য ঢেকে শুশ্রূষকের শ্বেতচিহ্ন। সব মিলে অদ্ভুত সুন্দর দেখায় ওকে। জীবন্ত যৌবন। একটি ভ্রমরাকাঙ্ক্ষী রজনীগন্ধার অন্ধ কলির মত। উদ্দাম আর চঞ্চল। উন্মাদনা আর চপলতা। হ্যাঁ। খুটখুট করে ফ্ল্যাট-হিল জুতোর হাল্কা আওয়াজ চেপে চেপে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে সারাটা দিন। তখনই থার্মোমিটার দিচ্ছে এর জিভের নিচে, জ্বরতরঙ্গের গ্রাফ আঁকছে চার্টের গায়ে। আর তখনই হয়তো ওর ঠোঁটের কাছে ধরেছে ওষুধের গ্লাস। ছুটো হাল্কা হাসি এর দিকে, ওকে ছুটে সান্ত্বনা দেওয়া, আরেকজনকে হয়তো বা তর্জনী-তোলা ধমক।

সত্যি। সারাটা দিন ও অক্লান্ত। কিন্তু পাঁচটার ঘণ্টা শুনতে পেলেই চঞ্চল হয়ে ওঠে ও। ছুটির ডাক শুনতে পায়, দিনান্তের রোদো বাতাস ওর মদো রক্তকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে শুরু করে।

জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরের পৃথিবী দেখা যায়। হাসপাতালের

দক্ষিণের দেয়াল ছুঁয়ে গেছে চওড়া সড়ক। দু-পাশে একপথো পীচের রাস্তা, মাঝখানে বাসের জমিন। আর পথ বড় হলেও এদিকটায় গাড়ী-ঘোড়ার উৎপাত নেই। বেশ ঠাণ্ডা, চুপচাপ। পোড়া পেট্রোলের গন্ধ আসে না নাকে, হর্নের হঠকারিতা নেই।

পাঁচটার ঘণ্টা ওদিকে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরের পৃথিবী থেকে ছিট্‌কে এলো খানিকটা চঞ্চল বাতাস। সান্ধ্যভ্রমণাদের ভিড়-ভিড় গুঞ্জন, কানে এলো সরমার।

আর একটি ঘণ্টা। তারপরই ছুটি।

হঠাৎ ঘরের আলো কাঁপলো। ভাঙলো নিঃশব্দতা। কারও কণ্ঠে উচ্চকিত স্বর, কারও চোখে বিষণ্ণ হাসি। টুকরো টুকরো কথার কাকলিতে ঘর কেঁপে উঠলো।

হ্যাঁ। প্রতিদিনই, ঠিক এই সময়টায় রুগীদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা হাজির হয় দৈনন্দির সাক্ষাতের জন্যে।

আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বার বার ওর চোখ যায় একশো বাষট্টি নম্বর বেডের দিকে। খাটের পাশের টুলটিতে এসে বসে সে। রোগশয্যায় শায়িত বন্ধুকে সাক্ষাতের সান্ত্বনা দিতেই আসে। কিন্তু চোখ থাকে তার সরমার দিকে। প্রথম প্রথম কৌতুক বোধ করতো সরমা। নিজেরই অজান্তে ঠোঁটের কোণে ওর হাসি দুলে উঠতো, তারপর সচেতন হতেই ঠোঁট টিপে হাসি চাপতো।

মন মদির হত না সত্যি, কিন্তু হাসিটা মধুর। তাই হয়তো অন্য কোন অর্থ পেয়েছিল লোকটি, ভুল ভেবেছিল। ফলে সাহস বেড়ে গেল তার। যা ছিল মোমবাতির আলোর মত ঠাণ্ডা মোহময় দৃষ্টি, আশার আগুনে তা জ্বলে উঠলো।

অসহ্য লাগলো সরমার। অস্বস্তি বোধ করলো ও। মানসীর কাছে অনুযোগ করলো। উত্তর এলো বিদ্রূপের হাসি। শুশ্রূষকের জীবন বেছে নিলে এমন অনেক কিছুই নাকি সয়ে যেতে হয়।

সরমা প্রতিবাদ করলে, তা বলে অমন বিশ্রীভাবে তাকিয়ে

থাকবে কেন ?

মানসী হাসলে।—ও তো শুধু তাকিয়েই থাকে।

সরমা মনে-মনে চটে। বেশ। ও নিজেই এর ব্যবস্থা করবে।

সেদিন কিছু একটা বলবে বলেই লোকটির দিকে এগিয়ে গেল সরমা। ভর্ৎসনার স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল।

—শুনুন।

না। সরমা নয়। ও কিছু বলবার আগেই লোকটিই ডেকে বসলো। সরমা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালে, কথা জুটলো ওর মুখে।

দু-খানা দশ টাকার নোট ধরলে লোকটি ওর চোখের সামনে।—এঁর জন্যে কিছু ফলমূল আনাবার ব্যবস্থা করে দেবেন? এই টাকা ক'টা—

রুগীদের জন্যে ফলমূলের ব্যবস্থা নেই। টাকার বিনিময়ে সে ব্যবস্থা হয়। কিন্তু সাধারণতঃ সেটা করে হাসপাতালের জমাদার বেয়ারার দল। দু-পাঁচ টাকা বখশিশের লোভে। তা বলে, সরমাকে? তবু হয়তো ক্ষমা করতো ও, কিন্তু লোকটির সুবোধ্য হাসি আর টাকার পরিমাণ—এ দুটো মিলিয়ে কি এক অর্থ পেল সরমা। রাগে রী রী করে উঠলো সারা শরীর।

মানসীকে বললে, এরপরও লোকটার আসা বন্ধ করবে না?

মানসী হাসলে।—এত সহজ ভাবিস?

—তবে ডিউটি বদলে দাও আমার। অন্য ওয়ার্ডে দাও।

উত্তর এলো বোকা মেয়ে!

গোলাপী টার্কিশ টাওয়েলটা ওড়নার মত বুকে কাঁধে জড়িয়ে হাতে সাবানের কৌটোটা তুলে নিয়ে সান্ধ্যস্নানের জন্যে পা বাড়াচ্ছিল সরমা। পেছন থেকে ওর আঁচলটা টেনে ধরলো মানসী।

—এত তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছিস কোথায় শুনি?

সরমা মৃদু হেসে বললে, বেশ যা হোক্। দিলে তো যাত্রাটা মাটি

করে। গিয়ে দেখবো বাথরুমে পাম্পের জল নেই।

—খনার বচন পড়িস নি? আগে হতে পিছে ভালো যদি ডাকে মা-য়।

—দিদি, মা নও। বয়েসটা একটু বেশি হলে নয়—

—উঁহু, তা হলে কি আর তোর প্রেমের গল্প শুনতে পেতাম।

—দেখো মানুদি, গল্প গল্প বলো না বলছি।

—ওঃ চটেই লাল হয়ে আছেন মেয়ে। মান-অভিমান দেখাতে হয় তার কাছে দেখিও! গম্ভীরভাবে বললে মানসী। পরক্ষণে হেসে ফেললে।—চুপ করে বসে আগে তোর উপাখ্যানটা বলে যা।

—বাঃ! কাল রাতে তো বললাম।

—উঁহু। দ্বিতীয় প্রেমিকাটির কথা। ঐ হাসপাতালের ভদ্রলোক।

—ভদ্রলোক! কথাটার ওপর অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলে সরমা।—লোকটার কথা ভাবতেও আবার গা ঘিন-ঘিন করে।

—তবে, প্রথম প্রেমিকের কথাই বল্।

সরমা হাসলে, কি বলতে বাকী রেখেছি?

সত্যি। কিছুই বাকী নেই। এর আগে কতবার যে বলেছে তার ইয়ত্তা নেই। তবে, ঘুমন্ত তো নয়। জাগর প্রেম। দিনে দিনে ঘটে নতুন সংযোজনা। আরো কথা। আরো কামনা।

ব্যাপার হলো এই যে, সঞ্জীব আর সরমা দুজনে মন-দেয়া-নেয়া করেছে।

আত্মীয়-স্বজন নয়, পাড়া-পড়শী নয় এরা কেউ। অতএব সে-খবরে মানসীর এত উৎসাহ কেন? কেন কে জানে। তবে ঔৎসুক্য মানুদির চেয়ে কারও কম বলে তো মনে হয় না। আজ আর সঞ্জীব-সরমা উপাখ্যান কারও অজানা নয়। সরমার ডাক-নাম যে 'ঠাণ্ডা' তা যেমন জানতে বাকী নেই কারও।

একজনই দিয়েছে এ নাম, আর একজনেরই ডাকবার কথা এ নাম

ধরে। কিন্তু মানুদির জ্বালায় কি কিছু গোপন রাখবার জো আছে। দু-মাসও হয় নি ও এ বোর্ডিংটায় এসেছে। অথচ ইতিমধ্যেই এমন অবস্থা যে তিনজন এক জায়গায় হয়েছে কি দুজনের কথা—সঞ্জীব আর সরমা।

দোষই বা কি! ছ-টার ছুটি হতে না হতে এসে ঢুকবে ও স্নানের ঘরে। তারপর মানসীর পাউডারের কৌটোটা টেনে নিয়ে পাফ্‌টা দু-গালে বুলিয়ে নেবে। চুলটা আঁচড়ে, শাড়ী ব্লাউজ ঠিক করে নেবে চট্‌পট্‌। তারপর এক পিস পাঁউরুটি আর এক কাপ ঠাণ্ডা চা। বোর্ডিংয়ের নেপালী ঝি গৌরীমায়া চায়ের পেয়ালাপিরিচ সরিয়ে নিয়ে যাবার আগেই সরমা রাস্তায় নেমে পড়েছে।

এ যেন নেশার ডাক, নিশীথের ডাক।

ড্রেসিং টেবিলটার সামনে বেঁটে টুলটায় বসে চুল আঁচড়াচ্ছিল সরমা। আর গুনগুন করে গাইছিল কি-একটা গানের কলি। স্নানের পর বেশবাস বদলাতে, প্রসাধন-সাধনে এত সময় কোনদিনই দেয় না সরমা।

তাই মানসী জিজ্ঞেস করলে, কি ব্যাপার, ডিউটি দিতে যাবি না বুঝি?

সরমার এই সন্ধ্যার অভিসারকে 'ডিউটি' বলে ঠাট্টা করে সবাই। শুনে শুনে অভ্যেস হয়ে গেছে সরমার। বললে, না।

—কেন? অভিমান না অনিচ্ছা?

সরমা হাসলে।—আসবে না আজ।

তারপর চট্‌ করে উঠে এসে মানসীর খোঁপাটা ঠিক করে দিতে দিতে বললে, চলো মানুদি। ঘুরে আসি।

কিন্তু না। মানসী এ ব্যতিক্রমে রাজী নয়। দিনের পর দিন মাসের পর মাস এই দেয়ালঘেরা ঘরের বদ্ধ বাতাসে কাটিয়ে দিয়েছে, এই বিজলী বাতির চোখধাঁধানো তিমিরের গভীরতায়। খোলা আকাশ, খোলা

বাতাস সহ্য করতে পারে না ও।

অগত্যা একাই বেরিয়ে পড়লো সরমা।

ত্ব-ধারে ল্যাম্পপোস্টের কনভয়। মাঝখানে নরম ঘাসের জনপদ।

সবুজ নয়, অন্ধকারে কালো দেখায়। যেন একটা সুস্থযৌবন সাঁওতাল পুরুষের গলায় মুক্তোর মালা!

লঘুপায়ে হাঁটতে শুরু করে সরমা। কৃষ্ণচূড়া আর আমলকী, হিজল আর হরিতকী গাছের আড়ালে ঢাকা আধা-চাঁদের ছায়ার দিকে।

রাস্তার এ পাশে ফ্লোরেসেণ্ট আলোয়-ঝলমল একটা পানের দোকান। উঁচু হাসি আর তীক্ষ্ণ তর্কের বুলি কানে আসতেই ফিরে তাকালো সরমা। চকিত চোখে।

সেই একশো বাষট্টি নম্বর বেডের পাশের একজোড়া চোখ। হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট।

চোখাচোখি হলো। তারপর, তারপর আরেকবার ফিরে তাকাতে ইচ্ছে হলো সরমার। তবু পারলো না। যেমন হেঁটে চলেছিল, হেঁটে চললো। পায়ের গতি হয়তো বা একটু দ্রুত হলো। কে জানে!

জনহীন ঘনবনের নিঃশব্দতায়, পথের পাশের ল্যাম্পপোস্টগুলো যেখান থেকে ফিরে এসেছে, তারও ওপারের অন্ধকারে ডুব দিয়ে হাঁপ ছাড়লো সরমা।

নির্জন। নির্জন আর অন্ধকার।

প্রতিদিনের মতই সেই নির্দিষ্ট বেঞ্চিটাতে এসে বসলো সরমা। একা। কি একটা রাতজাগা পাখী পাখা ঝটপট করে উড়ে গেল।

নিশ্চুপ বসে রইলো সরমা। আপন চিন্তার গভীরতায় ডুবে রইলো।

হঠাৎ।

কাছের গাছের আড়ালে চোখ গেল। একটা ছায়াশরীর। মুখ দেখা যায় না। শুধু সাদা পরিচ্ছদটা চোখে ভাসে। একটা দেশলাই জ্বালার শব্দ হলো। সিগারেট ধরালো কে যেন, ত্ব-হাতের তালুতে

আগুনের শিখাটা আড়াল করে। কিন্তু ঐ সামান্য আলোতেই চিনতে পারলে ও।

ভয়ে আশঙ্কায় উঠে দাঁড়ালো সরমা। তারপর দ্রুত পায়ে বোর্ডিংয়ের পথ ধরলে। পিছনের উচ্চকিত হাসির শব্দ কানে এসে পৌঁছলো। ধাক্কা দিলো বুকের ভেতর।

মানসী প্রশ্ন করলে, কি, এত তাড়াতাড়ি ফিরলি যে?

সরমা হাসবার চেষ্টা করে বললে, এমনি।

পরে অবশ্য সেদিনের কথাটা মানসীকে বলেছিল সরমা। আর ছুজনেই প্রচুর হেসেছে। সরমা নিজেই বিস্মিত হলো ভেবে, এত ভয় করবার মত কি ছিল? মানসী বললে, গেঁয়ো! এখনও শহুরে হলি না তুই। এখানে আসবার টিকিট দিয়েছিল কে তোকে? সরমা হেসে বললে, কেন, ষ্টেশনের টিকিটঘরেই তো কিনেছিলাম। মানসী বললে, সেই তো সুবিধে হয়েছে তোদের। এখানে আসবার যোগ্যতা আছে কিনা তা তো দেখে না, পয়সা দিলেই ট্রেনে চড়তে পাওয়া যায়।

সঞ্জীবও হেসেছে হো-হো করে—ভারি ভীতু তো তুমি! তাই বুঝি আসো নি এ দু-দিন?

ঠোঁটে হাসি টিপে রেখে মাথা নীচু করেছে সরমা। আঙুলে শাড়ীর পাড়টা জড়াতে জড়াতে বলেছে, না, ভয় করবে না! একা একা এই অন্ধকারে······

—এখন আর ভয় করছে না তো?

—হ্যাঁ, করছে। একা একা ভালো লাগে তোমার?

সঞ্জীব হাসলো।

সরমা বললে, হাসছো তুমি। কথা বলবার একটা লোক পর্যন্ত নেই।

—সে কি, অত লোক তোমাদের বোর্ডিংয়ে। মানুদি রয়েছে!

—কথা ঘুরিও না।

—এতদিন তো সবুর করলে। আর কয়েকটা দিন সবুর করো।

—কেন?

সঞ্জীব চুপ করে রইলো।

অনুযোগ করলে সরমা, উত্তর না পেয়ে।—তোমার কাছে আমি একটা কথাও লুকিয়ে রাখি না, অথচ তুমি···

কথা খুঁজে না পেয়ে সঞ্জীব পকেট থেকে নতুন কেনা ফাউণ্টেন পেনটা বের করলে।—এই নাও তোমার কলম। কোন্ ভাগ্যবানকে চিঠি লিখবে কে জানে।

—মনে আছে যা হোক্। বাঃ বেশ ছোটখাটো তো। কত দাম?

পরের অংশের বিদ্রূপটা যেন কানেই গেল না ওর।

—উপহারের বিচার কি দাম দিয়ে করবে নাকি?

সরমা হাসলে।—তা নয়। বুঝেসুঝে হিসেব করে চলবার উপদেশ দিতাম।

—এখন থেকেই?

—এখনই আমার কথায় কান দাও না, পরে বড়ো শুনবে!

সরমার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে সঞ্জীব বললে, শুনবো গো শুনবো।

—এতও পারো। সরমা হাসলে।

তারপর দুজনেই চুপচাপ।

এদিকে রাত বাড়ে। হিম পড়তে শুরু করে। তবু, চমৎকার একটা আমেজ, কত কত তারায় ভরা আকাশ। বাতাস ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা আর নরম। রেশমের মত। আর ঘুম-ঘুম রোমাঞ্চ। দয়িত স্পর্শের শিহরণ। আমলকীর পাতা নড়ে। কৃষ্ণচূড়ার পাতা নড়ে। শিমূল আর শিশু গাছের চন্দ্রছায়া কেঁপে ওঠে।

—চলো, উঠি।

—নাই-বা ফিরলে।

—সে কি! সঞ্জীব হাসলো।—সারা রাত এইখানে থাকবে?

সরমাও খিলখিল করে হেসে উঠলো, উঠে দাঁড়ালো।

সঞ্জীব বললে, পৌঁছে দিয়ে আসবো ?

—এটুকু পথ আমি একাই যেতে পারবো।

সরমার কণ্ঠস্বরে অভিমান ফুটে উঠলো। সঞ্জীব হয়তো বুঝতে পারলো না।

তবু বললে, চলো না, পৌঁছে দিয়ে আসি।

—তোমাকে তো এমনিতেই এতটা পথ হাঁটতে হবে।

অর্থাৎ দুজনের গন্তব্য দু-মুখে। একজন পুবে, অন্যের পথ পশ্চিমে।

সঞ্জীব বললে, বেশ, যাও তাহলে।

—তুমি যাও, আমি যাবো এখন।

কেউ আর কি আগে যেতে চায় না। শেষে সঞ্জীবই নিজের পথ ধরলো। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ফিরে তাকালো। সরমা তখনও দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। ওর দিকে চোখ রেখে।

সঞ্জীব হাসল।—কি হলো, যাবে না ?

সরমাও হেসে ফেললে। কিন্তু নড়লো না।

সঞ্জীব কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলো। তারপর ধীরে ধীরে গাছগুলির জমাট অন্ধকারের মধ্যে ডুব দিলো। নিশ্চল, নিশ্চুপ ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে সেদিকে তাকিয়ে রইলো সরমা। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ। একেবারে নিঃশেষে যতক্ষণ না মিলিয়ে গেল সঞ্জীব। তারপর গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

বোর্ডিং-এর পথ ধরবার জন্যে পিছন ফিরতে যাচ্ছিল সরমা।

কিন্তু।

তার আগেই একজোড়া সবল হাত ওকে বোবা করে দিলো। ভয়ে বিস্ময়ে চোখ চাইবার চেষ্টা করলে সরমা। আশঙ্কায় অক্ষম পা-দুখানা টললো। মুখে কথা যোগালো না। ওর শরীরের আপত্তি নিস্তেজ হয়ে পড়লো।

একটি দিন। শুধু একটি দিনের ইতিহাস ও বলতে পারে নি মানসীকে। সঞ্জীবকে তো নয়ই।

কতদিন কত মুহূর্ত এসেছে। মনে মনে নিজেকে দৃঢ় করেছে সরমা। না, সঞ্জীবের কাছ থেকে অন্তত ওর জীবনের কোন অন্ধকারকেই চেপে রাখবে না। কিন্তু শেষের ক্ষণে সাহস হারিয়েছে ও। ভরসাও। ভেবেছে, মিলনের ভিত আরো গভীর হোক—তারপর, তারপর।

মানসীর চোখে পড়েছে কখনো কখনো। ওর মুখের বিষণ্ণ ব্যথার প্রলেপ, ওর চোখের মাটিহারানো উদাস দৃষ্টি।

প্রশ্ন করেছে মানসী—কি এত ভাবিস ?

—না, কিছু না তো।

মানসী ভাবতো ওদের প্রেমের স্বচ্ছন্দ গতিতে বুঝি যতি পড়েছে। তবু কিছু বলতো না, প্রশ্ন করতো না।

মানসী সেদিন তখনও ঘুম থেকে ওঠে নি। চাদরটা সারা গায়ে জড়িয়ে পড়ে আছে।

সরমা টুথব্রাস ঘষতে ঘষতে সামনের ছোট বারান্দাটায় বেরিয়ে এলো।

হোস-পাইপের জলের ফুরফুরি আছড়ে পড়ছে নীচের রাস্তায়। ঝিরঝির করে চমৎকার একটা শীকরোৎক্ষেপের শব্দ বাজছে। আর পূবের আকাশে হলদে বড় সূর্য! চমৎকার ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ভোরবেলাকার ঠাণ্ডা বাতাস।

সরমা মুখ হাত ধুয়ে আসতেই নেপালী ঝি গৌরীমায়া বলল—ঠাণ্ডাদি, নীচের বাকাসে চিট্টি ছিলো।

—দেখি।

সরমা চিঠিটা পড়লো। আনন্দ আর খুশীর হাসিতে ভরে উঠলো ওর মুখ। বুকে সুর বেজে উঠলো।

ছুটে গিয়ে ঘুমন্ত মানসীর পাশে বসলে। একটা ঠেলা দিয়ে ডাকল মানুদি।

—উঁ।

হাসি-হাসি মুখে সরমা মানসীর পাশেই শুয়ে পড়লো। মানসীকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে বললো, ওঠো ওঠো। কতক্ষণ আর ঘুমোবে।

—কেন জ্বালাচ্ছিস। ঘুমন্ত চোখ না খুলেই মানসী বললে।

—ওঠো; সুখবর আছে।

ব্যাপারটা হলো এই যে, সরমা লিখেছিল, মা, সেবারে ছোট মাসীমার বাড়িতে সঞ্জীবকে তো তুমি দেখেছিলে। তোমার মত জানিও।

মা উত্তর দিয়েছেন, মা সরো, তুমি এতদিন যা বুঝেছ তাই তো করে এসেছ। কোনদিন খারাপ ফল তো হয় নি।

মানসী উঠে বসতেই চিঠিটা দেখালে সরমা।

বিকেলে সঞ্জীবকে।

তারপর।

হৈ-চৈ ধূমধাম হলো না। রোশনচৌকি বাঁধা হলো না ফটকের মাথায়। নহবত বাজল না, সুর ধরল না সন্ধ্যার সানাই। লাল শালু আর সাটিনের চাঁদোয়া নয়। খুব ঠাণ্ডাভাবেই বিয়েটা হয়ে গেল। বাসর জাগল, বাসর কাটল।

তারপর, ফুলশয্যায় রাত।

আনন্দে উচ্ছল ওরা দুজনে। মর্ত্যের সম্বিত যেন হারিয়ে ফেলেছে।

নানা ফুলে সাজান হয়েছে ঘরখানা। ফুলেরই শয্যা যেন।

চম্পা-চামেলির সুবাসে স্নিগ্ধ, মালা-মল্লিকার মোহ। খাটের বাজুতে রজনীগন্ধা আর নাম-না-জানা কি একটা রঙিন লতা জড়ান। পুষ্প-সুরভির স্নান। কোণের ভাসটায় একজোড়া শ্বেতকমল।

সঞ্জীব আপত্তি করেছিল প্রথমে। কিন্তু, সুধাদেবী আপত্তি শুনলেন না।

বললেন, এটুকু না করলে চলে না।

—কেন ?

—সত্যিকারের ফুলশয্যা তো তোমাদেরই ঠাকুরপো। অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন সুধা দেবী ! তারপর বললেন, চললাম ভাই, আর বিরক্ত করবো না। মনে মনে তো এর মধ্যেই গালাগালি দিচ্ছ, আধখানা রাত বৌদিই মাটি করে দিল।

সরমা ঠোঁট টিপে হাসলে ঘোমটার আড়ালে। খাটের ওপর যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইলো। নড়লো না।

বৌদি চলে যেতেই কপাটে খিল দিয়ে এসে বিছানার ওপর বসলো সঞ্জীব।

সরমা চাপা কণ্ঠে বললে, উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন না তো ?

দিলেই বা।

সরমাও হয়তো সাহস পেল সঞ্জীবের কথায়। একটানে ঘোমটা খুললো—বাবা, ঘেমে নেয়ে গেছি। বলে বিছানা থেকে নামতে গেল। চট্ করে ওর হাতটা ধরলে সঞ্জীব।

—কোথায় যাচ্ছ ?

—ভয় নেই, পালাচ্ছি না। ছাড়।

—হাত ছেড়ে দিলে সঞ্জীব।

সরমা উঠে এসেই সুইচ টিপে আলোটা নিভিয়ে দিল। আর সেখান থেকেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বললে চাপা স্বরে, এসো না কিন্তু।

সঞ্জীব সাড়া দিল না। হয়তো হাসল, সরমা দেখতে পেল না। আলো জ্বেলে খাটের ওপর দেহ ছড়িয়ে দিলে সরমা। চোখ বুজলো।

—ও কি ! শুয়ে পড়লে যে !

আব্দারে শিশুর মত চলা গলায় সরমা বললে, ঘুম পাচ্ছে আমার।

—আমার যে ঘুম পাচ্ছে না।

—তবে জেগে জেগে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাক। আমি ততক্ষণ ঘুমিয়ে নিই। বলেই মুখ ফেরালে সরমা, হাসতে হাসতে। চোখ চাইলে।

বুকের নীচে একটা বালিশ টেনে নিল সঞ্জীব। তারপর সরমার মুখের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে একখানা হাত টেনে নিয়ে সরমার অনামিকায় আংটিটা পরিয়ে দিলো।

মৃদু হেসে আংটির পাথরটার দিকে তাকালে সরমা, মুগ্ধচোখে।

প্রশ্ন করলে, কি পাথর এটা?

—আতসী। এর আরেক নাম হলো চন্দ্রকান্তমণি। চাঁদের কিরণে চকমক করে, সূর্যের কিরণে আগুন জ্বালানো যায়। বেশ কাব্য করে বললে সঞ্জীব।

আর সরমার মনে পড়ে গেল আরেকটা কথা।—চাঁদের জ্যোৎস্নাটা মিথ্যে মায়া, মন ভোলাতেই পারে। সূর্য সত্য। জীবনকে জীবন্ত করে তোলে! সত্য মায়া নয়, মিথ্যের মত অনিষ্ট করে না সে। মারা যাবার আগে সরমার বাবা উপদেশ দিয়েছিলেন মেয়েকে। ইস্কুলের মাস্টার ছিলেন, সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে জীবন কাটিয়ে গেছেন। ছেলে-মেয়েদের আজীবন শুধু উপদেশই দিয়ে গেছেন। আর কিছু নয়।

সম্প্রদানের সময় মা'র চোখের জল দেখে বাবাকে মনে পড়েছিল সরমার। তারপর হাসি হল্লা, রহস্য রসিকতার মাঝে ভুলে গিয়েছিল।

সঞ্জীবের কথার সঙ্গে বাবার উপদেশটার কোথায় যেন একটা ক্ষীণতম যোগসূত্র আছে। রঙধনুকের আবেশবৈচিত্র্যে দৃষ্টি হারিয়ে গিয়েছিল ওর, আবার যেন চোখ ফিরে পেল। রামধনুর আড়ালে স্পষ্ট আর গভীর একটা কালো দাগ। কলঙ্কের অলঙ্কার।

খচ্ করে বুকের মাঝে এসে বিঁধলো একটুকরো বিস্মৃত ছবি।

একটা দিন। শুধু একটা দিনের ইতিহাস বলতে পারে নি ও। না মানসীকে, না সঞ্জীবকে। বহুদিন, বহুবার চেষ্টা করেছে। অবোধ্য এক অস্বস্তিতে নিজেই জ্বলেছে। ভয় আর আশঙ্কা। হয়তো তাল কাটবে, সুর হারাবে। সুস্থছন্দে গড়া ওদের মুগ্ধস্রোত জীবনের ঘুঙুর হয়তো বা বেতালা বেজে উঠবে।

এই আশঙ্কাতেই বলি বলি করেও বলে উঠতে পারে নি।

শুশ্রূষকের চাকরিতে ইস্তফা দেয় নি সরমা। সঞ্জীবের কিছুটা অমত ছিল, তবু বুঝিয়ে রাজী করাল তাকে। বাবা ক'টা টাকাই বা রেখে গেছেন! আর জামাইয়ের টাকায় তো সংসার চালান যায় না। তাই, ক'টা মাস অপেক্ষা করতে বলছে সরমা। ছোট ভাই সৌমেন আই এস-সি পাশ করেছে—চেষ্টাও করছে চাকরির। তখন আর হাসপাতালের চাকরি রাখবে না। না, একেবারে ছেড়ে দেবে কেন! যথেষ্ট অর্থ আর উদ্দীপনা খরচ করে নার্সিং শিখতে হয়েছে ওকে।

সেদিন হাসপাতাল থেকে ফিরে বেশ বদল করতে করতে সঞ্জীবের কণ্ঠস্বর কানে এলো ওর। তা হলে এর মধ্যেই ফিরে এসেছে! কিন্তু একা নয়। আরো কে যেন রয়েছে। গলা শুনতে পেল সরমা।

হাতে মুখে জল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সরমা এসে দাঁড়াল আয়নাটার সামনে। শ্রান্তির স্বেদবিন্দু সারা দেহে। চোখের কোণে সাময়িক লুপ্তলাবণ্যের রেখা। চম্পাবরণ একখানা শাড়ী বের করে পরলো সরমা। আর হাঁস্থলিগলা ব্লাউজ—রঙ মিলিয়ে। সুরভি-বিন্দু ছিটিয়ে নিলে এখানে ওখানে। নিজের প্রসাধন-প্রসারিত রূপ দেখলে কিছুক্ষণ।

তারপর, খাটের ওপর বালিশে ঠেস দিয়ে বসলে দু সেকেণ্ড; ওদিকের কেদারাটায় উঠে গেল। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে বই-কাগজগুলো উল্টে দেখতে শুরু করলো। অকারণে শব্দ করলে কখনও পেয়ালা-পিরিচের, কখনও বা হাত থেকে বই ফেলে। চাবির থোকাটা ঝনঝন করলো, দরজার খিলটা একবার লাগালো, একবার খুললো। শুকনো কাশি কাশলো। শেষে চীৎকার করে ঝি দুখীর-মাকে ডাক দিলো।

একটু পরেই সঞ্জীব উঠে এলো বাইরের ঘর থেকে।

—একজন বন্ধু এসেছে। বাইরে গিয়েছিল, ক-মাস পরে ফিরেছে বিয়ের সময় তো আসতে পারে নি, তাই আজ এখানে ফিরেই এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। আজ বোধহয় আর সিনেমায় যাওয়া হলো না।

সরমা অনুযোগ করলো—সারাদিন খেটেখুটে এসেও তোমার দেখা পাওয়া যায় না। বন্ধু! অন্য সময়ে যেন আসতে পারে না।

—আহা, ওর কি দোষ বলো। সঞ্জীব বোঝাতে চাইলো।

সরমা উত্তর দিলে, আজই তো প্রথম নয়। রোজই তো তোমার একটা না একটা লেগেই আছে।

সঞ্জীব হাসলে।—কি করবো বলো! বন্ধুবান্ধবরা তা নইলে যে বৌপাগলা বলবে। এমনিতেই তো বলে, আমায় নাকি তুমি আঁচলে বেঁধে রেখেছ।

সরমাও হেসে ফেললে। বললে, বলুকগে। সকালে তো দু-মিনিট কথা বলবার সময় পাই না। দুপুরে তুমিও বেরিয়ে যাও, আমিও বাইরে থাকি। একা-একা চুপচাপ বসে থেকে আমি বাপু হাঁপিয়ে উঠি।

—কেন, বৌদির সঙ্গে তো গল্প করে কাটাতে পার।

সরমা চটে গেল।—বেশ, তাই যাচ্ছি। সন্ধ্যাবেলাটাও যদি তোমার বন্ধুদের না হলে—

—চট্‌ছো কেন ?

—আমি তার চেয়ে আবার বোর্ডিংয়ে ফিরে যাব। সেখানে তবু পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলে সময় কাটে।

সঞ্জীব হেসে হাতটা চেপে ধরলো সরমার। বললে, এখন চলো তো হিমাংশুর সঙ্গে দেখা করে আসবো।

প্রথমটা আপত্তি করে সরমা। মুখে বলে, চিড়িয়াখানার জীবজন্তু তো নই যে রোজ-রোজ একজন করে দেখতে আসবে।

মনে মনে আর কি লজ্জা পায়। তা ছাড়া ভালও লাগে না।

শেষকালে রাজী হয় ও। সঞ্জীবের পিছনে পিছনে নীচের বসবার ঘরে গিয়ে ঢোকে। কি একটা পত্রিকার পাতায় চোখ ছিল হিমাংশুর। শব্দ শুনে মাথা তুললে। নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত, মুখে মৃদু হাসি। পরক্ষণেই হিমাংশুর মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল। হাত আর

উঠলো না।

সরমাও চমকে উঠেছিল। সঞ্জীব লক্ষ্য করলো না, নয় তো সরমার সাদা চাদরের মত রক্তহীন মুখটা দেখতে পেত।

আলাপ করিয়ে দিলো সঞ্জীব। কিন্তু ওরা দুজনেই বড় অস্বস্তি বোধ করলো। রেহাই পেলেই যেন বাঁচে।

তারপর একসময় হিমাংশু চলে গেল বিদায় নিয়ে।

সরমা ভাবলে, ও বোধহয় আর কোনদিন আসবে না।

ভুল!

দিন কয়েক পরে আবার এলো হিমাংশু। আসতে শুরু করলো।

প্রথম প্রথম সরমার চোখে জাগতো ভয়ার্ত ভাব। শঙ্কার শিহরণ। ক্রমশ ঘৃণা আর বিরক্তি বোধ করলে সরমা। কারণে অকারণে জেদ ধরে কেন সঞ্জীবের কাছে, সরমাকে ডেকে আনায় কেন। কখনো বলে, চলুন বেড়িয়ে আসি; কখনো সিনেমায়। টুকিটাকি দু-চারটে জিনিস কিনতে যাবে হয়তো সরমা আর সঞ্জীব, হিমাংশু এসে জোটে।—চলুন আমিও যাই। আর ক্ষণে ক্ষণে চোরা চোখে তাকাবে সরমার দিকে সেই কুৎসিত অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে।

সেদিন সঞ্জীব ফেরে নি তখনও। হিমাংশু এসে হাজির হলো।

সরমা ওর দিকে না তাকিয়েই বললে, উনি আসেন নি এখনও।

—তা হলে একটু অপেক্ষা করি, কি বলো? হিমাংশু হাসলো। একটু থেমে বললে, আপত্তি নেই তো তোমার? শেষের শব্দটার ওপর অতিরিক্ত জোর দিয়েই বললে।

চমকে ফিরে তাকালো সরমা। ক্রোধে ফেটে পড়লো যেন। বেশ স্পষ্ট আর দৃঢ় গলায় বললে, হ্যাঁ, আপত্তি আছে আমার। বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান আপনি এখান থেকে। নির্লজ্জের মত কোনদিন আর আসবেন না এখানে।

অপ্রতিভ হয়ে উঠেছিল হিমাংশু প্রথমটা। তারপর হো-হো করে হেসে উঠলো।

বললে, ভুল করছো সরমা। বেরিয়ে যদি যাই—

অসমাপ্ত কথার নিঃশব্দতাই যেন ভয় দেখাল।

বিস্ময়ে ক্রোধে হিমাংশুর মুখের দিকে তাকালো সরমা। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। অপমান আর ব্যর্থতার আগুনে জ্বলছে তার চোখ দুটো। প্রতিহিংসার আগুনে।

আর এক মুহূর্তও দাঁড়াতে পারলে না সরমা। পালিয়ে এলো ঘরের ভেতর। বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়লো। সমস্ত বুক যেন ফাঁকা ফাঁকা। মাথা ঝিমঝিম করে। কি একটা বিপর্যয়ের জন্যে যেন থমকে থেমে গেছে পৃথিবী। দুনিয়ার সমস্ত কলরোল যেন হঠাৎ চুপ করেছে। শুধু অসহ্য বাতাস শিস দেয় ফিসফিস করে।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ পড়ে রইলো সরমা। নিশ্চুপ নিথর।

সঞ্জীব ফিরে এসেছে। গলার স্বর শুনতে পাচ্ছে সরমা। আর হাসির শব্দ। হিমাংশু আর সঞ্জীব হাসাহাসি করছে।

মনকে শক্ত করে উঠে দাঁড়ালো সরমা।

লাল, গাঢ় লাল রেশমী রঙের শাড়ীখানা জড়ালে শরীরে। যৌবন-দেহের প্রতিটি রেখা সুস্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুললে। পুরুষের মন ভোলাবার যা কিছু ছলাকলা। রেশমের আঁট ব্লাউজের আবরণকে নিরাবরণের রূপ দিলো। মুখে মাখলো শুভ্ররেণু, চোখে কাজল টানলো। রাঙির চাকতি বুলিয়ে নিলো গালে, আর পাতলা ঠোঁটে বহ্নিশিখা জ্বলিয়ে দিলো। হাতে-পরলো আইভরির রুলি আর স্বর্ণকঙ্কন। গলায় দোলালে বুকছোঁয়া লাল প্রবালের মালা।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল। নিজের রূপে নিজেই মোহিত হয়ে গেল।

তারপর ঠোঁটে স্নিগ্ধ হাসির আবেশ এঁকে পা বাড়ালে সরমা।

সঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে বললে, চলো বেড়িয়ে আসি।

আর হিমাংশুর চোখে অপরূপ মোহাবেশের চোখ রেখে মৃদু হেসে

বললে, চলুন, আপনিও চলুন। একটু বেড়িয়ে আসি। সন্ধ্যার সময় ঘরের ভেতর—হাঁপিয়ে উঠি আমি।

তিনজনেই পথে বেরিয়ে পড়লো।

রাতের বুকে জ্বলন্ত মশালের মত সরমাই যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে।

কত হাসি কত রসিকতা। ফুর্তিতে-আনন্দে যেন মেতে উঠছে সরমা। চোখের কোণ ওর খুশীতে ভরে উঠেছে।

ধীরে ধীরে হেঁটে চললো ওরা। আর সরমার মুখে অনর্গল কথা। কথা, কথা, কথা। আর উচ্ছল হাসির তুফান। কখনো সঞ্জীবের গায়ে ঢলে পড়ছে, কখনো হিমাংশুর গায়ে।

পশ্চিমাকাশের জাফরানের বন ক্রমশঃ নীলাভ হয়ে এলো। নামলো ধূসর অন্ধকার। শিশু-সন্ধ্যার বাতাস কালো হয়ে এলো। একটা, দুটো, অনেক অনেক তারার ফুল ফুটেছে আকাশের বাগিচায়। চুপে চুপে চাঁদ এলো একলাটি। ভিড় ভিড় সান্ধ্যভ্রমণাদের জনতায় এসে মিশে গেল ওরা। জনতাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল।

সবুজ ঘাসের জাজিম পাতা রয়েছে পায়ের নিচে। দু-পাশে ল্যাম্পপোস্টের সারি। আলোর মালা। দূর দূর গাছ-গাছালির শ্যামল অন্ধকারের বুকে দিগন্ত দিক হারিয়েছে যেন। কৃষ্ণচূড়া আর আমলকী গাছের নীচে চাঁদের ছায়া পড়েছে। আলো নেই, আওয়াজ নেই।

সরমাকে উৎফুল্ল দেখায়। হাসি আর হাসি। কথা আর কথা। হঠাৎ যেন আনন্দে মাতাল হয়ে উঠেছে ও। ওর মদো রক্তে নতুন করে যেন উন্মাদনা জেগেছে। ঘুঙুরের মিহি মিঠে বোল বেজে চলেছে যেন ওর বুকের ভেতর।

কখনো ঢলে পড়ছে হিমাংশুর গায়ে, কখনো সঞ্জীবের হাতটা জড়িয়ে ধরছে।

—জানো, হাসপাতালে একটা লোক না এমন করে তাকিয়ে থাকতো আমার দিকে যেন গিলে খাবে।

সশব্দে হেসে উঠলো সরমা।

সঞ্জীবও হাসলো।

—জানেন হিমাংশুবাবু—সরমার কথা আট্‌কে যায় হাসির তোড়ে —লোকটা একদিন না···আবার হেসে ওঠে সরমা।

—কি ব্যাপারটা তাই বলো। সঞ্জীবও না হেসে পারে না।

—লোকটা না একদিন আমার পেছনে পেছনে এখান অবধি ধাওয়া করেছিল। খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে আবার।

সুস্মিত হাসি হেসে সঞ্জীব প্রশ্ন করে, তারপর ?

—ঐ যে গাছটা দেখছো, একদিন তুমি চলে গেলে, তারপর দাঁড়িয়ে আছি···আবার হেসে গড়িয়ে পড়লো সরমা।

—জানেন হিমাংশুবাবু—

কিন্তু কোথায় হিমাংশুবাবু! চারদিকে তাকিয়ে দেখলে সঞ্জীব।

হিমাংশু! হিমাংশু ?···কোথায় গেল হিমাংশু ? সঞ্জীব চিন্তিত হয়ে উঠলো।

আর সরমা সশব্দে হেসে জড়িয়ে ধরলো সঞ্জীবকে। আরেকটু হলেই হয়তো পড়ে যেত ও।

হাসতে হাসতে বললে, পালিয়েছে।

—মানে ?

সরমার মুখ থেকে হাসি অন্তর্হিত হলো। বললে, শোন। তোমার কাছ থেকে কোন কথাই কোনদিন লুকিয়ে রাখিনি আমি। একটা দিন শুধু একটা দিনের কথা তোমাকে বলতে পারিনি।

সপ্রশ্ন চোখে তাকালে সঞ্জীব। সরমার দিকে তাকিয়ে রইল।

অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে সরমাকে। সমস্ত মুখখানা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ভোরের সূর্যের মত রক্তিমাভা ফুটে উঠেছে ওর সারা দেহে। নিষ্কলুষ আগুনের মত উজ্জ্বল। অনামিকার আংটিতে বাঁধা অতসী পাথরটাও জ্বলে উঠেছে।

পুবের আকাশে ওটা চাঁদ নয়!

●

নিজেই জানত না শেষ পর্যন্ত কি হয়ে গেল।

নন্দিতা নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারল না, এক চোখে হাসি, আরেক চোখে জল নিয়ে বললে, তুমি!

বিস্ময়ে উল্লসিত পুরন্দর।

সেও কম অবাক হল না।

তারই সামনে আয়ত নন্দিতা।

কি দেখলো পুরন্দর?

দেখলো—পরণে নীল রঙের শাড়ি। হাতে সেই স্বর্ণ কাঁকন, চোখে-মুখে গভীর রহস্যতা। সব মিলিয়ে এক অসামান্যা নারী নন্দিতা।

আর নন্দিতা!

সেও দেখলো পুরন্দরকে।

দেখলো এক অসহায় পুরুষ, যার চোখে-মুখে সর্বাঙ্গে কামনার নয় প্রার্থনার অপরূপ দৃষ্টি।

হরসুন্দর আর স্থির থাকতে পারলো না।

বললে, বাবু দিন আমার পাওনা। দেখুন, আপনার জন্য কি সুন্দর চিড়িয়া এনেছি।

পুরন্দর আর দেরী না করে পকেট থেকে দশ টাকার একটা নোট বার করে নিয়ে বললে, এই নাও।

হরসুন্দর টাকাটা নিয়েই ওখান থেকে চলে গেলো।

নন্দিতা বললে না কিছুই। কিন্তু মনে মনে বললে, এই মুহূর্তে যাকে আমার সামনে নিয়ে এসেছে, সে কে? সে কি পুরন্দর! না আর কেউ? না তারই আরেক ছায়া।

পুরন্দর বললে, নন্দিতা আমি বাড়ী যাচ্ছি! তোমার কাজ শেষ হলে চলে এসো।

পুরন্দর ওখান থেকে চলে এলো।

আবার সেই রাজপথ। আবার সেই জনস্রোত। সন্ধ্যাকাশে কলকাতার এই পথ যেন আরেক রহস্য তীর্থের আলিঙ্গন।

পুরন্দর অসহায়ের মত চারিদিকে তাকিয়ে রইল। তারপর কি মনে করে ফিরে এলো ঘরে।

সেই ঘর। তার নিজের ঘর। সামনের দেওয়ালে নন্দিতার ছবি। পুরন্দরের চোখের সামনে ভেসে ওঠে হারানো অতীতের দুর্লভ স্মৃতি। যা আজকের দিনে তাকে খুঁজে বার করেলেও আর পাওয়া যাবে না।

সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি মনে পড়লো একে একে।

সাজানো ঘর। সুখের সংসার। সহাস্যে নন্দিতা। পুরন্দরের সেই দিন কি আর ফিরে আসবে ? যেখানে দুটি জীবন এক হয়ে গিয়ে সুখের নীড় গড়ে তুলেছিল।

সেই মায়াময় গ্রাম। সেই শান্ত নদী। ফুলে ফলে শোভিত বন। নীলাকাশ। মুক্ত পাখীর অবাধ গতি। আজ সেই মায়াময় শান্ত নদী তীরে অশান্ত নন্দিতাকে নিয়ে মধুর প্রলাপ।

হায়! আর আসবে কি সেই প্রসন্ন সকাল, কিম্বা বিষণ্ণ বিকেল। অথবা হৃদয়ের দুটি মন এক হয়ে উঠবে।

মনে পড়ে। ভালবাসার ভাল লাগায় নন্দিতাকে আপন করে নিয়েছিল পুরন্দর। প্রথম সংশয় তারপর সংশয়ের আবরণ ছিন্ন করে এক নতুন দিক উন্মোচন। সেই হাসি আর কান্না—সুখ আর আনন্দ হতাশা আর উল্লাস নিয়েই নন্দিতাকে ঘিরে পুরন্দরের জীবন।

নন্দিতা বলেছিল, তুমি আমার এর চেয়ে বড় সত্য নেই। তুমি আমার!

পুরন্দর হেসে বলেছিল, না নন্দিতা, তোমার এ কথা ভাবতেও আমার ভয় করে, যদি তুমি হারিয়ে যাও আমার জীবন থেকে। কোন সর্বনাশা ঝড় এসে আমাকে নিয়ে যায় কোন অতল অন্ধকারের তীরে।

হায়! কে জানতো সেই আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস দেখা গেল সারা

দেশ জুড়ে। ভাগ্যের চক্রান্তের বিবর্তনে মানচিত্রের ভৌগোলিক সীমা-রেখা দু টুকরো হয়ে গেল। আর হল ভাগ। স্বাধীনতা আসার পর নিজের গ্রাম ছেড়ে নন্দিতাকে নিয়ে চলে আসতে হল শহর কলকাতায়।

সবেমাত্র তাদের বিয়ে হয়েছে।

এলো শহর কলকাতায়। নন্দিতা অবাক চোখে বললে. হায়রে নিজের গ্রাম ছেড়ে শেষ পর্যন্ত আসতে হল এই শহরে। এত লোক! বাপরে বাপ!

পুরন্দর বললে, উপায় নেই। এই আমাদের চলমান জীবন। এবার চলতে হবে।

যা কিছু জমানো টাকা ছিল তা ফুরিয়ে যেতে আর বেশী দিন দেরী হল না। কালের চক্রে পুরন্দরকে শয্যাশায়ী হতে হল।

দিন বদলের পালা শেষ হতেই, পালা বদলের পালায় নন্দিতাই বললে, এ ভাবে তো সংসার চলে না। আমি একটা কাজ পেয়েছি। ও বাড়ীর সমরদা দিয়েছেন।

কিসের কাজ? অসহায় কণ্ঠে বললে পুরন্দর।

হেসে হেসে বললে নন্দিতা, মেয়েদের কারখানায় কাজ করতে হবে, কারখানা মানে শিল্পনিকেতন—সেখানে ব্যাগ আর খেলনা তৈরী হয়। মাস গেলে নগদ তিনশ টাকা।

—কিন্তু···

—না, কিন্তু নয়, তুমি রাজী হও। এভাবে সংসার চলে না। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। আমি এমন কোন কাজ করব না যাতে তোমার মনে আঘাত আসে।

তারপর একই আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই ছবি।

নন্দিতা কাজে বেরুল।

আর পুরন্দর রোজ সন্ধ্যায় শুয়ে শুয়ে ভাবে কবে সে ভাল হয়ে উঠবে? আবার কবে সে এই রোগ মুক্ত হয়ে আবার নতুন জীবন পাবে।

আর দেখতে দেখতে সংসারের চেহারা গেল বদলে।

নন্দিতাই সংসারের সব দায়-দায়িত্ব নিয়ে পুরন্দরকে নিশ্চিন্ত করলো।

আর পুরন্দর রোজই বিনিদ্র রাতে আকাশের মুখোমুখী হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায় তার এই মনোভিসার থেকে যেন মুক্তি পায়। আর নন্দিতা সেও কি জানে পুরন্দর কি চায় তার কাছ থেকে।

যেন দুটি হৃদয়ের সুর আজ এক হতে গিয়ে ছিন্ন হয়ে গেল। যেন মনে হচ্ছে নন্দিতা তার কাছে নির্মম হয়ে আরও নির্মম হয়ে উঠেছে। তবে এও সত্য। এই নির্মম ছবিটাতে সব যেন নির্মম নয়—আর নিষ্ঠুর নয় নন্দিতা তার স্নেহ মমতায় ভালবাসায় পুরন্দরকে দিয়েছে নতুন করে বাঁচবার প্রেরণা।

পুরন্দর বললে, আর পারছি নে। আমার কোন কাজ নেই। আমি অলস হয়ে যাচ্ছি।

নন্দিতা বললে, এর জন্য চিন্তা কি? আমি তো কাজ করছি।

পুরন্দরের মনটা যেন ঝড়ের মত। কখনো শান্ত আর কখনো অশান্ত। তার মনে হলো, তার এতদিনের আরামের বিলাসের শয্যাগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

সামনেই নন্দিতার ছবি।

খানিক আগেও দেখে এসেছে তাকে, যেন এক পণ্যা নারীর ভয়াবহ বীভৎস মূর্তি!

আর ভাবতে পারল না পুরন্দর।

নন্দিতা ফিরলো রাত দশটায়।

পুরন্দর বললে, আমি জানতুম না, হরসুন্দর তোমার কাছেই আমাকে নিয়ে যাবে। আমি চেয়েছিলাম এক সস্তা ধরণের কাউকে। কিন্তু গিয়ে দেখলাম তোমাকেই।

নন্দিতা ম্লান হেসে বললে, তোমার যা খুসী তাই বলতে পার—তোমার মত অযোগ্য পুরুষের কাছে আমি আর কি আশা করতে পারি! চেয়েছিলাম স্বামী-সংসার-ছেলেমেয়ে, কি দিলে তুমি?

পুরন্দর প্রতিবাদ করলো না।

পুরন্দর সহজ ভাবেই বললে, তোমার চাকরীর রহস্যটা এতদিনের পর জানতে পারলুম। ভালই করেছ। এ'ছাড়া আর তোমার কিই-বা করার ছিল।

তারপর করুণ কণ্ঠে পুরন্দর বললে, আমি বেকার। আমি রুগ্ন। এত বড় বাড়ী ভাড়া, খাওয়া, সংসার সব তোমাকেই করতে হয়—এর জন্য কাকে দায়ী করব। আমার ভাগ্যই আজ আমাকে টেনে নিয়ে গেছে অতল অন্ধকারে। এ থেকে আমার মুক্তি নেই।

নন্দিতা আর কথা বাড়ালো না।

আয়নায় নিজের মুখটা দেখলো। দেখলো সে এখন পুরন্দরের স্ত্রী। আর খানিক আগেও হতভাগ্য চিমনলালের কাছে সে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিল। তার বিনিময়ে সে নিয়ে এসেছে অনেক অর্থ।

আবার নিজেকে নিজেই বললে, নন্দিতা যখন তোমার এই রূপ থাকবে না, যৌবন ঝরে যাবে, তখন কেউ কি আসবে তোমার কাছে। তোমার কাছে আর কেউ আসবে না। সারা জীবন ধরে এই অসহায় রুগ্ন জীর্ণ ব্যর্থ যৌবনের হতভাগ্য পুরন্দরকে নিয়ে তোমায় বেঁচে থাকতে হবে।

এর নাম কী জীবন ?

কে জানে। কোন এক গভীর রহস্য তীরে সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পুরন্দর আর নন্দিতা এখনও ঘর করছে।

অথচ দু'জনেই জানে সব। তবুও একটা প্রতিবাদও নেই পুরন্দরের।

আর প্রতিবাদ করেই বা কি করতে পারে সে।

তার চেয়ে এই ভালো নন্দিতা তার জীবনে যা চায় তাই নিয়ে সুখী হোক। এই অসহনীয় চরম দারিদ্র্যতার হাত থেকে পুরন্দর নিজেকে আড়াল করে নিতে চায়, তাই তার এই নীরবতা।

ঠিক ভোর হবার একটু আগে নন্দিতা বিছানা থেকে উঠে এলো। এলো পাশের ঘরে। সে ঘরে এখনও পুরন্দর আপনমনে ও একাগ্র-চিত্তে কি যেন লিখছে।

হঠাৎ নন্দিতার আবির্ভাবে পুরন্দর বলে উঠলো, তুমি!

পুরন্দর আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলো না। একটা ব্যর্থ আক্রোশ আর হতাশায় নন্দিতাকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর আচ্ছন্নের মত বললে, আমার এই আত্মত্যাগের জন্য কেউ দায়ী নয়।

হতবাক! নন্দিতা পুরন্দরের মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিলো। আর পুরন্দর জাগলো না।

ভোর হলে সবাই জানলো, পুরন্দর অসহ্য রোগ যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য নিজেই নিজের জীবন দিয়েছে।

পুরন্দর মুক্তি পেয়েছে।

কিন্তু নন্দিতা, না সে মুক্তি পায়নি—অভিসারিকার পথে পথে তাকে এখনও ঘুরতে হয়। কে জানে, কবে এই ঘৃণ্য জীবন থেকে মুক্তি পাবে সে···

—শেষ—